জেঠুমনির গল্প

পরিবেশক ঃ
নবগ্রন্থ কুটির
৫৪/৫ এ, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক:
শ্রীমতি কনকলতা দাস
রঘুদেববাটি
হাওড়া - ৭১১৩১০

প্রথম প্রকাশ—১৯৬২

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বিশ্বাস বুক স্টল
৮৮, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা - ৯

জেঠুর কথা

রূপকথা মানে রূপবান ও রূপবতীর কথা। রূপকথার রাজকন্যা, রূপেগুণে অনন্যা। আর রাজপুত্র--তারও যেমন রূপ তেমন গুণ। রূপবান রাজপুত্র ঘোড়ায় চেপে কোমরে তরবারি ঝুলিয়ে চলে সাত সাগর আর তের নদীর পারে। বিপদসঙ্কুল দেশে ব্যঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমী উপায় বলে দেয় কোথায় গেলে রাজ্য আর রাজকন্যা কিভাবে পাওয়া যাবে। কীভাবে রাক্ষস খোক্কসদের এক কোপে কেটে জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। কোথায় আছে সেই মারণ অস্ত্র বা রাক্ষসদের প্রাণভোমরা যেখান থেকে একেবারে সব রাক্ষসদের টিপে মারা যাবে। তাদের কথাই বোধ হয় রূপকথা।

সত্যিই কি কেবল রূপের কথাই রূপকথা? না, তাও বোধ হয় নয়। সাহিত্য সমালোচকরা কেউ কেউ বলেছেন, উপকথা উচ্চারণের ফেরে রূপকথা হয়েছে। আবার কেউ বলেন রূপক কথাই (*উপমামূলক আখ্যান*) রূপকথা। পণ্ডিতদের কথায় গিয়ে কাজ নেই, আমরা গল্প শুনতে পারলেই খুশি। কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে কার গল্প শুনি। রাজপুত্র, রাজকন্যা না কি নিজেদের গল্প?

প্রতিটি মানুষ সেই গল্প-কাহিনী শুনতে বা অভিনয় দেখতে ভালোবাসে যার পাত্রপাত্রী, নায়ক-নায়িকার সুখ দুঃখের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে পারে। প্রতিটি মানুষের মনে কোনো না কোনও বেদনা, না-পাওয়ার গ্লানি থাকে। সাহিত্যের দর্পনে তারই প্রতিচ্ছবি দেখে সহানুভুতির আবেগ জাগে। মানুষ বলতে একটু বড়দের বোঝায়, তাদের অতীত আছে। শিশু-কিশোরদের আছে কেবল ভবিষ্যত। আর ভবিষ্যত মানে সুন্দর পরিবেশের কল্পনা, কাল্পনিক দুঃখকে জয় করার কাল্পনিক প্রচেষ্টা। বাস্তবের দুনিয়ার দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে সবে, তাই সে তো বাস্তবের বেদনার আঘাত এখনো পায়নি।

সেই রাজপুত্র সাত সাগর তের নদীর পারে যায়, যে ভাগ্য বিড়ম্বিত দুয়োরাণীর পুত্র, যার মা রাণী হয়েও ঘুঁটে কুড়োয়, অথবা ঘোড়ার আস্তাবল পরিষ্কার করে, অঙ্গের বসন জরা জীর্ণ, তবু সে বস্ত্র ভেদ করে তার মাতৃরূপ ফুটে উঠছে। মাথায় একরাশ কালোচুল, অযত্নে জটায় পরিণত হয়েছে। তার দুঃখ দেখে সন্তান আর থাকতে পারে না, তাই বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়েছে। অথবা সেই রাজপুত্র যাকে ঘাতক দয়া করে অরণ্য মধ্যে ছেড়ে দিয়ে কোনো পশুর রক্ত রাজার সামনে ধরেছে। সেই ভাগ্যহত রাজপুত্র পরে সৌভাগ্যের সুখ সাগরে পাড়ি দিয়েছে।

আসল কথা বঞ্চিত মানুষের কথাই রূপকথার একমাত্র বিষয় বস্তু। তা সে যে ভাবেই হোক। আর গুপ্তধন, রাক্ষসপুরী, রাজকন্যা এ সবই সম্পদের অঙ্গ বিশেষ। আবার রাক্ষস আর কেউই নয়, সেই প্রবঞ্চকের দল যারা মানুষের ন্যায্য অধিকার নিজের অধিনে রেখেছে। বন্দীকরে রেখেছে রাজকন্যাকে, মারণকাঠি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, অবদমিত করেছে সুন্দরকে, শুভ শক্তিকে। শ্মশানে পরিণত করেছে জনপদকে।

আর রাজপুত্র হল বীরপুরুষ। সে যেমন তার মায়ের দুঃখ মোচন করার জন্য, তেমনি আবার রাজকন্যার বন্দী দশা ঘোচাতে শক্ত হাতে তরবারি ধরে, সাহসের পরিচয় দিতে এগিয়ে যায়। তার হাতেই আছে জিয়ন কাঠি। কিন্তু কেবল সাহস আর শক্তি হলেই হবে না। সাহসের সঙ্গে চাই সুযোগ, যার আর এক নাম সৌভাগ্য। তাই সৌভাগ্যরূপী ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী পথ বলে দেয়, উপায় বলে দেয়। ভাগ্য সহায় না হলে অথবা সুযোগ না পেলে কোনো পুরুষকার, কোনো শক্তি, কোনো বিদ্যে কাজে লাগে না। কেবল বিদ্যা থাকলে হবে না, সেই বিদ্যা প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ত ক্ষেত্র থাকতে হবে। আবার সেই কাজের বোদ্ধা থাকা চাই। গুণগ্রাহীর কাছে গুণের কথা পৌঁছানো দরকার। রাজার কাছে বীরত্বের কথা পৌঁছাবে, তবেইতো তিনি রাজ্য আর রাজকন্যাকে সমর্পণ করবেন রাজপুত্রের হাতে।

আমরা কথায় কথায় বলি এই যুগটা হল প্রচারের যুগ। কিন্তু কেবল এই যুগ নয়, চির দিনই প্রচারের জয় জয়কার। তবে প্রচারের প্রকার ভেদ ঘটেছে। যে রাণী রাজার কাজে নিজের গুণপনা আর অন্যের দোষ ত্রুটি তুলে ধরতে পারে সেই রাজার প্রিয়পাত্রী হয়, তার ছেলেকে রাজা করার জন্য সৎছেলেকে নির্বাসনে বা ঘাতকের হাতে বধ্য ভুমিতে পাঠায়। নিজে অযোগ্য হয়েও সুখ ভোগ করে। চিরকাল অকর্ম্মারাই প্রচারমূখী হয়। কথায় আছে ফাঁকা কলসির আওয়াজ বেশি।

রূপকথায় একটা বিষয় হয়তো আমাদের নজর এড়াতে পারে না। সেটা হলো নারীমুক্তি। নারী চিরকাল অবহেলিতা। সাহিত্য ধরে ধরে আলোচনা করলে দেখা যায় রামায়ণ মহাভারতের যুগ পেরিয়ে আধুনিক ও উত্তর-আধুনিক কালে নারী নিয়ে সাহিত্য হয়েছে বিস্তর। রামায়ণে বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করা নিয়ে যে যুদ্ধ বেধেছিল তার পরিণতিতে কিন্তু সীতা তাঁর নিজস্ব মর্যাদা পাননি। আবার বনবাসী হতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সেই বনবাস সাধারণ মানুষ মেনে নেয় নি। তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। বাল্মীকি প্রত্যক্ষে ও প্রকাশ্যে রামচন্দ্রকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয় নি। সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। অবশেষে তাঁর স্থান হয়েছে মাতা বসুমতির কোলে। তবুও সীতা বিজয়িনী। কিছু স্বার্থপর মানুষ নারীর অবমাননার চেষ্টা করলেও সাধারণ মানুষ থেকে বাল্মীকির মতো পণ্ডিত ঋষি নারীর অবমাননার নিন্দা করে সীতাকে বিজয়ী করেছেন। বিজয়ী করেছেন সীতার মত বহু কোটি নারীকে।

যুগে যুগে নারীকে স্বাধীনতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে কিশোরী ও যুবতীদের স্বামী পছন্দ করার পদ্ধতি চালু ছিল। দেবযানী, কুন্তি, সত্যবতীদের বিবাহপূর্ব প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কালে লোর-চন্দ্রানী সহ বহু কাহিনীতে দেখা গেছে নিজের অযোগ্য স্বামীর পরিবর্তে সুপুরুষ স্বামী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ প্রথমে রাজি না হলেও পরে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ রাধাকৃষ্ণের কাহিনী। রাধা আয়ানের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমাজের সকলে তা না মেনে নিলেও, একটা অংশ তা সমর্থন করেছিল,

তারা হলো সখা-সখীরা। অর্থাৎ যুব সমাজ।

রূপকথার গল্পে দেখা যায় ঘুমন্ত বন্দিনী রাজকন্যা, ঘুঁটে কুড়োনী দুয়োরাণী মা, আর তাদের উদ্ধার করার জন্য, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, রাজপুত্র চলেছে ঘোড়ায় চেপে। কোথাওবা ঘোড়া নেই, পায়ে হেঁটে মরু পাহাড় জঙ্গল পেরিয়ে চলেছে। হঠাৎ কোথাও সে পেয়ে গেল পক্ষিরাজ, উড়ে গেল পাষাণপুরীর সন্ধানে। উদ্ধার করে আনল রাজকন্যাকে। বাড়ি ফিরে, মায়ের খোঁজ করে। পিতার কাছে নিজের সততা ও মাকে নিরপরাধ প্রমাণ করে । মা'কে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। আবার রূঢ় সিদ্ধান্ত থেকে পিতাকে নিরস্ত করে সৎমায়ের প্রাণ ভিক্ষে চেয়ে নেয়।

কিন্তু যুগের পরিবর্তন হয়েছে। তাই কেবল রাজপুত্র কেন আসবে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেতে? রাজকন্যাই বা কম কিসের? সে নিজেই পারে নিজেকে উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে। নিজেই পারে তরবারি হাতে লড়তে। চিরদিন পুরুষ নারীকে উদ্ধার করবে কেন? নারী কি পারে না নিজেকে রক্ষা করতে? আর সবাইকে রাজকন্যা বা রাজপুত্র হতে হবে তেমন কথাও নেই। সাধারণ কিশোর কিশোরী কি নিজেকে বড় করে তুলতে পারে না? তাই আমাদের গল্পে, রাজকুমারী দেবদ্যুতির হাতের তরবারি ঝলসে উঠেছে অত্যাচারী রাজকুমারের বিরুদ্ধে। পরাজিত ভূলণ্ঠিত রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে তুলতে কেবল দেবতার আশীর্বাদ নয়, নিষ্ঠাভরে ঔষধ প্রয়োগ করেছে। মাধবী সাধারণ মেয়ে, রাজপুত্রকে পরাস্ত করে বন্দী করেছে। তাকে জয়ে করে সেই জয়ের মালা মাধবী পরিয়ে দিয়েছে পরাজিত রাজপুত্র দেববাহুর গলায়। রাক্ষস নয় চিরদিন মানুষের বিরুদ্ধেই মানুষের লড়াই।

আর পুরুষ? নারীর কথা বলতে গিয়ে পুরুষকে অবহেলা করা যায় না। সায়ন্তনীকে রাণী করার জন্য বিধুকুমার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। রাজকন্যা সরমাকে মহারাণী করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেছে নীতীশকুমার। ভাগ্য বিড়ম্বিত সওদাগর সারাদেশ খুঁজেছে নিজের স্ত্রীকে। কিশোর কিশোরীদের মধ্যে ভালোবাসার টান না থাকলে মাটির পৃথিবী স্বর্গ হবে কি করে?

যাই হোক রূপকথা আসলে বীর-কাহিনী। বীরত্বের কাহিনী কিশোর মনকে আকৃষ্ট করে। তাই কেল রূপকথা নয়, গোয়েন্দা কাহিনী, যার মধ্যে একটা জয়ের গন্ধ আছে, সেটা শুধু কিশোর কেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে ছায়া ফেলে। তাই রূপকথার পর গোয়েন্দা কাহিনীর সমাদর।

কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে অপরাধ (crime) এবং অপরাধী (criminal) লুকিয়ে আছে। সুতরাং কোনো কোনো সময় কিশোর মন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া একটা বিভৎসতা কোনো কোনো সময় মনকে নাড়া দেয়। তখন কোনও কিশোর অপরাধকে দুঃসাহসী কাজ (adventure) বলে মনে করতে পারে। এমনটি হয়ও অনেক সময়। যা'র ফলশ্রুতিতে প্রেমিক প্রেমিকাকে, বন্ধু বন্ধুকে হত্যা করা'র মানসিকতা পর্যন্ত তৈরি হয়।

রূপকথার মধ্যেও অপরাধ এবং অপরাধী দু'ই আছে। তা না হলে রাজপুত্র কি ভাবে তার শক্তি এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। কিন্তু সেই অপরাধ এমন অবাস্তব ও অবান্তর যার সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই বললেই চলে। একেবারে রূপক। তাই শিশু বা কিশোর মনে জয়ের ইচ্ছা প্রবল হলেও অপরাধ কারার প্রবণতা মোটেই তৈরি হয় না। বরং অপরাধীর প্রতি তৈরি হয় ঘৃণা।

. আর একটা দিক হল, গোয়েন্দা কাহিনীতে অপরাধীর কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করা হয়, গোয়েন্দা কাহিনীতে অপরাধীরা নানা কৌশল অবলম্বন করে যা বাস্তবে সম্ভব। অপর দিকে রূপকথায় বীরত্বের কাহিনীই বেশি করে দেখানো হয়েথাকে। রূপকথার অপরাধী কেবল যাদু-শক্তি বা মন্ত্র-শক্তি প্রয়োগ করে, যা একেবারে অবাস্তব। তাই রূপকথা কিশোর মনের মধ্যে বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার ইচ্ছাটা জেগে উঠলেও অপরাধ করার সাধ জাগে না।

কেবল পুরুষ নয়, কেবল নারী নয়, নারী-পুরুষ উভয়ই স্থান পায় রূপকথায়। তাই 'জেঠুমনির গল্প'-এর মধ্যে নারী-পুরুষ দুয়েরই বীরত্ব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় রাখা হয়েছে। কোথাও কোথাওবা পুরাতন কাহিনীর আধুনিক বাতাবরণ কিশোর মনে রসবোধের সৃষ্টি করবে বলে মনে হয়। কারণ বহু বছর আগে কি হত তার ধারণা কিশোর-কিশোরীর নাও থাকতে পারে। এই বইয়ের গল্পগুলি পড়ে, আশা করি, তোমাদের ভালো লাগবে আর তবেই হবে "জেঠুমনির গল্প"-র সার্থকতা।

উৎসর্গ

আমার মা: ঁশান্তিময়ী;
আমার জেঠিমা : ঁসুরবালা;
তোমরা: ভোলা, পলা, অতসী,
নীলু, ঝুম্পা, মিতা, ভাবনা, কোচি,
টুম্পা যেখানে যত কিশোর-
কিশোরী আছো সব্বাই
আর:
তোমাদের জেঠিমা

কে

জেঠুমনির গল্প

সূচিপত্র

রাণী মাধবী

গল্প বল জেঠুমণি। আজ আমরা রাজপুত্রের গল্প শুনব। ভোলা, পলা, অতসী, নীলু, ঝুম্পা, মিতা, ভাবনা জেঠুমণির আসরের সব সদস্য। রোজ বিকেলের মতো আজকেও বাঁধানো তুলসী তলায় বসা মাত্র জেঠুমণিকে ঘিরে ছোটোর দলের বায়না শুরু হল। আজ ওরা শুধু রাজপুত্রের গল্প শুনবে। না, পক্ষীরাজ নয়, রাক্ষস খোক্ষসও নয়, শুধু রাজপুত্রের। বড়জোর ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি আর তলোয়ার।

-- তাহলে তো খুব বিপদে ফেললি তোরা। রাজপুত্র থাকবে, তার তলোয়ার থাকবে আর রাক্ষস খোক্ষস থাকবে না, ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী থাকবে না তা হলে গল্প হবে কেমন করে?

অতসী জেঠুমণির হাত ধরে টান মেরে বললে--তা জানি না, তুমি গল্প শুরু কর। একটা বড় করে গল্প, যেন সন্ধ্যা হয়ে রাত হয়ে যায়।

নীলু বললে--তুই চুপ্ করতো, বেশি বিরক্ত করিস্ নে, থাম। জেঠুমণিকে ভাবতে দে।

পলা বললে--গল্প বলতে হলে আবার ভাবতে হয় নাকি ? জেঠুমণিতো তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছে, আবার আমাদের বলবে, তুমি বলতো জেঠু, ও এক আধটা রাক্ষস্ টাক্ষস্ থাকে তো থাকুক । তাতে কিচ্ছু হবে না।

নীলু বলল--না, ঐ রাক্ষস বাজে। ওসব আবার আছে নাকি ? তুমি বল জেঠু, রাজপুত্রের গল্প বল।

জেঠুমণি এবার স্নেহের ধমক দিয়ে বললেন--আচ্ছা আচ্ছা হবে, তোরা একটু চুপটি করে বোস্ দেখি এখন। তোর জেঠিমা চা নিয়ে আসুক আগে, তারপর হবে।

--না, না তুমি শুরু কর, সবাই এক বাক্যে আবদার করতে লাগল। ইতি মধ্যে জেঠিমা বড় এক পেয়ালা চা আর মস্ত এক গামলা ভর্তি নারকোল শশা বাদাম মিশানো মুড়ি এনে হাজির করলেন। এ হল জেঠুমণির রোজকার জলখাবার। চায়ের পেয়ালাটা জেঠুর আর মুড়ির গামলি সবার। সবাই এক মুঠো করে মুড়ি চিবোতে লাগল। জেঠুমণি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে গল্প শুরু করলেন--

-- আচ্ছা বলতো, যারা কাজ শেখে তাদের কি বলা হয়?

সবাই এক বাক্যে বলল - শিক্ষানবিশ - এ্যাপ্রেন্টিস্।

জেঠুমণি বললেন দেখ, কোনো কাজ ভালো করে করতে গেলে সে কাজ আগে ভালো করে শিখে নিতে হয়। সে বিষয় ভালো করে জানতে হয়। রাজা হওয়াটা সবচেয়ে উঁচুদরের কাজ। সারা দেশের মানুষ তার কথামতো চলে। রাজ্য সামলাতে হয়, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেতে হয়, বিদেশের রাজার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, যাকে বলে বৈদেশিক-নীতি, আবার ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি আরো কতোকি। তাই রাজা হওয়াটা সম্মানের হলেও মোটেই সহজ কাজ নয়। আর কঠিন কাজের জন্য

কঠোর শিক্ষানবিশির প্রয়োজন। তাই রাজপুত্রদের বিশাল জ্ঞানের দরকার, কারণ রাজপুত্রইতো রাজা হবে। সেজন্য, সেকালের রীতি অনুযায়ী, লেখা পড়া শেষ হলে, রাজপুত্রদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গোপনে দেশ ভ্রমণে বেরুতে হতো।

ধর, রাজ্যের নাম মল্লপুর আর রাজার নাম মল্লবাহু। রাজপুত্রের নাম হলো দেববাহু। দেববাহুর যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি ভাল লেখাপড়ায়। তখনকার দিনে ষোল বছর বয়স হলে ছেলে বড় হয়েছে ধরে নেওয়া হতো। তাই দেববাহুর ষোল বছর বয়স হলে মল্লবাহু দেববাহুর দেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বন্ধু বয়স্যদের নিয়ে দেববাহু সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদ পরে জ্ঞান আহরণের জন্য দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমে নিজের রাজ্যে কিছুদিন নানা স্থানে ঘুরতে লাগল। সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছুদিন থেকে যুদ্ধবিদ্যা শিখল, নৌবাহিনীতে থেকে জাহাজ চালানো, নদী ও সমুদ্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে গ্রামের মানুষ দেখার জন্য প্রত্যান্ত গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

শুধু নিজের রাজ্যে ঘুরলেতো চলবে না, বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। তাই দেববাহু মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল। মল্লপুরের পাশের রাজ্য শল্যপুর। শুনেছে সে দেশের রাজা নিজে যেমন জ্ঞানী, তেমনি অন্য জ্ঞানী-গুণি মানুষের আদর করেন, প্রজারা সুখি, নির্ভিক, আর স্পষ্ট বক্তা।

দেববাহু দুই বন্ধুকে নিয়ে শল্যপুর রাজ্যে এল সাধারণ পর্যটকের বেশে। গোটা রাজ্য ঘুরে দেখল, কোথাও কোন সুখের চিহ্ন নেই। গ্রামের সমস্ত মানুষ দারিদ্রের ভারে জর্জরিত। কৃষকদের অবস্থা অতীব খারাপ। কেবল সেনা বাহিনীর লোকের অবস্থা ভালো, তারাই কেবল সুখে শান্তিতে বাস করছে। সেনা বাহিনীর লোক জন রাজকর আদায় করে রাজকোষ পূর্ণ করে দেয়। নিজেরা কর দেয় না। রাজা শল্য সেন দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণি মানুষদের নিয়ে রাজসভা আলো করে বসে থাকেন। বিদেশ থেকে কোনো লোক এলে, তাকে খুব খাতির করে দেশের লোকের সুখ শান্তির কাল্পনিক গল্প শোনানো হোত। কিন্তু সেই সব মানুষকে একলা রাজ্যের মধ্যে ঘুরতে দেওয়া হয় না। আদর খাতির পেয়ে তারাও সব আনন্দে আট খানা হয়ে যায়। তারপর সেই সব বিদেশী নিজ নিজ দেশে গিয়ে শল্যপুরের গুণ কীর্তন করে বেড়ায়। কবিরা রাজাকে নিয়ে পদ্য লেখে, পণ্ডিতেরা কাহিনী লেখে রাজ্যের লোকেদের নিয়ে। সেই কাহিনী পড়ে অন্য রাজ্যের লোকেরা ধন্য ধন্য করে।

হাটে-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে দেববাহু আর তার বন্ধুরা প্রকৃত মানুষেব সাক্ষাৎ পেল। জানতে পারল তাদের আসল অবস্থাটা। বাজারে গিয়ে দেখে, বাজারে যত ভাল ভাল জিনিস বিক্রি হতে আসে, তার সিংহ ভাগ রাজপুরুষেরা নাম মাত্র দাম দিয়ে অথবা বিনা মূল্যে নিয়ে চলে যায়।

একটি ত্রয়োদশী বালিকা কয়েকটি পাকা পেঁপে ধামায় করে নিয়ে বাজারের এক ধারে বিক্রি করতে বসেছে। কোন রাজপুরুষ বা সৈনিক তার ফল কিনছে না বা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে না। রাজপুত্র দেববাহু তার পেঁপের দাম জিগ্‌গেস করতে সে চট্‌ পট্‌ উত্তর দিল 'এক কড়া কড়ি', আর এই এক কড়া না দিলে সে পেঁপে কিছুতেই দেবে না।

দেববাহু বলল — আচ্ছা আমি যদি তোমায় দু'কড়া কড়ি দিই?

মেয়েটা চট্ জলদি জবাব দিল -- না, আমি বেশিও নেব না কমও নেব না। আমার মা বলেছেন -

এক কড়ায় তরি এক কড়ায় মরি
এক কড়ায় রাজধানী গড়ি।

দেববাহু বলল আচ্ছা তাই হবে, তোমার প্রতিটি ফল আমি এক এক কড়া কড়ি হিসাব করে দেব, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে যাব।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—এক কড়া করে হিসাব করে কড়ি দাও, তারপর তোমার ফল তুমি নাও। বিক্রি করা ফল আমি বাড়ি নিয়ে যাব না। যেতে চাইলে ফল রেখে তুমি আমার বাড়ি যেতে পার।

দেববাহু বুঝতে পারল, মেয়েটি অতি বুদ্ধিমতি। দাম দিয়েও যদি ফল ফেরৎ দেয় তবে তা দান করা হবে। সে কারো দান গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাই দাম নেওয়ার পর সেই বিকোনো জিনিস বাড়ি নিয়ে যাবে না। দেববাহু হিসাব করে দাম মিটিয়ে দেবার সময়ে ইচ্ছা করে দাম কম দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটি অত্যন্ত সুচতুর, সে রাজপুত্রের চালাকি ধরে ফেলল। দৃঢ় স্বরে বলল—তুমি আবার হিসাব জানো না, আমার সঙ্গে চালাকি? রাজপুত্র হাসল, হাসল বন্ধুরাও। তারপর রাজপুত্র মূল্য চুকিয়ে দিয়ে মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্রের কছে ফলগুলি দিয়ে, তাদের বলল — তোমরা সরাইখানায় ফিরে যাও, আমি এই মেয়ের মায়ের সঙ্গে এক বার দেখা করে আসি।

মেয়েটার নাম মাধবীলতা। মাধবীর বাবা এক সময় রাজ সৈনিকের কাজ করতেন। কোন এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন। অন্য সৈনিকেরা যখন পশ্চাদপসরণ করে, তখন তিনি অপার বীরত্ব প্রকাশ করে শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সহযোদ্ধারা পলায়ন করেলে তিনি যুদ্ধে নিহত হন। কন্যা মাধবীকে নিয়ে মা তখন ঘোর বিপাকে পড়েন। রাজা তাঁর সৎ নির্ভিক বীর সৈনিককে পুরস্কৃত করা বা তার বিধবা স্ত্রী ও অনাথ সন্তানের দায়িত্ব না নিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজায়াপ্ত করলেন। তাই মাধবীলতা আর তার মা, গ্রামের প্রান্তে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন।

মাধবীর মায়ের কাছ থেকে রাজপুত্র সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর সে নিজের পরিচয় মাধবীর মাকে জানালো। কিন্তু রাজপুত্র তাঁর অতিথি হয়েছে জেনেও মাধবীর মা তার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন না। অথচ দেববাহু চেয়েছিল তার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে, তার মর্যাদা অনুযায়ী আহার পানীয়র ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু মাধবীর মায়ের মতে—অতিথি বাড়িতে এলে যদি তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে তাতে আড়ম্বর বজায় থাকতে পারে, কিন্তু আন্তরিকতা থাকে না। ভালবাসায় টান পড়ে। অতিথির অর্থে অতিথি সেবা তো, 'গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা'। সেটা ভাল মানায় না। সুতরাং গরীবের বাড়িতে যদি এসেছো, গৃহস্থের সাধ্যমত আতিথ্যই গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ শাকান্ন যা সংসারে যোগাড় করতে পেরেছেন, মেঝের উপর সাধারণ আসন পেতে বসিয়ে, তাই খেতে দিলেন। তবুও চিরদিন রাজভোগ খেয়ে আসা দেববাহুর

মুখে মাধবীর ময়ের রান্না অমৃতের মতো লাগল। রাজপুত্র ভাবলো, এই খাবার না খেলে হয়তো জীবনে একটা স্বাদ অস্বাদিত রয়ে যেত। তবু রাজপুত্র দেববাহু মাধবীর মায়ের এই ব্যবহারে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে মাধবীর মায়ের দুঃখ দূর করতে চায়। অনেক ধন রত্ন দিতে চায়। অথচ মাধবীর মায়ের তাতে সায় নেই। সে বলে বাবা তুমি যেমন আমাদের ভালবেসে এসেছো, তেমনি আমাদের শাকান্ন গ্রহণ করেছো এটাই আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের আনন্দ, ধন রত্ন নিয়ে কি করবো? আমাদের দুঃখ আমাদের থাক্। পরের অর্থে সুখ থাকতে পারে, কিন্তু শান্তি নেই। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার দয়ার শরীর। তোমার প্রজাদের সুখি করো। আমার আশীর্বাদ রইল।

এদের স্বাধীনচেতা ভাব, দেববাহুর কাছে অহঙ্কার বলে মনে হল। এত ধনরত্ন সে দিতে চায়, অথচ এক দুঃখিনী নারী তা নিতে অস্বীকার করে। এটা রাজপুত্রের অবমাননা ছাড়া আর কি হতে পারে? মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু না বলে, শাক ভাজা আর ডুমুরের ঝোল দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সারল।

দেববাহু মাধবীর মাকে বলল, সে মাধবীলতাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু মাধবীর মা বললেন, তিনি অত্যন্ত গরীব। রাজপরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ করা তাঁর মানায় না। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। অসম বন্ধুত্ব অপ্রীতিকর হতে বাধ্য। তবুও দেববাহু জেদ্ ধরল। সে বলল, মাধবীলতাকে তার ভালো লেগেছে।

মাধবীর মা ভাবলেন তা হবেই বা। নিজের মেয়েকে সকলে সুন্দরী ভাবে কিন্তু মাধবীলতা সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। তাই কৈশোর পার না-হওয়া মাধবীকে নিয়ে মায়ের চিন্তা একটা ছিল। সব মায়ের মতো মাধবীর মাও মাধবীর বিয়ে নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভাবলেন হয়তো ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। নিজের জেদ্ বজায় রাখতে মেয়ের সুখ তিনি কেড়ে নিতে পারেন না। কথায় আছে সুযোগ একবার আসে। চলে যাওয়া গাড়ি, বয়ে যাওয়া সময়, ছেড়ে দেওয়া সুযোগ আর ফেরে না।

সাত পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন মাধবীর মা। তবে তাঁর শর্ত হল-- মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবেন, কিন্তু বিবাহের পর এ বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। রাজবধূ, রাজপুত্রের সম্মান রক্ষা করার মতো সাধ্য তাঁর নেই। আর জামাই-এর অর্থে নিজে প্রতিপালিত হওয়া অথবা মেয়ে-জামাই-এর আতিথ্য করা তাঁর রুচিতে বাধে। সেটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সেইমত রাজপুত্র দেববাহুর সঙ্গে মাধবীলতার গোধুলি লগ্নে বিবাহ হল। বাজ-বাজনা নেই, নেই কোনো আড়ম্বর। নিজের বেনারসী পরিয়ে চন্দনের কোঁটা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দিলেন। মাধবীর মায়ের যা দু' এক খানা গয়না ছিল, তাই পরিয়ে দিলেন। মাধবীর সুন্দর কিশোরীসুলভ মুখ খানি যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠল। মন্ত্র উচ্চাবণ করে, পুরোহিত মাধবীলতার বিয়ে দিলেন। পাড়ার মেয়ে বউরা কনে সাজালো, উলু দিল, শাঁখ বাজালো, কিন্তু রাজপুত্রের পরিচয় জানতে পারলো না। সকলে জানলো মল্লপুরের এক ধনী যুবকের সঙ্গে মাধবীর বিবাহ হল।

দেববাহুর একটা কপর্দকও মাধবীর মা গ্রহণ করলেন না। বললেন--যা দিতে হয়, যেভাবে সাজাতে হয় বাড়ি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে তুমি মনের মতো করে সাজিও। আমি দুঃখিনী, আমার সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।

আনন্দে মায়ের চোখ ফেটে জল এল, আবার কোনো এক অজানা আশঙ্কায় মায়ের অন্তর আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ভাবলেন অযথা আশঙ্কা স্নেহের দুর্বলতা। তাই অমঙ্গল অশ্রু গোপন করে হাসি মুখ বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন। তাঁর কেবল মনে হতে লাগলো 'আজ যদি মাধবীর বাবা বেঁচে থাকতেন, রাজপুত্র জামাই দেখে কতইনা খুশি হতেন, আর সিদ্ধান্তটাও তাঁকে একাকে নিতে হতো না।'

সকাল বেলা রাজপুত্র দেববাহুর সঙ্গে মাধবীলতা মল্লপুর রওনা হবে। সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর একজন দাসী। শল্যপুর আর মল্লপুরের মাঝখানে বিশাল অরণ্য। সেই বনের দুর্গম পথ পার হতে হবে তাদের। পাল্কি চেপে চলল মাধবী আর তার বুড়ি দাসী। ঘোড়ার পিঠে চেপে চলল তিন যুবক। দুপুরে তারা বনের ধারে এল। একটি পুস্করিণীর তীরে দুপুরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হল। আহারের পর পাল্কি বেহারাকে বিদায় করে দিয়ে রাজপুত্র ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিল মাধবীকে আর মন্ত্রীপুত্রের ঘোড়ায় দাসী। চলল বনের পথে। সন্ধ্যা নেমে এল। আকাশে গোল চাঁদ উঠল। সেই আলোতে তারা আরো কিছু দূর চলে গেল। একটি নদীর ধারে সুন্দর জায়গা দেখে থামল তারা।

এখানে রাত কাটাতে হবে। মাধবীর ভয় করতে লাগল। বুড়ি দাসী বলল —''মা, ভয় কিসের। তোমার স্বামী রয়েছে সাথে। তুমি রাজরাণী, তোমার ভয় করলে চলে''। ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই তাদের। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মাধবী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু অজানা আনন্দের সঙ্গে ভয় মিলে মিশে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করল। কাল সে ছিল দুঃখিনী মায়ের কোলের মেয়ে। আজ সে রাজরাণী হবার পথে। কিন্তু কাল সে ছিল মায়ের কোলে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে, আজ সে অকূলে, চলেছে অনিশ্চিত সুখের হাত ছানিতে। তাই এটুকু কষ্টতো করতেই হবে। সেকি সুখের রাজপথ, নাকি কোন গভীর দুঃখের পূর্বাভাস।

সামান্য যা আহার্য তাদের সঙ্গে ছিল, মাধবী নিজের হাতে সবাইকে তা ভাগ করে দিল। নিজের জন্য বড় একটা কিছু রইল না। আকাশে চাঁদ মাথার উপর উঠে এসেছে। পাতার ফাঁক দিয়ে দু' চারটে তারা দেখা যাচ্ছে। গাছ তলাতে শুয়ে দিগন্ত-বিস্তারী আকাশ দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে সদ্য বিবাহিত স্বামীর পাশে নিশ্চিন্ত মনে কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল মাধবী। বুড়ি দাসীতো শুয়েই ঘুমিয়েছে। তার বিশাল নাসিকার বিকট গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সেই সুযোগে রাজপুত্র দেববাহু মাধবীলতার আঁচলে এক কড়া কড়ি বেঁধে দিল, তার পর তিন বন্ধুতে ঘোড়ায় চেপে চাঁদের আলোতে বনের পথ ধরে কোথায় মিলিয়ে গেল। দুই হতভাগিনী বনের মধ্যে পড়ে রইল। এ ভাবে রাজপুত্র তার অপমানের প্রতিশোধ নিল।

বনের পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল মাধবীর। যেন স্বপ্ন মনে হল মাধবীর। এ কোথায় এলো সে। বুড়ি দাসীকে ঘুম ভাঙিয়ে ডাকল। সবই সত্য, স্বপ্ন নয়। তার সদ্য-বিবাহিত স্বামী তাকে বনবাসে দিয়ে গেছে। আঁচলে এক কড়া কড়ি বেঁধে দিয়ে পরশুদিনের এক কড়া কড়ির অহঙ্কারকে ব্যঙ্গ করে গেছে রাজপুত্র, রাজ্যের ভাবি রাজা। ভাবল মাধবী 'কত নিষ্ঠুর হতে পারে মানুষ। ক্ষতি তো কিছু সে করেনি দেববাহুর। শুধু সে তার নিজের মাথাটা উঁচু রাখতে চেয়েছিল। তবু ভাল, আঘাত দেওয়ার জন্য একটা লোকেরওতো প্রয়োজন ছিল। বড় আঘাত মানুষের বড় হবার পথ প্রশস্ত করে।' তাই এ সময়ে ভেঙে পড়া উচিত মনে করল না মাধবী। নিজেকে মনে মনে শক্ত করল সে।

শৈশব আর কৈশোরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা এত টুকু মেয়ে। এ সময় তার ভাউ ভাউ করে কাঁদবার কথা, কিন্তু সে ভয় পেলেও তা প্রকাশ করল না। অপর দিকে বুড়ি দাসীতো হাত পা ছড়িয়ে হাঁউ মাউ করে কাঁদতে লাগল — ওগো আমার কি হলোগো, আমি এখন কোথায় যাব গো।

বিপদের সময় দুর্বলতা আরো বিপদ ডেকে আনে। এত টুকু মেয়ের মনে যে এতো সাহস ছিল তা সে নিজেও জানতো না। বিপদে না পড়লে বোধ হয় মানুষ আত্ম সচেতন হয় না। হয়তো উঠতি বয়সে মানুষ একটু বেশি জেদি হয়। আর এই জেদটা কাউকে নিয়ে যায় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে কেউ যায় অতলে তলিয়ে।

মাধবী স্থির হয়ে বসে আছে। ভাবনা আসে না তার মাথায়। সামান্য মেয়ে, কত টুকুইবা তার বুদ্ধি। তবু সে নিজের বুদ্ধি আর সাহসে ভর করে ভাগ্যকে জয় করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হলো। হতাশ বুড়ি বলল -- চল্ মাধবী, আমরা বাড়ি ফিরে যাই। হাঁটতে থাকলে সন্ধ্যার আগে কোনও গ্রামে পৌঁছে যাব।

কিন্তু পথ কোন দিকে? কোনো মানুষ জন নেই, কেবল বন আর বন। বিপদের সময় বুড়িকে হতাশ না হতে উপদেশ দিল মাধবী। হতাশ হলে বিপদ আরো বাড়বে বৈ কমবে না। নদীর জলে স্নান করে বেরিয়ে পড়ল দু'জন। কিছুটা যেতেই দেখল পথ আরো প্রশস্ত হয়েছে। মাধবী ভাবল নিশ্চই এই পথ ধরে মানুষ যাতায়াত করে। তাই সেখানেই অপেক্ষা করল তারা। ততক্ষণে সূর্যের আলো সারা বনময় ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ি কিছুতেই অপেক্ষা করতে রাজি নয়। মাধবী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, কাল সে শিশু ছিল মায়ের কোলে, আজ সে রাজপুত্রের স্ত্রী, রাজবধূ। আজ সে পরিণত বিশ্ব জগতের মাঝখানে। এত সহজে আর মায়ের কছে ফিরে যাওয়া তার সাজে না।

বুড়ি বলে--রাজরাণী কোথায়? এখনতো আমাদের বাঁচার আশাটাই নেই। কেনই যে মরতে তোমার সঙ্গে এয়ে ছিনু। জেবনটা বেঘোরে গ্যাল গা।

মাধবী দেখল এ সব বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। তাই সে বলল — ঘোড়ায় চেপে যতটা পথ একদিনে এসেছে, পায়ে হেঁটে ততটা পথ ফিরে যাওয়া যাবে না। তা ছাড়া যাবে কোন দিকে? বনের পথ ধরে হয়তো কোনও গ্রামে পৌছানো যাবে কিন্তু বনের পশুর চেয়ে মানুষ মোটেই নিরাপদ নয়। তা যদি না হতো, তাহলে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে

তার স্বামী চলে যেতে পারতো না। মাধবী বুড়িকে 'উত্তর দিক কোনটা' জানতে চাইলে সে একবার এদিক, একবার ওদিক দেখাতে লাগল। যদিও আকাশে সূর্য ছিল তবুও বুড়ি দিক নির্ণয় করতে পারলো না।

অবশেষে ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেল বুড়ি। তখন সে মাধবীর কথায় রাজি হল। বলল -- "তুমি যেখানে যাবে, যেখানে থাকবে, আমিও তোমার সাথে সাথে থাকব।" যখন এই সব সাত পাঁচ আলোচনা হচ্ছে এমন সময় কিছু মানুষের কথা বার্তা শুনতে পেল তারা। চোর ডাকাত হতে পারে। হলোইবা দিনের বেলা, নির্জন অরণ্য। কি হতে পারে, আর কি হতে পারে না তা কে জানে?

চার পাঁচ জন মানুষ মাথায় মাল পত্র নিয়ে বাজারের দিকে চলেছে। মাধবী ভাবল বাজার যখন আছে, নিশ্চই কাছাকাছি কোথাও না কোথাও গ্রাম আছে। তাদের কাছ থেকে জানতে পারল হাট কাছাকাছি আছে, তা ঘণ্টা খানেক হাঁটতে হবে। বনের প্রান্তে যারা বাস করে তারা নানান জিনিস ঐ হাটে বিক্রি করে। আর গ্রাম এবং শহরের মানুষ সেই জিনিস পত্র কিনে নিয়ে যায়।

মাধবী বুড়িকে বলল—মাসি, তুমি এই এক কড়া কড়ি নিয়ে এদের সঙ্গে বাজারে যাও। এ দিয়ে যে কটা খই আর মুড়ির মোয়া হয় কিনে নিয়ে এসো। আমি এই গাছ তলায় বসে আছি। বুড়ি চলে গেল। মাধবী দেখল যাতায়াতে দু' ঘণ্টা সময় লাগবে। এই দু' ঘণ্টা সময়ের মধ্যে জায়গাটা একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখা যেতে পারে। বুড়ি ফিরে আসার আগে ঠিক এই জাগয়ায় তাকে ফিরে আসতে হবে।

কিছু দুর গিয়ে দেখল কয়েকটা মেয়ে নদীতে জল নিতে এসেছে। মাধবীলতা ভাবল তাহলে তো এখানে মানুষের বসবাস আছে। এদের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারলে কাজ হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল ওরা অরণ্যবাসী। বনে কুটির বেঁধে থাকে। মাধবী তাদের কুটির দেখতে গেল। দেখল দারিদ্রের মধ্যে আনন্দ। বলল তাদের কুটিরে সে থাকতে চায়। ওরাতো এক কথায় রাজি।

ঠিক জায়গায় ঠিক সময় ফিরে এল বুড়ি। আঁচলে বাঁধা কয়েটা মোয়া। মাধবী তার হাত থেকে মোয়া ক'টা নিয়ে নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চলল। এক জায়গায় দেখল গাছের ডালে ডালে অনেক ময়ুর বসে আছে। মাধবী আঁচলের মোয়া ভেঙে মাটিতে ছড়াতে লাগল। বুড়িতো রেগে আগুন। যদিবা মোয়া খেয়ে একটু জল খাওয়া যেত ঐ মেয়ে তাও নষ্ট করল। মাধবী বুড়িকে নিয়ে দূরে সরে গেল। ময়ূরগুলো খাবারের লোভে নীচে নামল, আর নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি করতে লাগল। তাতে তাদের সুন্দর পালকগুলো খসে খসে পড়তে লাগল।

মাধবী যত্ন করে পালকগুলো কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে সুন্দর সুন্দর ব্যজন বা হাতপাখা তৈরী করল। তারপর বুড়িকে বলল যাও, যদি পার এর কয়েকটা বিকেলের বাজারে বেচে এস। যদি কিছু পয়সা পাও তা দিয়ে সামান্য চাল আর আনাজপাতি নিও। নিও একটা মাটির হাঁড়িও। বুড়ি গজ্ গজ্ করতে করতে চলল। কোথায় রাজ বাড়িতে গিয়ে

ভাল মন্দ খাবে, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে তা না এখন তাকে অঘোর বনে বেঘোরে 'পেরাণটা' দিতে হচ্ছে। তা কি আর করা যাবে। চলল বুড়ি।

বাজারে ব্যজনগুলো ভাল দামেই বিক্রি হল। বুড়ি খুব খুশি হয়ে বাজার হাট করে মাধবীর কাছে ফিরে এলো। রাতটা বনবাসীদের কুটিরে কাটাল তারা। পরদিন আবার ময়ূর পাখার নানান জিনিস দিয়ে বুড়িকে বাজারে পাঠাল মাধবী। ক্রমে কাঠুরেদের সঙ্গে আলাপ করল মাধবী। বলল তোমরা ভাল ভাল কাঠ আমাকে দাও। আর ভাল ছুতোর মিস্ত্রী আমার কছে নিয়ে এসো। আমি তোমাদের অনেক দাম দেব। তারা মহা খুশি, ভাবল বেশতো তাদের আর কাঠ বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। অথচ বেশি দাম পাবে। কেউ কেউ আবার মাধবীকে বনদেবী ভাবতে শুরু করে দিল। হয়তো তাদের দুঃখ ঘোচাতে ভগবান মাধবীকে পাঠিয়েছেন।

মাধবী ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি নানা আসবাব পত্র তৈরী করাল। আর সেগুলোকে বাজারে পাঠাল। তা থেকে সে অনেক দাম পেল। যারা এতদিন কাঠুরেদের কাছ থেকে কাঠ কিনতো তারা খবরাখবর নিয়ে মাধবীলতার কাছে আসতে লাগল। মাধবী তাদের বলল—না, কাঠতো আমরা বেচব না। তোমাদের যার যা দরকার আসবাব পত্র, জ্বালানী কাঠ এখান থেকে নিয়ে যাও। ব্যবসা কর।

ধীরে ধীরে মাধবীলতা বনের একজন ব্যবসায়ী মহাজন হয়ে উঠল। বনের মধ্যে বিশাল কাঠের ঘর বানিয়ে বাস করতে লাগল। না, বুড়িকে আর খাটা খাটনি করতে হয়না। এখন মাধবীর বাড়িতে অনেক লোক জন। রাজা না হলেও তারা বড়লোক। দুর্দিনের সহায়ক মাসি গিন্নির মর্যাদায় বহাল তবিয়তে আছে।

মহাজন ব্যবসায়ী, যারা এত দিন পুরোটাই লাভ করত আর কাঠুরেদের ঠকাতো কম দাম দিয়ে, তাদের লভাংশে কম পড়ল। তাই তারা মাধবীকে মানবে কেন? কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে বনের কাঠুরেদের হাত করে ফেলল। সুতরাং তারা গেল রাজার কাছে নালিশ করতে।

রাজার পাইক এসে তলব দিল। মাধবী এবার রাণীর বেশে শিবিকা চেপে রাজ বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। সাথে চলল বনবাসী সহচর-পরিচারিকা। এ আবার অন্য রাজা, অন্য রাজ্য। শল্যপুরও নয় মল্লপুরও নয়। রাজ্যের নাম বীরপুর। রাজার নাম বীরবাহু। মাধবী রাজাকে নজরাণা দিয়ে বললে — অরণ্যতো কারো রাজ্য হতে পারে না। তা তোমার রাজ্যের নিকটবর্তী। বেশ ভাল কথা, আমার নামে গোটা বনটাই জমা কর। আমি তোমায় কর দেব। আর তোমার পাইকরা আমার বন পাহারা দেবে, যাতে অন্য কাঠুরে বন থেকে কাঠ না কাটতে পারে। মধু আর অন্যান্য সম্পদ নিতে নাপারে।

রাজা ভাবলেন বেশতো ভাল প্রস্তাব। এত দিন বন থেকে তো কোন আয় রোজগারই হত না। এখন যদি সেই অরণ্য থেকে কর বাবদ অর্থ পাওয়া যায় তাহলে রাজকোষ আরো স্ফীত হবে। রাজার আয় বাড়বে। ঠিক আছে তাই হবে। রাজা সম্মতি দিলেন। দেওয়ান জানতে চাইলেন — কি নামে জমা হবে?

মাধবী বলল — লিখুন, "রাণী মাধবী"।

• • •

কাঠুরে পাড়ায় উৎসব শুরু হয়ে গেল। আজ থেকে এ বন তাদের। তাদের রাণীর। অন্য কাঠুরে আর এ বনে আসবে না। মহাজনরা তাদের ঠকাতে পারবে না। তারা রাণী মাধবীর জয় ধ্বনি দিতে লাগল। তৈরী হল রাণী মাধবীর প্রাসাদ। বন কেটে মাধবী বসতি গড়ে তুলল। নিষিদ্ধ হল বনের নিরিহ পশু শিকার। বনের কাঠ ফল মধু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা শুরু হল, রাণী মাধবীর আদেশে। যত্র তত্র গাছ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল মাধবী। অযথা গাছ কাটা চলবে না। বড় বড় দরকারি গাছ কাটা হবে। আর সেই জায়গায় আবার শাল, সেগুন, আর নানা জাতের ফলের গাছ বসানো হবে, যাতে অরণ্য থাকে চির সবুজ।

নদী সংস্কার করে নৌকা চলাচল শুরু হলো। তাতে পরিবহনের সুবিধে হলো। লোকে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করতে পারল। নৌকো তৈরী করার জন্য মিস্ত্রী মজুর কাজ পেল। নিয়োগ করা হল মাঝি মল্লা। আর বাড়তে লাগল ব্যবসা বাণিজ্য।

রাণী মাধবীর সুন্দর একটি সংগঠিত রাজ্য তৈরী হল। রাজ্যের নাম হল মাধবীপুর। পাইক পিয়াদা লোক লস্কর কিছুরই অভাব রইল না। জীবিকার প্রয়োজনে যেমন নানান মানুষ আসতে লাগলো, তেমনি দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুনি মানুষ এসে বাস করতে শুরু করল। স্থাপিত হলো পাঠশালা। সেখানে সকলের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করতে লাগল। শিক্ষান্তে হাতের কাজশেখানো হলো ছেলে মেয়েদের। প্রতিটি প্রজার রুজি রোজগারের জন্য নির্দিষ্ট কাজ ঠিক করে দেওয়া হলো।

পূজার জন্য স্থাপিত হলো দেব মন্দির। আনন্দের জন্য মন্দির প্রাঙ্গনে বাৎসরিক উৎসব। মেলা বসল এখানে ওখানে। বিনোদনের সঙ্গে বাণিজ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। শত্রুর হাত থেকে দেশ ও দেশের মানুষ আর সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তৈরী হল রক্ষি বাহিনী আর সেনা বাহিনী। বিদেশ থেকে দক্ষ ও শিক্ষিত সমর বিশারদ এনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো দেশীয় সৈনিকদের। পুরুষ বাহিনীর পাশাপাশি গড়া হলো নারী বাহিনী। কেবল সৈন্য দিয়ে দেশ রক্ষা হয় না। তাই রাণী নিজে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করতে শিখল। রাণী মাধবীর অসি চালনা, বল্লম ছোঁড়া, দেখে উৎসাহ বোধ করতে লাগলো অন্যান্য যুবক যুবতীরা, তারা অন্য কাজের সাথে যুদ্ধবিদ্যাও শিখতে লাগলো।

কোথায় অরণ্য? ছোট্ট মেয়ে মাধবীর বুদ্ধিমত্তায় মাধবীপুর এখন এক আধুনিক জনপদ। মাত্র পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে মাধবী পুরের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

● ● ● ●

এদিকে মল্লপুরের রাজপুত্র দেববাহু যুবরাজ হলেন। বৃদ্ধ রাজা মল্লবাহু বানপ্রস্থে চলে গেলেন। কিন্তু দেববাহুর মনে সুখ নেই। সারাক্ষণ মাধবীর কথা মনে পড়ে। আর কোনো এক অপরাধ বোধ কাজ করতে থাকে তার মধ্যে। একাকী এক বালিকাকে অরণ্যের মধ্যে ছেড়ে এসে কাজটা ভাল করেনি সে। তবু কথাটা তিন বন্ধু ছাড়া কেউই জানে না। আর কাউকে জানানো যায় না। নিজের অপরাধী মন নিয়ে সারাক্ষণ মন মরা হয়ে থাকে। রাজ কাজে মন বসে না। বিবাহের প্রস্তাব এলে কেবল মাধরীর কথা মনে পড়ে। তাই নানা

অছিলায় এড়িয়ে চলে সে। যদিও মাধবীর হদিস্ পাওয়ার আশা সে ছেড়ে দিয়েছে তবু যেন মন সায় দেয় না। নিরালায় আলোচনা করে তিন বন্ধু। রাজপুত্রের বিবাহ না হলে মন্ত্রীপুত্র বা কোটালপুত্র বিবাহ করে কি করে? একে রাজা তার ওপর বন্ধু।

বিশাল রাজ্য সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছে দেববাহু। এদিকে তার শত্রু সংখ্যাও কম ছিল না। রাজপুত্রের রাজা হওয়াটা খুবই সহজ কথা, কারণ এটাই নিয়ম কিন্তু রাজ্য সামাল দেওয়া সহজ কাজ নয়। ক্ষমতার চারি দিকে ঘিরে থাকে স্তাবক, আর সম্পদের চারি দিকে ঘিরে থাকে সম্পদ লোভী, যার অপর নাম শত্রু। রাজার ক্ষমতা আর সম্পদ দুইই আছে, তেমনি স্তাবক চাটুকারের সাথে আছে অসংখ্য শত্রু।

রাণী মাধবীর গুপ্ত চর গেল মল্লপুরে। সমস্ত সংবাদ নিয়ে এল। রাণী জানতে পারল বীরপুর রাজ্য মল্লপুর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু দেববাহুর আত্মরক্ষা করার শক্তি যথেষ্ট নয়। সুতরাং মল্লপুর বিপন্ন। অন্য রাজ্য মল্লপুর আক্রমণ করার আগে মল্লপুরকেআক্রমণ করাটাই মল্লপুরকে বাঁচানো উৎকৃষ্ট উপায়। তাই রাণী মাধবী বীরপুরে লোক পাঠালো। কথা দিল, মল্লপুর আক্রমণ করলে সে বীরপুরকে সাহায্য করবে। কিন্তু বন্দী রাজাকে রাণী মাধবীর হাতে তুলে দিতে হবে। কোন অবস্থায় কোন অছিলায় যুবরাজ দেববাহুকে হত্যা তো দূরের কথা সামান্য আঘাতও করা চলবে না। বীরপুর সেই সুযোগটাই চাইছিল। একেবারে এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

রাণী মাধবীর সৈন্য বাহিনীতে পুরুষ সৈনিক আর নারী সৈনিকের আলাদা ব্যবস্থা আছে। নারী বাহিনীর সেনা নায়িকা মালতিলতা, মাধবীর সহচরী। আর রাণীকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য রয়েছে মালবীকা, মাধবীলতার মন্ত্রী। দু'জনেই যেমন সুন্দরী তেমনি দক্ষ। বিদেশ থেকে সমর বিশারদ এনে সেনা বাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তোলা হয়েছে। ঘোড়ায় চেপে অসি চালনায় দক্ষ নারী পুরুষ রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।

যথা সময়ে বীরপুরের সেনা মল্লপুর আক্রমণ করল। রাজা দেববাহু বীরের মত যুদ্ধ করল। দেববাহুর বীরত্ব দেখে মাধবী অত্যন্ত খুশি হল। আর যাই হোক তার স্বামী বীর পুরুষতো বটে। কিন্তু তাতে কি হবে? যখন বীরপুরের সেনারা পরাজয়ের মুখে ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে মাধবীপুরের সেনারা মল্লপুর আক্রমণ করল। ফলে মল্লপুরের পতন ঘটল। মাধবীপুরের পুরুষ বাহিনী বীরপুরের সেনা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলে মল্লপুরের রাজা দেববাহু পরাজিত ও বন্দী হলেন। মাধবীপুরের নারী বাহিনী মল্লপুরের রাজ প্রাসাদ দখল নিল।

সাথে সাথে রাজাকে ঘিরে ফেলল মাধবীপুরের সেনারা। তাদের রাণীর নির্দেশ, কোনো ভাবে যেন দেববাহুর গায়ে আঁচড়টি না লাগে। কারণ বন্দী হলেও রাজা সম্মানিত ব্যাক্তি। শত্রুকে মর্যাদা দেওয়াই বীরের গৌরব। কেবল রাজা নয় কোনও পরাজিত বন্দীর যেন কোনো রূপ অমর্যাদা না হয়, বিজিত দেশের নারীর সম্মান ও প্রজার সম্পদ যাতে লুণ্ঠিত না হয় সে কথা রাণী মাধবী তাদের বলে দিয়েছে। সুতরাং রাণীর কথার অমর্যাদা তারা করবে না। পরাজিত বন্দীদের নিয়ে সৈন্যরা ফিরে এল মাধবীপুরে। সঙ্গে বন্দী রাজা দেববাহুও।

জয়ের আনন্দে বীরপুরে উৎসবের জোয়ার চলছে। সেনারা নিজের ছাউনিতে বিশ্রাম করছে। হঠাৎ রাণী মাধবীর নির্দেশে এক দল সৈন্য বীরপুর আক্রমণ করল।

অতি সহজে বীরপুরের অপ্রস্তুত সৈন্যরা পরাজিত হল। বন্দী হল সেনাপতি আর অনেক সৈন্য। নজর বন্দী হলেন বীরপুরের রাজাও। কৌশলে বীরপুর দখল করে সমর নয়িকা মালতীলতা রাজাকে নিয়ে এলো মাধবীপুরে। তাকে বুঝিয়ে দিল বুদ্ধির খেলায় তরুণী মাধবী কম যায় না। বয়সে তেমন না বাড়লেও বুদ্ধিতে সে অনেক বেড়েছে।

রাজা দেববাহু আর তাঁর সহচর মন্ত্রীপুত্র এবং কোটালপুত্রকে রাজপ্রাসাদে নারী বাহিনীর হেপাজতে রাখা হল। বীরপুরের রাজাকে সসম্মানে পুরুষ বাহিনীর অধিনে বিশ্রামাগারে রাখা হল। বন্দী হলেও রাজাকে রাজোচিত সম্মান দিতে জানে মাধবীপুর। এই সত্যটা সকলের জানা উচিত। মাধবীর সহচরী মালতীলতা মল্লপুরের বৃদ্ধ রাজা মল্লবাহুকে বানপ্রস্থ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল রাজসভায়। মহারাজ মল্লবাহুকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত রেখে বীরপুর ও মল্লপুরের বন্দীদের বিচার শুরু হল।

সভায় রাজ-সিংহাসনের পাশে আর একটি সুসজ্জিত সিংহাসন। সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তিনি এলেই সভার কাজ শুরু হবে। বন্দীরা স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বিচারে তাদের দীপান্তর, কারাবাস এমনকি প্রাণদণ্ডও হতে পারে। বহু প্রতিক্ষার পর রাণীর প্রধানা সহচরী তথা সমর নায়িকা মালতীদেবীর আগমন বার্তা ঘোষণা করা হল। রাজসভা হাজার ঝাড় বাতিতে সুসজ্জিত। তার ভিতর দিয়ে ঝলমলে পোশাক পরা মালতী সভায় পদার্পণ করল। বন্দিরা রাণীর জয় গান গাইল। গাইল সেনাপতি ও সমর নায়িকা মালত্লিতার প্রশস্তি। সভার কাজ শুরু হল। অথচ মাধবী এল না।

মালতি রাজ-সিংহাসনের পাশে রাখা অপর আসনটিতে বসে মল্লপুরের রাজাকে সম্বোধন করে বলল--মহারাজ, আজ মাধবীপুরের রাণী মাধবীলতা আপনাকে এই সভার প্রধান বিচারক হিসাবে সম্মানিত করেছেন। আপনার সম্মুখে উপস্থিত আপনার পুত্র তথা মল্লপুরের যুবরাজ দেববাহু এবং বীরপুরের রাজা বীরবাহু। দু'জনেই আমাদের বন্দী। আজ তাঁদের বিচার হবে। বিচারের ভার আপনার উপর অর্পণ করে রাণী নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আপনি বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনার অভিজ্ঞতা ও সুবিচারের প্রশংসা দেশ বিদেশে প্রচারিত। আপনি যে রায় দেবেন রাণী মাধবী তা বিনা দ্বিধায় অনুমোদন করবেন।

বৃদ্ধ মহারাজ মল্লবাহু মালতীকে উদ্দেশ্য করে বললেন -- ভদ্রে, তোমাদের রাণী মাধবী আসন গ্রহণ না করলে সভার কার্য শুরু হবে কি করে? তাছাড়া এই বন্দীদের অপরাধই বা কি? তা কে পেশ করবে?

সেনা-নায়িকা মালতী বলল -- মহারাজ, আমাদের রাণী অন্তঃপুরে বীনা বাদনে রত আছেন। তাঁর উপস্থিতি যাতে বিচারকে প্রভাবিত না করতে পারে সেই জন্য তিনি বিচার কার্য সমাপন হবার পর সভায় এসে তা অনুমোদন করতে চান। মহারাজ, রাণীর অনুপস্থিতিতে আমি তাঁর সখি, সহচরী ও সমর-নায়িকা মালতীলতা, সভায় অভিযোগ

পেশ করব। কারণ ক্ষমতার উচ্চ আসন থেকে যদি কোনো অভিযোগ আসে তবে তা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যায়। সঠিক বিচার হয় না। সুতরাং রাণী মাধবীলতার কোন অভিযোগ নেই। আমি অভিযোগ দায়ের করব। আমি ফরিয়াদী।

মল্লবাহু বললেন—তা হলে অভিযোগ পেশ কর।

— মহারাজ, বিচার করুন। মল্লপুরের যুবরাজ দেববাহুর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, আজ থেকে সাত বছর আগে বিদেশ ভ্রমণ কালে এই যুবক এক ত্রয়োদশী দরিদ্র বালিকার পাণি গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে অসহায়া বালিকাকে এক গহন অরণ্যের ভিতর ত্যাগ করে চলে যান। যাওয়ার সময় বালিকার অঞ্চলে মাত্র এক কড়া কড়ি বেঁধে রেখে যান। এই নিষ্ঠুর কর্মের শাস্তি আপনি বিধান করুন।

অভিযোগ শোনার সাথে সাথে দেববাহু চমকে ওঠে। আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মালতীর উদ্দেশ্যে বলল — মাননীয়া, তোমার অভিযোগ আমি স্বীকার করছি। সেই বালিকা অতি স্পষ্ট ভাষী এবং দুর্বিনীতা ছিল। তার ঐ স্পষ্ট ভাষিতা এবং রূপমাধুরী আমার হৃদয় জয় করেছিল ঠিকই, কিন্তু আমার অহংকার আমাকে প্রতিহিংস্র করে তোলে। তাই আমি তাকে বিবাহ করেও অরণ্য মধ্যে ত্যাগ করে এসেছি। সে আমাকে এক কড়া কড়ির দেমাক দেখিয়ে ছিল, তাই এক কড়া কড়ি যে কত তুচ্ছ তা বোঝাবার জন্য তার আঁচলে এক কড়া কড়ি বেঁধে রেখে এসেছিলাম।

দেববাহু এক দণ্ড স্থির থেকে আবার বলতে লাগল — তাকে আমি অন্যায় ভাবে ত্যাগ করে এসেছি। কিন্তু তাকে ত্যাগ করে আসার পর বুঝতে পারি সে আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে রয়েছে। তাই অন্তরে সারাক্ষণ দগ্ধ হচ্ছি। আমি তার অন্বেষণে অরণ্য মধ্যে গোপনে চর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ সেই হতভাগিনীর সন্ধান দিতে পারেনি। শল্যপুরে সংবাদ নিয়েছি। কিন্তু সে তার মায়ের কাছেও ফিরে যায় নি। তাই আমি স্থির করেছি, তাকে না পেলে জীবনে আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করব না। এই সভা আমার প্রতি যে দণ্ড ধার্য করবে আমি তাই অবনত মস্তকে মেনে নিতে বাধ্য থাকব। কেবল আমার আবেদন, যদি শেষ বারের মত সেই কন্যার সাক্ষাৎ পাই তাহলে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিই। তা না হলে আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাব না।

মহারাজ মল্লবাহু আপন পুত্রের নামে এমত অভিযোগ শুনে যৎপরনাস্তি অবাক হলেন। তিনি সবিশেষ বৃতান্ত জানতে চাইলেন। মন্ত্রিপুত্র ও কোটালপুত্র যারা দেববাহুর সহচর ছিল তারা পর্যায় ক্রমে সেই কাহিনীর আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল। এবং আশঙ্কা প্রকাশ করল যে হয়তো সেই কন্যা বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার দ্বারা নিহত হয়েছে অথবা সে কোথাও অতি কায়ক্লেশে জীবন যাপন করছে।

মহারাজ মল্লবাহু মলতীর কাছে জানতে চাইলেন সেই বালিকা আজও জীবিত আছে কিনা এবং থাকলে কি অবস্থায় কোথায় আছে । মালতী বলল — সে বৃতান্ত পরে হবে। আপনি আগে এর বিচার করুন।

এবার মল্লবাহু বীরপুরের রাজা বীরবাহুর অপরাধ জানতে চাইলে মালতী বলল -- মহারাজ, এই রাজা অত্যন্ত লোভি। তিনি অকারণে পর-রাজ্য গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন। অপ্রয়োজনে যুদ্ধ বাধালে মানুষের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত করা হয়, এবং নর হত্যায় প্ররোচিত করা ও নরহত্যা সংগঠিত করা হয়। সুতরাং আমাদের গুপ্ত চরের মাধ্যমে বীরপুর মল্লপুর আক্রমণ করবে জেনে, বীরপুরের সঙ্গে যোগ দিয়ে মল্লপুর আক্রমণে সহযোগিতা করি, যাতে মল্লপুরের যুবরাজ দেববাহুর তথা নিরপরাধ প্রজা এবং তাদের নারী ও সম্পদের কোন ক্ষতি না হয়, অবশেষে আমরা আমাদের রাণীর আদেশে বীরপুর আক্রমণ করে রাজাকে বন্দী করেছি। আপনি এর বিচার করুন।

রাজা মল্লবাহু উপস্থিত সমস্ত সভাসদকে সম্বোধন করে বললেন -- মানুষ চির দিনই হিংস্র স্বভাবের হয়। তারা ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে নর হত্যা করে। খেলাচ্ছলে পশু বধ করে। মানুষকে পীড়ন করে । সেই সব অপরাধ প্রবণতা মানুষের সহজাত। মানুষের উচিত সেই সমস্ত অপরাধমুলক কাজ থেকে বিরত থাকা। অভিযুক্ত দু' জনেই নিরিহ মানুষের প্রতি তাদের অপরাধ করেছে। মানুষকে হত্যা ও ক্লেশ দিতে গিয়ে এরা মানবিকতাকে হত্যা করেছে। তাই আমি এদের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির ব্যবস্থা করব।

রাজা মল্লবাহু তাঁর বিচারের রায় দিলেন -- দেববাহু যে অপরাধ করেছে তা ক্রুর নৃশংস এবং অমানবিক। একটি কিশোরীকে লোভ দেখিয়ে তার মায়ের কোল থেকে কেড়ে এনে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়েছে। এবং এটা করেছে কেবল অহেতুক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। অথচ সেই বালিকা এদের কারো প্রতি কোনও অপরাধ করেনি, করেনি কোন ক্ষতিও। সততা ও ঔচিত্য বোধকে হত্যা করতে চেয়েছে এই যুবক। সুতরাং শুলে চাপিয়ে মৃত্যুই এর উপযুক্ত শাস্তি।

নিজের পুত্রের প্রতি এমত কঠোর এবং চরম শাস্তি বিধান করে রাজা নিজেই কাঁদতে লাগলেন। সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। চারি দিকে নীরবতা বিরাজ করছে। কিছুটা সময় এভাবে কেটে গেলে মালতী বলল -- সাধু! সাধু! সাধু! সভায় সাধু সাধু রব উঠল। বীরপুরের রাজা বীরবাহু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভাবলেন - নিজের ছেলের প্রতি যিনি মৃত্যু দণ্ড বিধান দিতে পারেন শত্রুর প্রতি তিনি কতনা নিষ্ঠুর হবেন।

মহারাজ মল্লবাহু আত্ম সম্বরণ করে বললেন--বীরপুরের রাজা বীরবাহু পরাজিত। পরাজিত বন্দীকে হত্যা করা নীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু দেববাহু পরাজিত হলেও তার অপরাধ যুদ্ধের কারণে নয়। সুতরাং রাজা বীরবাহুকে আমি মৃত্যু দণ্ড না দিয়ে নির্বাসন দণ্ড দিলাম। রাণী মাধবীর অনুমোদন-ক্রমে উভয় দণ্ড কার্যকর হবে। অতঃপর বীরপুর এবং মল্লপুর উভয় রাজ্য রাণী মাধবীর অধীন হবে। রাণী মাধবীকে আমি মহারাণী বলে অভিহিত করলাম। সভায় আবার সাধু সাধু রব উঠল।

এমন সময় ঘোষক ঘোষণা করল যে, রাণী মাধবী সভায় পদার্পণ করছেন। চারি দিক থেকে সৈনিকেরা প্রহরীরা এবং সভাসদেরা মহারাণী মাধবীলতার জয় ধ্বনি দিতে লাগল।

মহারাণী মাধবী সিংহাসনে আরোহণ করে সভাসদদের বসার অনুমতি দিলেন। উজির মহারাণীকে বিচার সভার সিদ্ধান্ত পাঠ করে শোনালেন। মহারাণী মাধবী মল্লবাহুর বিচারের তারিফ করে তাঁর বিচারকে অনুমোদন করলেন।

মহারাণী মাধবী এবার আদেশ দিলেন বাহিরে অপেক্ষমান বৃদ্ধাকে রাজ সভায় আনতে। মালতী স্বয়ং বৃদ্ধাকে রাজ সভায় এনে বলল -- এই মহিলার কন্যাকে রাজপুত্র দেববাহু বিবাহ করেছিলেন। আপনারা সেই কন্যার বিবরণ জানতে চাইছিলেন, এখন এঁর মুখ থেকে আপনারা সেই বিবরণ শুনুন।

কোন প্রকার ভনিতা ছাড়াই মাধবীর মা বললেন -- আমার কন্যা জীবিত আছে এবং সে আমার নিকটেই আছে। তার জন্য আপনাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। কিন্তু আমার জামাতা আমার সন্তান তুল্য, সুতরাং আমি তার মৃত্যুদণ্ড রোধ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দয়া করে আপনারা তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।

মহারাণী মাধবী বললো -- বন্দী, তোমার শাশুড়ি তোমার প্রাণ ভিক্ষা চান তোমার অভিমত?

দেববাহু মনে মনে ভাবল যদি তার মাধবী বেঁচে থাকে তবে হয়তো এই রাজ প্রাসাদে কোথাও আছে। একবার অবশ্যি মনে হয়েছিল, হয়তো এই রাণী মাধবীই তার সেই মাধবী। আবার পরক্ষণে মনে হয়েছে তা কি করে হয় অনাথিনী সহায় সম্বলহীনা বালিকা রাজ বাড়িতে পরিচারিকা হতে পারে। খুব বেশি হলে রাণীর সহচরী হলেও হতে পারে, তা বলে রাণী। কিন্তু মুখের গড়ন, গলার স্বর সবই যেন তেমনটি। খালি কথার আদব কায়দা বদলেছে। বদল হয়েছে চেহারায়। তবু কেন যেন মনে হতে লাগল এই মাধবী হয়তো বা সেই মাধবী হবে।

দেববাহু বলল -- মহারাণী, প্রাণে বাঁচতে আমি চাই না। আমি ঘোর অন্যায় করেছি। তাই এই অবস্থায় আমি মরতেও চাই না। আমাকে কেবল একবার মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হোক, যাতে আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি। তার ক্ষমা না পেলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

--বেশ, তাই হবে তোমার মৃত্যু দণ্ড কার্যকর হবার আগে তুমি তোমার মাধবীর দর্শন পাবে তবে তার ক্ষমা পাবে কিনা তা নিতান্তই তার উপর নির্ভর করছে। ক্ষমা করা না করা তার ব্যাক্তিগত ব্যাপার, সে বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ চলে না। আর বীরপুরের রাজা বীরবাহু, আপনি আপনার শাস্তির কথা শুনেছেন। এবং আমি তা অনুমোদনও করেছি। কিন্তু অমি পূর্বে আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। সুতরাং বন্ধু হিসাবে আমি অনুরোধ করব মাননীয় বিচারক মল্লপুর রাজ মল্লবাহু যেন আপনার নির্বাসন দণ্ড রোধ করে আপনার রাজ্য বীরপুর আপনাকে ফেরৎ দেন, কিন্তু আপনার রাজ্য আমার অধীন থাকবে। আপনি হবেন করদ রাজা।

রাজা মল্লবাহু বললেন -- "মহারাণী মহানুভব, তাঁর ইচ্ছাই অনুমোদিত হল"। সভায় আবার সাধুবাদ উঠল।

মল্লবাহু আবার বললেন -- রাজা বীরবাহু, আপনি যথা সময় সসম্মানে আপনার রাজ্যে ফিরে যেতে পারবেন। আপনি মুক্ত।

মাধবী বলল--বন্দী দেববাহু, আমি তোমাকে তোমার শাশুড়ির হাতে তুলে দিলাম। তিনি যা বলবেন তোমাকে সেই ভাবে চলতে হবে। তুমি এখন মুক্ত তবে তোমার রাজ্য

আমার অধিকৃত, সুতরাং তুমি আর রাজা নও। তাই তুমি তোমার রাজ্যে ফিরতে পারবে না। তোমাকে মাধবী পুরেই থাকতে হবে।

বৃদ্ধা জননী দেববাহুর হাত ধরে রাণীর কাছে নিয়ে এলেন। কাণ্ড দেখে সভায় সকলে এ ওরদিকে তাকাতে লাগলেন। কাছে গিয়ে বৃদ্ধা বললেন -- এই মাধবী আমার কন্যা। একেই তুমি বিবাহ করেছিলে। আমি সেদিন তোমাকে বলেছিলাম 'রাজায় দরিদ্রে কখনো সম্পর্ক হয় না'। দেখলে তো সে সম্পর্ক স্থায়িত্ব পেল না। আজ আমার মেয়ে তোমার যোগ্য পাত্রী। তাই তুমি একে গ্রহণ কর।

দেববাহু নীরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল। আনন্দে আবেগে তার মুখ দিয়ে কোন কথা যোগাল না।

তারপর সভাসদ এবং দুই মহারাজাকে সম্বোধন করে মাধবীর মা বললেন--আপনারা আমার কন্যা জামাতাকে অশীর্বাদ করুন। এই আনন্দের দিনে মল্লপুর রাজ্য আমি আমার জামাইকে উপহার দিলাম। আমার মেয়ের দুই সহচরী মালতীলতা ও মালবীকাকে মন্ত্রিপুত্র এবং কোটালপুত্রের সাথে বিবাহ দিতে চাই। সুতরাং উপস্থিত সকলে উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রাজ্য ত্যাগ করবেন না। এটা আমার অনুরোধ।

মাধবী আর দেববাহু দুই রাজাকে প্রণাম করল। নহবৎ বেজে উঠল। সকলে আনন্দে হর্ষ ধ্বনি করতে লাগল। সখিরা পরিচারিকারা সকলে ফুলের পাপড়ি ছড়াতে লাগল। ছিটানো হল আতর, সুগন্ধি চন্দন।

সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল। সখি সহচরী পরিবৃতা মাধবীলতা আর দেববাহু অন্তঃপুরে চলল। মালবিকা আর মালতীলতা দেববাহুর দুটো হাত ধরে পরিহাস করে বলল --

এক কড়ায় তরি   এক কড়ায় মরি
এক কড়ায় রাজধানী গড়ি।

কি সখা, এবার বিশ্বাস হলতো? এক কড়া কড়ি দিয়ে রাজধানী গড়া যায়?

দেববাহু বলল -- যায়, তবে তোমাদের সখির মত একজন বুদ্ধিমতি নারী আর তোমাদের দু'জনের মতো সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতি সখি থাকলে, তবে।

রাজ্যে উৎসবের বন্যা বয়ে গেল। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল। আলো জ্বলল। আতস বাজি আর ফানুসের রোসনাইতে যত সব জয়-পরাজয়ের গ্লানি কোথায় ভেসে গেল। তিন রাজ্যের লোক জন খাওয়া দাওয়া, মজা ফূর্তি করল। তিন রাজ্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। মাধবীর বুদ্ধি, দেববাহুর বাহুবল আর দুই বৃদ্ধ রাজা মল্লবাহু আর বীরবাহুর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিন রাজ্যের মানুষ খুব সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

আমার গল্প শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মাধবীলতার কাছে দেববাহু ক্ষমা চাইল কিনা সেটা আর জানা হল না।

মাটির ময়ূর

এক দিন এমন ছিল যখন যাতায়াত ব্যবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। তোমরা জান, আগেকার দিনে বানিজ্য ছিল সাধারণতঃ জলপথ ভিত্তিক। কারণ তখন স্থল পথে তেমন রাস্তাঘাট বা যানবাহন ছিল না। বড় বড় ব্যবসায়ীরা দেশের ভিতর থেকে নানা প্রকার পণ্যসামগ্রী নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বিদেশের দিকে, অথবা দেশেরই এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে। আবার বেশ কিছুদিন সেই সব নগর বন্দরে কাটিয়ে সে দেশের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে নিজের দেশে ফিরে আসতেন। দেশের অভ্যন্তরে সেই সব জিনিস বিক্রি করে নিজের বাড়িতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আবার বিদেশে পাড়ি জমাতেন। এভাবে বণিক বা সওদাগর সমাজ তাদের কাজ করতেন।

বিশ্ব বিখ্যাত ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ শ্রীলঙ্কা, যার আগে নাম ছিল সিংহল, ভারতীয় বণিকদের তীর্থক্ষেত্র ছিল। এমন কথা শোনা যায় যে, বঙ্গ দেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে জাহাজে সাত শত অনুচর সমেত তমলুক হয়ে লঙ্কা যাত্রা করেন, সেখানে যুদ্ধে অনার্যদের হারান, সিংহবাহুর নামেই 'সিংহল' নাম করণ হয়। চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগরের গল্প তোমরা সকলে পড়েছ। তাঁরা গিয়েছিলেন সিংহল সফরে। এছাড়া জাভা সুমাত্রা বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্য করতে যেতেন।

বাংলার বরমাল্য সেনের সঙ্গে আসামের বিহিত বর্মার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে এক সঙ্গে বহু দিন বহু দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। দু'জনে এক সঙ্গে অনেক দিন কাটাতেন কিন্তু একবার ছাড়া ছাড়ি হলে খুব শিঘ্র আর সাক্ষাৎ হত না। কারণ তখনকার দিনে যোগাযোগ ব্যবস্থাতো আর এখনকার মত ভাল ছিলা না। তাই সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ তেমন ঘনঘন হত না। সংবাদ নিতে হত লোক মারফৎ কিংবা ডাক যোগে। ডাক ব্যবস্থাও তেমন ভাল ছিল না। আর আজকের মতো টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার কথাতো ভাবাই যায় না। স্থল পথে একমাত্র দ্রুতগামী বাহন বলতে ঘোড়া কিংবা হাতি।

বিহিত বর্মা আর বরমাল্য সেন, কার সম্পদ বেশি তা নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে জোর বিতর্ক চলত। সোনা দানা লোক লস্কর হাতি ঘোড়ায় কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। লোকে ধনবান ব্যাক্তির উদাহরণ দিতে গেলে কখনো বিহিত বর্মা কখনো বরমাল্য সেনের নাম করত। ভাগ্য কখনো কারো সমান গতিতে চলে না। কালের গতি কুটিল। বিহিত বর্মার বিধি বাম হল। পর পর তার ব্যবসায় লোকসান হতে লাগল। দেনাদারের চেয়ে পাওনাদার বাড়তে লাগল। কিন্তু ভাগ্যের কাছে হেরে যাবার মানসিকতা বিহিত বর্মার কোন দিন ছিলনা। কথাটা কাউকে জানতে না দিয়ে নূতন উদ্যম নিয়ে তিনি বাণিজ্যে মন দিলেন। আরো ভাল ভাল দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে তিনি জাহাজ ভর্তি করে বিদেশে চললেন। সিংহলে গিয়ে তিনি ভাল লাভ করেলেন। মনে মনে ভাবলেন কে

বলে ভাগ্য মানুষের হাতের বাইরে। এবার দেশে ফিরে এলে সব পাওনাদারের দায় তো মিটবেই। অনেক সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে। এই জাহাজ ভর্তি দ্রব্য সামগ্রীর সবটাই লাভের। তাই ফেরার সময় তাঁর স্ত্রীর জন্য হীরে বসানো সোনার হার নিলেন। মুক্তোর কদর আছে, তাই সাত ছড়া মটর মালা আনলেন। এবার বাড়ির দাসীদের একটা করে সোনার হার উপহার দেবেন। কথায় আছে -

দাসীর হাতে সোনা গো।
সম্পদ যায়না গোনা গো।।

হল না, শেষ রক্ষা হল না। শীতের সমুদ্র সাধারণতঃ শান্ত থাকে। কিন্তু ঘন কুয়াশার মধ্যে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। চার দিক থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাতাস বইতে থাকল। ঘূর্ণাবর্তে জাহাজ লাটিমের মত ঘুরতে লাগল। দক্ষ মাঝি মল্লারা প্রাণ পনে জাহাজ সামলাতে চেষ্টা করল। পিপে ভর্তি তেল সাগরে ঢেলে দেওয়া হল। যাতে ঢেউ কম ওঠে। কিছুতে কিছু হল না। অবশেষে দুটো জাহাজই অতলে তলিয়ে গেল। বিহিত বর্মা সেই জাহাজে ছিলেন না। তিনি মাঝি মল্লাদের অনুরোধে আগে ভাগে একটা ছোট ডিঙ্গাতে চলে যান। যাবার সময় এক কানা কড়িও তিনি সাথে করে নিয়ে যেতে পারেন নি। দূর থেকে নিজের সর্বনাশ নিজের চোখে দেখলেন। কিন্তু করার কিছুই ছিল না।

মাঝি মল্লাদের দু'এক জন ছাড়া সকলেই প্রাণ হারাল। বিহিত বর্মা দেশে ফিরে এলেন। কিন্তু জাহাজ ডুবির খবর পেয়ে পাওনাদারেরা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য উঠেপড়ে লাগলো। যার যা পাওনা ছিল তাদের মধ্যে কিছু অসৎ ব্যক্তি বাড়িয়ে বলতে লাগল। অপর দিকে যারা দেনাদার ছিল তারা সুযোগ বুঝে গা ঢাকা দিল। কিন্তু বিহিত বর্মা তাঁর যা গচ্ছিত ধন সম্পত্তি ছিল তা দিয়ে প্রথমে যে সব মাঝি মল্লা মারা গিয়েছে তাদের পরিবার বর্গের ভরণপোষনের জন্য কিছু কিছু অর্থ দিলেন, যাতে তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার অনাথ না হয়ে যায়। তারপর অবশিষ্ট গচ্ছিত অর্থ সোনাদানা প্রাসাদ বাগান জমি বাড়ি সব বিক্রি করে দেনা মেটানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত হাতযোড় করে সকলের কাছ থেকে ঋণ মকুব চাইলেন। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা তাদের দাবী বাড়িয়ে বলেছিল তারা দরবারে নালিশ করল, আবার যারা সৎ তারা তাদের পাওনা বাড়িয়ে তো বলল না উল্টে তাদের পাওনা তারা ছেড়ে দিল।

বিহিত বর্মা এভাবে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালেন। পথের ধারে কুটির নির্মাণ করলেন। সেখানে স্ত্রী রুক্মিণী দেবী ও পুত্র দেবতনুকে রেখে তিনি ভাগ্য অন্বেষণে আবার বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে মনে হল বরমাল্য সেনের কথা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে অবসন্নদেহে ক্লান্ত মনে তিনি বরমাল্য সেনের প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, বরমাল্য সেন বাড়িতেই আছেন। একজন পরিচারক বিহিত বর্মাকে বরমাল্য সেনের কাছে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। বিহিত বর্মাকে দেখে বরমাল্য সেন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তখন একটি চৌকিতে বসে দ্বিপ্রাহরিক স্নানের জন্য শরীরে তৈল মর্দন করছিলেন। বিহিত বর্মাকে সাদর সম্ভাসন করে বসতে বলে উল্লসিত হয়ে গৃহিনীকে সংবাদ দেওয়ার জন্য তিনি ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।

বরমাল্য তেল মাখার সময় তাঁর পাথর খচিত মূল্যবান সোনার হার চৌকির উপর রেখেছিলেন। বিহিত বর্মা আসন গ্রহণ করবেন এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বিহিত বর্মা দেখলেন দেওয়ালে আঁকা মাটির ময়ূরটা সহসা পাখা ঝাপটাতে আরম্ভ করল। গলা বাড়িয়ে একবার বিহিত বর্মার দিকে তাকাল। যেন তাঁর ভাগ্যকে পরিহাস করল। তারপর যেমন করে ময়ূর সাপ গেলে তেমন করে সোনার হারটাকে টপকরে গিলে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে আবার মাটির ময়ূর দেওয়ালের চিত্র হয়ে গেল। হতচকিত বিহিত বর্মা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ভাগ্য যার প্রতি বিরূপ তার অবস্থা এরকমই হয়। সুতরাং হার চুরির দায়ে তাঁকে রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে। কারণ এই রকম অদ্ভুত কথা কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। ভালো করে ভাববার অবকাশ তিনি আর পেলেন না। বন্ধু ফিরে আসার আগে তিনি দ্রুত পদে পলায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেলেন। ঊর্দ্ধ শ্বাসে প্রাসাদ ত্যাগ করে রাজপথ ধরে নগর পরিত্যাগ করলেন। আর যাবার সময় বার বার পিছন ফিরে দেখতে লাগলেন বরমাল্য সেনের কোন অনুচর তাঁকে অনুসরণ করছে কি না।

এদিকে বরমাল্য ও তাঁর পত্নি কথা বলতে বলতে এগিয়ে এলেন -- অনেক দিন পরে এলে বন্ধু, কিছুদিন এখানে থেকে যেতে হবে কিন্তু।

কাকে বলছেন, কেউতো নেই। যাঃ বাবা, জল জ্যান্ত লোকটা গেল কোথায়, এই মাত্র তাকে দেখে গেলেন অথচ লোকটা উধাও হয়ে গেল। গৃহিনী বললেন, তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। বহু দিন দেখনি তাই তোমার মনে হয়েছে তিনি এসেছেন, আসলে তোমার মনের ভ্রম, কেউ আসেনি।

বরমাল্য পরিচারকদের ডাকতে লাগলেন। তারা এসে জানাল বিহিতবর্মা এসেছেন, মনিবের খোঁজ করেছেন। সদর ঘরে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু তাঁকে কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। সবাই এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি সুরু করল কিন্তু কেউ কোথাও বিহিত বর্মার টিকিটি খুঁজে পেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ফটকের কাছে পড়ে থাকা বিহিত বর্মার লাঠি গাছাটা পাওয়া গেল। দিন দুপুরে এমন কাণ্ড দেখে বরমাল্য খুব অবাক হলেন। তিনি ঠিক করলেন, বিহিত বর্মার বাড়ি গিয়ে তাঁর খোঁজ খবর নেবেন। আর এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোনার হারের কথাটা তিনি বেমালুম ভুলেই গেলেন। এমনি হারতো একটা আধটা নয়, অনেক আছে। সুতরাং সেকথা আর কোনো দিন তাঁর মনে পড়ে নি।

□ □

দিন যেতে লাগল। বরমাল্য নানান কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য বিহিত বর্মার খোঁজ নেওয়ার সময় করে উঠতে পারলেন না। এদিকে বনের পথ ধরে এগুতে গিয়ে এক দল কাঠুরের সাথে দেখা হল বিহিত বর্মার। তাদের কাছে নিজেকে এক সাধারণ মানুষ হিসাবে পরিচয় দিয়ে তাদের কাজে যোগ দিতে চাইলেন বিহিত বর্মা। ভাবলেন প্রাণে বাঁচতে গেলেতো কোনো না কোনো কাজ চাই, সুতরাং কাঠ কেটে যদি কোন উপার্জন হয়। কিন্তু সেখানেও কোন সুবিধা হল না। ধনী সওদাগর, কাঠ কাটার কাজ পারবেন

কেন? তাই কোনো এক অপরিচিত বন্দরে গিয়ে হাজির হলেন তিনি। ভাবলেন বন্দরে মাল বাহকের কাজ করবেন। স্ত্রী পুত্রের কথা ভেবে তাঁর কষ্ট হয়। পরিচিত বন্ধুর কাছে যেতে সাহস হয় না। বরমাল্যের বাড়িতে যা ঘটল তা এক মাত্র দুর্ভাগ্য ছাড়া আর অন্য কোন কারণে ঘটতে পারে না।

বেশ কিছু দিন পর বরমাল্য সেন বিহিত বর্মার দুর্ভাগ্যের কথা লোক মারফত জানতে পারলেন। শোনা মাত্র সব কাজ ফেলে ছুটলেন বিহিত বর্মার বাড়িতে। কোথায় বাড়ি, কোথায় প্রাসাদ, সেখানে এখন অন্য লোক বসবাস করছে। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন, বিহিত বর্মার স্ত্রী অন্য গ্রামে কোন এক গৃহস্থ বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। সেখানে বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘরদোর পরিস্কার করে, তার পর দিনের শেষে এক থালা শাকান্ন যা পায় তা দিয়ে মায়ে পোয়ে আধ পেটা খায়, খায় আর কাঁদে।

কাঁদে ছেলের জন্য, কাঁদে স্বামীর জন্য, কোথায় গেল মানুষটা। রুক্মিণী দেবীরতো কোন দিন কোন কাজ করার অভ্যাস নেই, তাই ভাল করে কাজ করতে পারেন না। এত দিন দাস-দাসীদের হুকুম ফরমাস করে এসেছেন, আজ মনিবের বাড়িতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। তবু তিনি ভেঙে পড়েননি, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ভাগ্য কারো চির দিন খারাপ থাকে না। তাই একদিন না একদিন বিহিত বর্মা ফিরে আসবেন আর সেদিন সমস্ত দুঃখ তাঁর ঘুচে যাবে।

বরমাল্য সেন বহু খোঁজা খুঁজি করে বার করলেন বিহিত বর্মার স্ত্রী রুক্মিণী দেবীকে। কুটীরের দুরবস্থার মধ্যে বন্ধুপত্নিকে দেখে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি সাথে সাথে মূল্যবান বেশ ভূষার ব্যবস্থা করলেন। শিবিকা বাহকদের দিয়ে রুক্মিণী দেবী ও দেবতনুকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। তারপর শুরু করলেন বিহিত বর্মার অনুসন্ধান।

রুক্মিণী দেবী বরমাল্য সেনের বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পেলেন বটে, কিন্তু স্বামীর জন্য তাঁর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। প্রায় দিন পূজা অর্চণা আর স্বামীর মঙ্গল কামনায় উপবাস করে দিন কাটাতে লাগলেন। এদিকে বিহিত বর্মা কাঠুরেদের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এসেছেন বন্দরে। অপরিচিত মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন। বন্দরে কাজ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভারি কাজ তাঁর জন্য নয়। তিনি সে কাজ পারেনও না। বড় মুস্কিলে পড়লেন। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটতে লাগল। খোলা আকাশের নীচে পথের ধারে পড়ে রাত কাটাতে হয়। শরীর ভেঙে গেল।

তিনি হাল্কা কাজ খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় জানতে পারলেন, এক তরুণ ব্যবসায়ী সিংহলে বাণিজ্য করতে যেতে চায়, আর সঙ্গে নিতে চায় কোন অভিজ্ঞ সহকারী। বিহিত

বর্মা গেলেন তার কাছে। নিজেকে বিহিত বর্মার অনুচর হিসাবে পরিচয় দিয়ে সিংহল যাত্রা ও বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। অনেক অনুরোধ আর আশ্বাসের পর তরুণ সওদাগর অরূপ কুমার তাঁকে সঙ্গে নিতে রাজি হলেন।

অরূপ কুমারের সঙ্গে বিহিত বর্মা উপস্থিত হলেন সিংহল বন্দরে। কিন্তু ইতিমধ্যে সিংহলের রাজা নিয়ম করেছেন, নূতন কোনও সওদাগরকে আর এদেশে বাণিজ্য করতে দেওয়া হবে না। এমনকি বন্দরে জাহাজ রাখতেও পারবে না। কারণ অতিরিক্ত বনিকের চাপে সে দেশের বণিজ্য মার খাচ্ছে। সুতরাং আর নূতন বণিকরা প্রবেশ করার অনুমতি পাবে না। বিপদে পড়লেন অরূপ কুমার। বিহিত বর্মাকে তিনি বললেন—আপনি এর কোন প্রতিকার করতে পারবেন? বাণিজ্য তরি নিয়ে ফিরে গেলেতো আমার সমূহ ক্ষতি। আপনি যদি এই বিপদ থেকে আমাকে বাঁচাতে পারেন তাহলে বাণিজ্যে লাভের অর্ধেক অংশ আমি আপনাকে দেব। নতুবা সমুদ্রের জলে আমাকে আত্মবিসর্জন দিতে হবে। কেননা ফিরে যাবার মত রসদ আমার নেই। পণ্য বিক্রি করতে না পারলে মাঝি মল্লাদের খরচ এবং বেতন যোগানোর সামর্থ্য পর্যন্ত আমার নেই। এ যাত্রা আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।

বিহিত বর্মা আশ্বাস দিয়ে বললেন—আপনার কোন চিন্তার কারণ নেই। এদেশে আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে। স্বয়ং রাজাই আমার অতি পরিচিত। আমি বহু শুল্ক দিয়ে, নানা উপঢৌকন দিয়ে এদেশে ব্যবসা করেছি। আমার নামেই আপনি অনুমতি পেয়ে যাবেন।

অরূপ কুমার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন—আপনি আসলে কে ?

বিহিত বর্মা বললেন — আমি 'বিহিত বর্মা'। সিংহল, মালয়, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে আমার বিশেষ পরিচিতি আছে। কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে আজ আমি হৃতসর্বস্ব। আমি কালই রাজ দর্শন করে আমার নামে বাণিজ্যের অনুমতি চাইব এবং আমার সহযোগী হিসাবে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, যাতে ভবিষ্যতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়।

পরদিন অরূপ কুমারকে নিয়ে বিহিত বর্মা রাজদর্শনে গেলেন। রাজদরবারে নানা উপঢৌকন দিলেন। রাজা সাদর অভ্যর্থনা করে কুশল বিনিময় করলেন। বিহিত বর্মা তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা গোপন রাখলেন। অরূপ কুমারকে নিজেরে সহযোগী হিসাবে পরিচয় করে দিলেন।

স্বল্প দিনের মধ্যে বাণিজ্য শেষ করে প্রভুত অর্থ লাভ করলেন। বিহিত বর্মা লভ্যাংশের অর্ধেক ভাগ নিয়ে নিজের সুনামের জোরে একটা বাণিজ্য তরি ভাড়া করে বিভিন্ন দ্বীপে বানিজ্য করতে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে গেলেন অরূপ কুমার তাঁর জাহাজ নিয়ে। বাণিজ্যে প্রচুর সফলতা অর্জন করে অনেক ধন সম্পদের মালিক হয়ে ঘরে ফিরতে প্রায় দু বছর সময় লাগল। বিহিত বর্মা আর অরূপ কুমার দু'জনে এক সঙ্গে দেশে ফিরে যে যার বাড়ি চলে গেলেন। কিন্তু বিহিত বর্মার বাড়ি ঘর কোথায়?

□ □ □

দেশে ফিরে বিহিত বর্মা প্রথমে স্ত্রী পুত্রের খোঁজ করতে শুরু করলেন। বিপদের দিনে স্ত্রী রুক্মিণী আর পুত্র দেবতনুকে যে কুটিরে রেখে গিয়ে ছিলেন ফিরে এসে আর সেই কুটীর দেখতে পেলেন না। গ্রামে গ্রামে ঘুরে পরিচিত অপরিচিত সব মানুষের কাছে তাদের সন্ধান জানতে চাইলেন। কিন্তু কেউই সঠিক কিছু বলতে পারল না। এভাবে তিনি পাগলের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধা রমণী জানালেন- -রুক্মিণী কোন এক সওদাগরের সঙ্গে চলে গিয়েছে।

বিহিত সেই সওদাগরের সম্বন্ধে জানতে চাইলে এতক্ষণ যে সব গ্রামের মানুষ কিছুই জানে না বলছিল তারাই সাত কাহন করে রুক্মিণীদেবীর নামে নিন্দা মন্দ করতে লাগল। বক্রোক্তি করে কেউ কেউ বলল—এমন সুন্দরী নারী কি স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? দাসী বৃত্তি করে পড়ে থাকবে কিসের আশায়? তুমিতো চলে গেলে, আর তোমার পাত্তাই নেই।

কিন্তু বিহিত বর্মা রুক্মিণীদেবী সম্পর্কে গ্রামের লোকের খারাপ কথা বিশ্বাস করলেন না। তাঁর রুক্মিণী কিছুতেই আবার বিবাহ করতে পারে না। আবার ভাবলেন হবেই বা। তাও ভালো অনাহারে মৃত্যুর চেয়ে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে পারে তাতে কোন অন্যায় নেই। তিনি ভাবলেন আর বাণিজ্যে যাবেন না। স্ত্রী পুত্র যদি নাই রইল তাহলে অর্থ উপার্জন করে কি লাভ? যা অর্থ তিনি ইতি মধ্যে উপার্জন করেছেন তা যথেষ্ট। তাই তিনি স্থির করলেন দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে রুক্মিণীর খোঁজ করবেন। যদি দেখা হয় তবে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। আর দেবতনুকে ভিক্ষা হিসেবে চেয়ে নেবেন।

যদিও পুত্রের উপর আজ আর তাঁর কোন অধিকার নেই। কারণ তিনি তাদের আহার বস্ত্র বাসস্থানের কোনও ব্যবস্থা করতে পরেন নি। তবু যদি পুত্রকে ফেরত পান অথবা স্ত্রী পুত্রকে একবার চোখের দেখা দেখতে পান, সেটাই হবে পরম সৌভাগ্য।

গ্রামের মানুষ উপদেশ দিল — দুঃখ করো না। পুণরায় দার পরিগ্রহ কর। সুখে সংসার কর, ব্যবসা বাণিজ্যে মন দাও। আর নিজের বাড়িটা ফিরিয়ে নাও। স্ত্রীর জন্য শোক করা কাপুরুষতা। বিহিত কোন উত্তর দিলেন না। কেবল দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে নিজের প্রাসাদোপম বাড়িটি ফিরিয়ে নিলেন। লোকে ভাবল বিহিত বুঝি আবার সংসারী হবে। তাই ঘটকের আনাগোনা শুরু হল। বিহিত বর্মা কিন্তু রুক্মিনী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত নির্জন কক্ষে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। কেবল মনে হতে লাগল এই বুঝি দেবতনু ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ছুট্রে আসছে। আর রুক্মিণীদেবী অভিমানে নানা অভিযোগ জানাচ্ছেন। না, আর নয়, আর ভাল লাগছে না। এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

বিহিত বর্মা ভাবলেন সবার আগে বরমাল্য সেনের বাড়ি যাবেন। অনেক দিন হল বন্ধুর খবর রাখা হয়নি। আর সেই সোনার হার যাকে মাটির ময়ূর খেয়ে নিয়েছিল, সেটাতো আর পাওয়া যাবে না। তাই সেরকম একটা গড়িয়ে নিয়ে তাঁকে ফেরৎ দিয়ে আসবেন। ময়ূরের হার খাওয়া কেউই বিশ্বাস করবে না। সেটা নিতান্তই তাঁর ভাগ্যের

পরিহাস। তাই সেকথা আর না তোলাই ভাল। কারণ এহেন অবান্তর কথা বললে লোকে তাঁকে আরো বেশি অবিশ্বাস করবে।

মিথ্যাবাদী ভেবে লোকের মুখে মুখে সেই কথা গল্প হয়ে ঘুরে বেড়াবে। তাই মুখ বুজে সেই দুর্ভাগ্যকে নীরবে মেনে নেওয়াটাই শ্রেয়। সত্য যদি বিশ্বাস যোগ্য না হয় তাহলে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। বিচক্ষন বিহিত বর্মা তা বিলক্ষণ বোঝেন। তাই প্রথমে তিনি শহরের সেরা স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে নিজের মনের মত একটি হার গড়ালেন। তার পর চললেন বরমাল্য সেনের বাড়ির দিকে।

এদিকে বরমাল্য বন্ধু বিহিত বর্মার খোঁজে দেশ বিদেশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরিচিত ব্যবসায়ীরা কেউই খোঁজ দিতে পারে নি। শেষে হতাশ হয়ে কয়েক দিন আগে বাড়ি ফিরেছেন। বন্ধুপত্নিকে তিনি কোন আশ্বাসের বাণী শোনাতে পারেন নি। শুধু বলছেন ভগবানের উপর ভরসা রাখ, বিহিত শিঘ্রই ফিরে আসবে। রুক্মিণী দেবী নিরাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। স্বামীর মঙ্গল কামনা করে মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেন। এক মাত্র সন্তানকে বুকে আঁকড়ে ধরে কেবল অশ্রু বিসর্জন করেন।

সেদিন দুপুর বেলা বরমাল্য সেন চৌকিতে বসে স্নানের আগে শরীরে তেল মালিশ করছেন। এমন সময় বিহিত বর্মা এসে হাজির হলেন, ঠিক যেমনটি অগের বার এসেছিলেন। বরমাল্য বন্ধুকে সম্বোধন করে হাত ধরে নিজের চৌকিতে বসালেন। বিহিত বর্মা ম্লান হেসে বন্ধুর কুশল জানতে চাইলেন, তারপর নিজের দুর্দশার কথা বলতে শুরু করলে বরমাল্য সেন বাধা দিয়ে বললেন -- এখন নয়, আগে স্নানাহার কর, তার পর তোমার সব কথা শুনব। আমারও অনেক কথা আছে, সব বলব।

দুই বন্ধু পুস্করিণীতে স্নান করতে গেলেন। বিহিত কেবলই রুক্মিণী আর দেবতনুর কথা তোলার চেষ্টা করেন। আর বরমাল্য বাধা দিয়ে বলেন -- দেশেতো সুন্দরী নারীর অভাব নেই, আমি তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করব।

মনে মনে হাসেন বরমাল্য। অপর দিকে স্বামীর ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে রুক্মিণীদেবী অধীর আগ্রহে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন। কিন্তু বরমাল্যের স্ত্রী তাকে বললেন -- না, এখন নয়। শুনেছি তিনি দ্বিতীয় পত্নি গ্রহণ করেছেন। তাই তোমার দেখা করা ঠিক হবে না।

রুক্মিণী দেবী বললেন -- তা হোক, আমি কেবল তাকে চোখের দেখা দেখব। তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করব। ব্যাস্।

-- তাতে যদি তিনি তোমায় অপমান করেন?

-- অপমান সে আমায় করতে পারবে না। এক দিনতো সে আমায় অনেক সম্মান দিয়েছে। অনেক ভালবেসেছে। আর আজ যদি সে আমাকে অপমান করে তা হলে শেষ বারের মত বিদায় নিয়ে চলে যাব। চলে যাব যেদিকে দু' চোখ যায়। তখন ভাবব, আমি সব হারিয়েও স্বামীর ভালবাসার জন্য বসে ছিলাম, এখন আমি আমার স্বামীর ভালবাসাও হারিয়েছি। কিন্তু আমি আগে থেকে সে সব কথা ভাবতে যাব কেন? তুমি আমাকে তার কছে যেতে দাও।

বরমাল্যের পত্নি বললেন — না। এখন কিছুতেই নয়। আগে খাওয়া দাওয়া শেষ হোক, তুমি সাজগোজ করে নাও। তার পর দেখা যাবে। এখন দেবতনুকে সরিয়ে রাখ। দেব যেন তাঁর সামনে না যায়। দেখাই যাক না, তিনি তোমাদের জন্য ব্যকুল কিনা?

আহার শেষ করে বিহিত আর বরমাল্য ফিরে এলেন সেই সদর ঘরটায়। একটি পালঙ্ক শয্যায় পাশাপাশি বসে দু'জনে গল্প করছেন। এমন সময় বরমাল্যের স্ত্রী দেবতনুকে এগিয়ে দিলেন বিহিতের দিকে। দেবতনু ছুটে এসে দাঁড়াল তাঁদের কাছে। বিহিত বর্মা নিজের ছেলেকে চিনতে একটু ইতস্তত করছেন। দীর্ঘ দিনের মধ্যে বাড়ন্ত শিশুর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া এখানে তিনি নিজের ছেলেকে হঠাৎই দেখতে পাবেন এমনটি ভাবতেও পারেন নি। এ দিকে বহুদিন পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত শিশুও তার পিতাকে সহজ সম্বোধন করতে পারছে না। লাজুক লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

হতবম্ব বিহিত বর্মা দেখলেন বরমাল্যের স্ত্রীর সঙ্গে রুক্মিণী দেবী এগিয়ে আসছেন তাঁর দিকে। বরমাল্যের স্ত্রী পরিহাস করে বললেন — দেখুন তো, আপনার বন্ধু একটি উপহার সংগ্রহ করে রেখেছেন। আপনার পছন্দ হয় কিনা? বলেই অট্টহাস্যে ঘর খানা যেন ভরিয়ে দিলেন। রুক্মিণী বিহিতকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন।

□ □ □ □

ততক্ষণে বিহিত বর্মা আনন্দে কেঁদে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি দেবতনুকে কোলে নিয়ে তার কপোল চুম্বন করলেন। তারপর বললেন — বন্ধু, তুমি আমার যে উপকার করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তোমায় আর ছোট করব না। তবে সেদিনের তোমার সেই সোনার হার আজ আমি তোমায় ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

বলেই পকেট থেকে সদ্য গড়ানো সোনার হারটি বার করে বরমাল্যের হাতে দিতে গেলেন। বরমাল্য সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বললেন - হার কিসের?

তোমার মনে নেই, যেদিন আমি সর্বস্ব হারিয়ে তোমার বাড়িতে এসেছিলাম, আর সেদিন তুমি ঠিক আজকের মত এই ঘরটাতে বসে তেল মাখছিলে। তোমার পাশে একটি সোনার হার রাখা ছিল। বিশ্বাস কর ....।

কথাটা শেষ হবার অবকাশ না দিয়ে সকলের চোখের বিশ্বাস কেড়ে নিয়ে সহসা জীবন্ত হয়ে উঠল দেওয়ালে আঁকা সেই মাটির ময়ূরটা। পাখা ঝাপটে গ্রীবা তুলে কর্কশ কেকা তুলে বরমাল্য ও বিহিতের পায়ের কাছে উগরে দিল সে দিনের গিলে ফেলা সেই হারটা। আজ বিস্ময় বিহ্বল পাঁচ জন দর্শক, আর সেদিন বিহিত বর্মা ছিলেন একা।

মাটির ময়ূর আবার দেওয়ালে চলে গেল ঠিক যেমনটি ছিল। সবাই অবাক, কেউ কোন কথা বলছে না। মুহূর্তে কি ঘটে গেল তারই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় সবাই বিমোহিত। বিহিত বর্মা ধীরে ধীরে দেবকে কোল থেকে মাটিতে নামিয়ে নীচু হয়ে হারটা তুলে নিলেন। তার পর নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন — বন্ধু সেদিন এই হারটা পাশে রেখে তুমি তেল মাখছিলে। মনে আছে?

বরমাল্য স্মৃতির অতল থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করলেন। তাই হবে, মাথা নেড়ে বললেন—হ্যাঁ তা হবে হয়তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো আমারই হার।

বিহিত বললেন—"সেদিন দেওয়ালের মাটির ময়ূর এই হারটা গিলে খেয়ে ছিল। যেমন করে কোন ছোট সাপকে গিলে খায়।" আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হল।

ক্ষণিক নীরবতার পর বিহিত তেমনি আবেগ জড়িত গলায় বললেন—এই বিচিত্র কাহিনী বললে সেদিন কেউই বিশ্বাস করতে পারতো না। তাই আমি হার চুরির অপবাদ মাথায় নিয়ে, তুমি ফিরে আসার আগে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছিলাম। সেদিন ভাগ্য দেবী অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। তাই সব অঘটনই ঘটনা। তবু ভাল আজ সেই সত্য উদ্ঘাটিত হল।

অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এবং কাহিনী শুনেতে শুনতে রুক্মিণী দেবী হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। অবাক বিস্ময়ে বরমাল্যের স্ত্রীর ঠোঁটের কোণের চঞ্চল হাসি কোথায় কখন যেন হারিয়ে গেছে। বরমাল্য বললেন—আজ যখন ভাগ্য লক্ষ্মী সদয় হয়েছেন তখন আর চিন্তা কেন? এর একটি হার তোমার পুত্রকে দাও, একটি দাও তোমার স্ত্রীকে।

বিহিত বর্মা বললেন—তা বেশ, তাই দেব। কিন্তু আমার পেটিকায় আরো মহা মূল্যবান রত্ন মালা রয়েছে। তার একটি তোমাকে এবং একটি তোমার স্ত্রীকে উপহার দিতে চাই। বন্ধু গ্রহণ কর।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে বরমাল্য বিহিতকে এবং বরমাল্যের স্ত্রী রুক্মিণীকে জড়িয়ে ধরলেন। আর দেব কিছুই বুঝতে না পেরে আনন্দে হাত তালি দিয়ে উঠল।
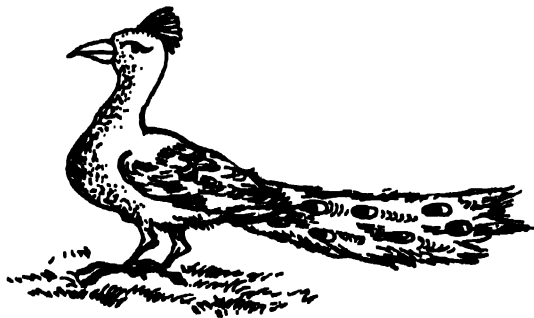
উৎকোচ কুমার

গল্পের আসরে জেঠুমণি। পড়ন্ত বেলায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসর বসে। নীলু, পলা, ভোলা, অতসী, মিতা আরো সবাই উপস্থিত। জেঠিমার বাদাম মুড়ির মিক্সচার হাজির। জেঠু চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন — দেখ, বিদ্যে আর বুদ্ধি দুটো এক সাথে থাকলে মানুষ অনেক বড় হতে পারে। এক জন হয়তো অনেক বিদ্যে অর্জন করেছে কিন্তু তার বুদ্ধি কম, তাই সে নিজের বিদ্যেকে ঠিক মত প্রয়োগ করতে পারে না। আবার কারো বিদ্যে সামান্যই অথচ প্রখর বুদ্ধি দিয়ে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে।

অতসী বলল--তা হতে পারে, তুমি একটা বুদ্ধিমানের গল্প বল।

জেঠু বললেন--আরে বুদ্ধিমান মানেই তো ধূর্ত হয়। আর ধূর্ত লোককে কেউ ভালোবাসে না।

ভোলা বলল--তা না বাসুক। তবুতো সে বুদ্ধিমান। তাইতো আমরা ধূর্ত শিয়ালের গল্প শুনি। তুমি বলতে আরম্ভ কর।

জেঠু মণি শুরু করলেন —

একটি ছেলে ছিল। তার নাম ছিল বিধু কুমার। বিধু মানে চাঁদ। আর চাদেঁর মত ফুট্‌ফুটে দেখতে বলে তার বাবা-মা নাম দিয়ে ছিলেন বিধু কুমার। ছোট বেলায় তার বাবা মারা গেলে মা অতি কষ্টে বিধুকে মানুষ করেন। সেকালে গুরু মশায়রা চতুষ্পাঠিতে পড়াতেন। আর ধনী জমিদার উচ্চ মধ্যবিত্তের বাড়ির ছেলে মেয়েরাই সেখানে লেখা পড়া করত। মেয়েদের অবশ্যি বেশি দূর লেখাপড়া করা সম্ভব হত না।

গুরুমশায়দের ছাত্র পড়িয়ে দিন চলত না। তাই তাঁরা মুদিখানার দোকান করতেন। ছাত্ররা পড়াশুনা করত আর গুরু মশায় মাল পত্তর বিক্রি করতেন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্ররা গুরু মশায়ের জন্য হুঁকোয় তামাক সেজে আনত। গুরু মশায়ের গা হাত টিপে দিত। আবার ফাঁক পেলেই গুরু মশায় নাক ডাকিয়ে কিছু সময় ঘুমিয়ে নিতেন। আর সেই সময় ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে মারামারি ধস্তাধস্তি করে নিত।

বিধুকুমারও সেরকম একটা মুদিখানা দোকানের গুরু মশায়ের কাছে লেখাপড়া করেছিল। বর্ণ পরিচয়টা ঘটে ছিল। তারপরতো আবার টোলে যেতে হবে আর সেখানে মাসে মাসে টাকা দিতে হবে, টোলের পণ্ডিতকে। কিন্তু বিধুর মা পাবে কোথায়? তাই লেখাপড়া আর হল না।

মা বললেন--আর তো পারিনে বাবা, সংসার যে আর চলে না। দু'বেলা দু'মুঠো শুধু ভাতই যে যোগাতে পারছি না। তুই বরং ক্ষেতে খামারে কাজ কর। তাতে পরের জমিতে কাজ করলে দু'দিনে এক আনা মজুরী পাবি। তা' না হয় নিজের জমি-জমা দেখ তাতে করে সংসারে সাশ্রয় হবে।

কিন্তু বিধুকুমার এসব কাজ করতে চায় না। তার ইচ্ছে ভাল ভাল জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। পাড়ার ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, আর বড়দের মত কথা বার্তা বলে। সমবয়সী বন্ধুদের যেমন সে পাণ্ডা, তেমনি বড়দের সঙ্গে সমানে মিশতে পারে। তার এহেন ব্যবহারে লোকে তাকে যেমন অনেক কটু কথা বলে, তেমনি অনেকে আবার ভালোও বাসে।

এক দিন সে টোলের পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁকে বলল — পণ্ডিত মশায়, আপনার বিদ্যের কথা গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই আপনার সুখ্যাতি করে, তাই আপনার পায়ের ধুলো নিতে এলাম।

অতটুকু ছেলের মুখে নিজের প্রশংশা শুনে পণ্ডিত মশায় তো একে বারে গলে জল। কাছে বসিয়ে নাম, বাবার নাম, গ্রামের নাম সব জেনে নিলেন। তারপর আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। কিন্তু বিধু এত সহজে মনের কথা বলার ছেলেই নয়।

সে প্রথমে হুঁকোয় তামাক সেজে আনল। তারপর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল এনে দিল। তারপর পাশে বসে গুরুমশায়ের শারীরিক কুশল জানতে চাইল। বাতের ব্যথায় কষ্ট হয় কি না? সন্ধ্যেবেলায় হাত-পা টিপে দেবার লোক আছে কি নেই? তার সেবাপরায়ন মনোভাব দেখে গুরুদেব খুব খুশি হলেন।

বিধু গুরুমশায়ের বাড়িতে একটা বিনা মাইনের কাজ জোগাড় করে নিল। গুরুর বাড়িতে থাকবে, খাবে আর তাঁর ফাই ফরমাস খাটবে। বিধু কাজে লেগে গেল। সারাদিন গুরুর মন যুগিয়ে কাজ করে কিন্তু যতক্ষন গুরুমশায় ছাত্রদের পড়ান ততক্ষণই সে পাশে বসে বসে সব শোনে। ছাত্ররা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বিধু চট্ পট্ উত্তর দিয়ে দেয়। গুরুমশায় যেমন করে বুঝিয়ে দেন সেও ছাত্রদের তেমনি করে বুঝিয়ে দেয়। তার মেধা আর স্মৃতি শক্তি দেখে গুরুদেব খুব খুশি হলেন। গুরুমশায় এক দিন বিধুকে বললেন — বিধে, তুই আমার কাছে লেখাপড়া করবি?

বিধু বলল — তাহলে আপনার কাজ পত্তর করে দেবে কে ? আমিতো আর গুরু প্রণামী (*মানে বেতন*) দিতে পারব না।

গুরুমশায় বললেন — সে দরকার নেই। তুই পড়াশুনো করবি, আর অবসর সময়ে কাজ পত্তর করে টরে দিবি, তাহলেই হবে। কথায় আছে গুরু মেলে লাখে লাখে চ্যালা মেলে এক। ভাল ছাত্র যখন পেয়েছি তোকে এমনিতেই পড়াব। তা তুই ভাল করে লেখাপড়া করলে তোকে প্রণামী দিতে হবে না।

গুরুমশায় যখন বিনা বেতনে তাকে পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন, তখন পাকা-পাকি ভাবে থাকা ও পড়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল বিধু কুমারের। আসলে সে লেখাপড়ার ধান্দাতেই গুরুর বাড়ি এসে ছিল। তাই সুযোগ পেয়ে লেখাপড়া খুব ভালই শিখল বিধুকুমার। কিছুদিন পর বিধু যুবক হয়ে উঠল। টোলের পড়াও সাঙ্গ হল। তাই গুরু গৃহ ছেড়ে তাকে বাড়ি ফিরতে হল। বৃদ্ধা মা ছেলের জন্য খুব চিন্তা করেন। ছেলেটা কোনো কাজের নয়। লেখাপড়া করলে কি হবে কাজে কম্মে মন নেই। তখন তো আর এমন চাকরি বাকরির

ব্যবস্থাও ছিলনা আর চাকরি দেবার সরকারি সংস্থাও ছিল না। সুতরাং কিই বা করবে? ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধা মা একদিন মারা গেলেন।

দুই

বিধুতো একেবারে একা হয়ে গেল। মায়ের সঞ্চিত সামান্য অর্থ আর জমি জমা ছিল। তা দিয়ে দিন চালাতে লাগল। ভাল ভাল পোশাক আষাক পরে গ্রামে গঞ্জে বন্দরে ঘোরাঘুরি করে। কোন দিন এক বেলা আহার জোটে কোন দিন তাও জোটে না। এক দিন নদীর ঘাটে এক ধনী ব্যাক্তির মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হল। মেয়েটির নাম সায়ন্তনী। সেকালে মেয়েরা দল বেঁধে নদীর ঘাটে স্নান করতে আসতো। আর বিধুকুমার ঘাটে যাওয়ার পথের ধারে কাছে থাকতো, যাতে মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়। এক দিন, দু'দিন দেখা হয় কথা হয় সায়ন্তনীর সঙ্গে। আলাপ পরিচয়ের পর হঠাৎ বিধু তাকে প্রস্তাব দিয়ে বসল--আমাকে বিয়ে কর, আমি তোমাকে রাণী করে দেব।

সায়ন্তনী যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। বিধুকুমারের কন্দর্পকান্তি চেহারা আর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্ত্তা শুনে তার ভাল লেগেছে। তবু সে কোন উত্তর না দিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে সব কথা অকপটে বলল। কোন কথা গোপন করল না। মাকে বলল--এক যুবক, নাম বিধুকুমার। সে নিত্য দিন বড় বড় ব্যবসাদার আড়তদারে সঙ্গে ঘোরা ফেরা করে। মহাজন দোকানদার সওদাগরদের সঙ্গে নানা জিনিসের বাজার দর নিয়ে আলোচনা করে। নদীর ঘাটে গিয়ে কোন্ বোট্ কখন ছাড়বে, কার মাল কোন্ দেশে যাবে, এসব খোঁজ খবর নেয়। আবার তার কাছ থেকে সকলে এসবের খোঁজ খবর নেয়।

মা বললেন -- তুই এত সব জানলি কি করে?

সায়ন্তনী লজ্জা লজ্জা মুখে বললে -- আমরা সব মেয়েরা মিলে নদীর ঘাটে জল আনতে যাই, তখন ওকে তো প্রায়ই দেখতে পাই।

মা মনে মনে ভাবলেন ছেলেটি হয়তো ব্যবসায়ী মহাজন হবে। মেয়েকে কিছু না বলে সায়ন্তনীর বাবাকে সব কথা বললেন। বললেন -- তুমি ছেলেটির খোঁজ খবর কর। মনে হয় তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ। তেমন হলে বিয়ের ব্যবস্থা কর।

সায়ন্তনীর বাবা বিধুকুমারাকে ডেকে জানতে চাইলেন তার সব কথা। বিধুকুমার উদাসীন ভারে উত্তর দিল -- এত দিনতো কিছু করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাই ব্যবসা বাণিজ্য দেখছি। গঞ্জে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ফিরতে কোন ঘাটে কখন তরী ভিড়বে কে বলতে পারে, বলুন?

সায়ন্তনীর বাবা বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না। ভাবলেন ছেলে নিশ্চই খুব বড়লোক। তাই কোনো কাজ করার প্রয়োজন হয় নি। পারিবারিক ব্যবসা পত্তর হয়তো দেখাশোনা করে। আর 'ঘাটে তরী' তার মানে নির্ঘাত বড় ব্যবসায়ী হবে। তাই তিনি বিধু কুমারের সঙ্গে সায়ন্তনীর বিয়ের তোড় জোড় করতে লাগলেন, যাতে ভাল ছেলে হাত ছাড়া না হয়। এদিকে সায়ন্তনী বিকেলে ঘাটে যাওয়ার পথে বান্ধবীকে দিয়ে বিধুকে ডাকল। তার পর একান্তে তার কাছ থেকে জানতে চাইল--আমার কথা মত বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। তা, তুমি আমাকে সত্যি সত্যি রাণী করে দেবেতো?

বিধু বলল — সব কিছু কি সহজে হয়? তার জন্য পরিশ্রম আর বুদ্ধির প্রয়োজন। আর দরকার একটা কলমের। কলমের জোরে সব হয়। বুঝলে?

সায়ন্তনী অবাক হয়ে জানতে চাইল—কলম। মানে যা দিয়ে লেখে? তা কলম দিয়ে কি হবে, তুমি যে আমায় রাণী করে দেবে বললে? তাইতো আমি মায়ের কাছে তোমার কথা বললাম।

বিধুকুমার বুঝতে পারল সায়ন্তনী রাণী হবার স্বপ্নে বিভোর। তাই বলল—আহা, রাণী হতে গেলে আমার হাতে একটা কলম থাকার প্রয়োজন। তবেই না আমি রাজা হব। আর আমি রাজা হলে তুমি রাণী হবে। এতে অবাক হবার কি আছে শুনি?

সায়ন্তনী বলল—সে না হয় আমি বাবাকে বলব, আমাদের বিয়েতে একটা ভাল কলম উপহার দিতে। তা হলে আমি রাণী হবতো?

বিধু বলল—ঠিক আছে কলম যত চলবে, তোমার রাণী হবার সময় তত এগিয়ে আসবে।

সায়ন্তনী রাণী আর কলম এই দুটো কথা ভাবতে ভাবতে নদীতে স্নান করে কলসি কাঁখে করে বাড়ি ফিরে এল। মা বললেন—সে কিরে, খালি কলসি যে, জল কোথায়? লজ্জায় জিভ কাটে সায়ন্তনী। কি সর্বনাশ, স্বপ্নে বিভোর সায়ন্তনী জল ভরতেই ভুলে গেছে।

ঠিক্ ঠাক্ মত শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। সায়ন্তনীর বাবা একটা সুন্দর কলম আর মসি পাত্র অর্থাৎ কালির দোয়াত উপহার দিলেন। সঙ্গে আরো অনেক উপহার, অনেক ধন দৌলত, টাকা কড়ি দিলেন। বাজ-বাজনা সহ আনন্দ উৎসব হল। চতুর্দোলাতে মেয়ে জামাইকে পাঠালেন।

কিন্তু সায়ন্তনী বাড়ি গিয়ে দেখে ভাঙা বাড়ি ঘর। চারি দিকে দারিদ্রের ছাপ। নিমেষে বাস্তবের ধাক্কায় স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে বেশ বুঝতে পারল বিধুকুমার তাকে ঠকিয়েছে। তবু সে ভেঙে পড়ল না। ভাবল যে ভুল হয়ে গেছে, তা গেছে। যা হবারতো হয়েইছে। সবুর করে তো দেখাই যাক্। বিধু যে বলেছিল কোন কিছুই সহজে হয় না।

বিধুর যা সামান্য জমি সম্পত্তি ছিল তারই কিছুটা বিক্রি করে আগামী কয়েক দিনের সংসার খরচ যোগাড় করল। আগের মত ধোপ দুরস্ত জামা কাপড় পরে সারা দিন কোথায় যেন বেরিয়ে যায়, আর সন্ধে বেলায় হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। সায়ন্তনী দেখে হতাশার স্পষ্ট ছাপ তার চোখে মুখে, আবার সকাল বেলা আশা-দীপ্ত মন নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

তবে সায়ন্তনীকে সে ভীষণ ভালবাসে। যেখান থেকে পারে সস্তার সৌখিন জিনিস কিনে এনে তাকে দেয়। কোন দিন নিজের দারিদ্র স্ত্রীকে বুঝতে দেয় না। হতাশা প্রকাশ করে সায়ন্তনীকে কষ্ট দেয় না। অপরদিকে সায়ন্তনী সব বুঝতে পারে। তাই বাড়িতে যে টুকু আহার্য জোটে তাই স্বামীকে দেয় আর নিজে খায়। অনেক কষ্টেও মুখটা হাসিহাসি রাখতে চেষ্টা করে। এভাবে বেশ কিছু দিন কাটল।

তারপর একদিন সায়ন্তনী বিধুকে বলতে বাধ্য হলো—আরতো এভাবে চালানো যায় না। গায়ের গয়নাগুলো একে একে বিক্রি করে ফেললাম। এবার তুমি একটা কিছু কর।

একটা কাজপত্র যোগাড় করে নাও। আর তাও যদি না পার তো লজ্জার মাথা খেয়ে বাবাকে না হয় বলি, যদি কোথাও কোন কাজ তিনি জোগাড় করে দেন। এক দিন তুমিতো আমায় রাণী করে দেবে বলেছিলে। এখনতো আমার ভিখারিনীর অবস্থা।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লো সায়ন্তনী। বিধুকুমার এই ভয়টাই করছিল। ব্যথা পেল সেও। কিন্তু বিধু সহজে জব্দ হবার নয়। সে বলল—রাণীতো তোমায় করে দেব। কিন্তু কলমটা যে কালি খাচ্ছে না।

সায়ন্তনী এবার হো হো করে হেসে ফেলল। বলল—কলম আবার কালি খাবে কি? সেকি গরু না ছাগল যে চোঁ চোঁ করে ফ্যান খাবে?

বিধুকুমার গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করলেও মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ল। সত্যিইতো এবার একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু সাধারণ কাজ করলে আর কোন দিন সে বড় হতে পারবে না। রাজা না হোক দেশের মধ্যে এক জন গণ্য মান্য মানুষ হয়ে ওঠার বাসনা তার ছোট বেলা থেকেই। আর আজ সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতে বসেছে। চিন্তায় তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

সত্যিইতো সায়ন্তনী অতি দুঃখে আছে। কাউকে কিছু না বলে গায়ের গয়না বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছে। বন্ধক দেয় না। কারণ সে জানে বাঁধা দিলে আর ছাড়ানো যাবে না। তাই বিধু ঠিক করল সকালে উঠে সে চলে যাবে দূরে কোনও শহরে বা গঞ্জে যেখানে কেউ তাকে চেনে না। সেখানে যা কাজ পাবে তাই করবে। মুটেগিরি, রাজ মিস্তিরির যোগাড়ে অথবা কোন ব্যবসায়ীর খাতা লেখা, মুৎসদ্দীর কাজ যা পায়, তাই।

সে হেরে গেছে। জীবনে সে যা চেয়েছিল তা হয় নি। এমন কোন সুযোগ সে পায় নি যা দিয়ে ভাগ্যকে ফেরানো যেত। অথচ সেই ভাগ্যান্বেষণে সে এত দিন ঘুরেছে। সেদিন মায়ের কথামত দু'পয়সা রোজে চাষের কাজে লেগে পড়লে আজ অন্তত তার এত দুঃখ হত না। সারা দেশের অসংখ্য ক্ষেত মজুরের সঙ্গে মিলে মিশে দুঃখকে ভাগ করে নিতে পারত। দুঃখকে ভাগ করে নিজের দুঃখ কমানো যেতে পারে কিন্তু অপরের দুঃখ দূর করা যায় না, নিজেও সুখি হওয়া যায় না। অপরকে সাহায্য করতে হলে নিজেকে শক্তিশালী হতে হবে। নিজে বড় না হলে—নিজের, অপরের, কারো দুঃখই দূর করা যাবে না। যাক্‌গে ওসব কথা .....।

মনে মনে দারুণ বেদনা অনুভব করল সায়ন্তনী। বিয়ের পর থেকে কোন দিন কোনও কটু কথা সে বলেনি বিধুকে৷ আজ সে বিধুকে আঘাত দিয়েছে। দিতে বাধ্য হয়েছে। তবু স্বামীর স্বপ্নের সঙ্গে তার স্বপ্ন যে জড়িয়ে আছে। সায়ন্তনী কিন্তু বিশ্বাস করে নিয়েছে সুখ বলে তার জীবনে অবশিষ্ট আর কিছু নেই। এমনি করে দুঃখে কষ্টে জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে। তাই সে আর বাপের বাড়িও যায়না। যাবে কোন মুখে? তার দারিদ্র যে আর লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

তিন

সাত সকালে রাজপথে ঢাক বাজিয়ে কি যেন ঘোষণা করছে। ঘুম জড়ানো চোখে বিছানা ছেড়ে উঠল সায়ন্তনী। কান পেতে মন দিয়ে শুনল। রাজার ঘোষক ঘোষণা করছে

— আগামী কাল, বৈশাখী পুর্ণিমায় বিশাল সমারোহ। রাজ বাড়িতে উৎসব ও ভোজ সভার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের সব গন্যমান্য ব্যক্তি, আপামর জনগনের এই উৎসবে যোগ দানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। তখনকার দিনে রেডিও, টিভি কিংবা খবরের কাগজ ছিলনা, তাই এমনি করে ঢোলক বাজিয়ে রাজপথে কোন খবর ঘোষনা করা হত। একে বলা হত 'ঢেঁড়া পেটানো'।

সায়ন্তনী বিধু কুমারকে বলল—যাও, রাজ বাড়ির উৎসবে।

বিধু বলল—না, আমার যাওয়া হবে না।

সায়ন্তনী বলল— ও বুঝেছি, তোমার পোশাক পুরানো হয়ে গেছে তাই না? যাও, আমার গলার হারটা বিক্রি করে যা পাবে তাই দিয়ে তোমার পোশাক বানিয়ে নাও। রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ। সেখানে উপস্থিত হওয়াটা মর্যাদার ব্যাপার। কত ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে মিশতে পারবে। এক দিন আনন্দ করবে। তুমিওতো রাজ কর দাও। শিক্ষিত মানুষ, কেন নিজেকে ছোট করে রাখবে? মাথা উঁচু করে তুমি সমাজে বাঁচবে। তাইতো আমি তোমার কছে এসেছি। তোমার উচ্চ আকাঙ্খা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে ছিলাম, আজ তুমি যদি ভেঙে পড় তাহলে আমি কি করি বল? তুমি যাও।

সায়ন্তনীর কথাগুলো যে বিধুরই মনের কথা। আজ সে কথা অন্যের মুখে শুনে মনে জোর পেল বিধুকুমার। আজ সে বিশ্বাস করলো, সায়ন্তনী তার প্রকৃত সমব্যথি। কিন্তু সায়ন্তনীকে দেওয়া আশ্বাস আর রাখতে পারবে না বিধু, এটাই তার আবশোস।

বিধু ভাবল তাই হোক্। কিন্তু স্ত্রীর শেষ গয়নাটা না নিয়ে নিজের অবশিষ্ট যা জমি পুকুর ছিল সব বেচে দিল। বসত্ বাড়িটুকু ছাড়া আর কিছুই তার রইল না। ভাবল কাল থেকে তো খেটে খেতে হবে। একটা দিন বিলাসিতা করে নিই। তাই সে সেই টাকা দিয়ে নিজের জন্য এবং স্ত্রীর জন্য ভাল পোশাক পরিচ্ছদ কিনে আনল। বাকি যা টাকা বাঁচল তা দিয়ে আগামী বেশ কিছু দিন সংসার চলে যাবে। তার পর যা হবার হবে। কোন অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে যে কোন কাজ করবে। এত লোকের চলছে আর তার চলবে না? ঠিক চলে যাবে। তবে বড় হওয়া হবে না, এই যা।

রাজ বাড়িতে বিশাল সমারোহ। হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। বিভিন্ন মণ্ডপ তৈরী হয়েছে নানা শ্রেণীর জন্য। কেবল উচ্চ শ্রেণীর মান্য গন্য কতিপয় মানুষের রাজ সভায় প্রবেশের অনুমতি আছে। বাকিদের জন্য আলাদা মণ্ডপ রয়েছে। বিধুকুমার রাজপোশাকে সজ্জিত হয়ে মন্থর গতিতে রাজ সভার দিকে এগিয়ে চলল। দ্বারি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে রাজসভার দ্বার ছেড়ে দিল। ভিতরে গিয়ে দেখে, বহু গন্য মান্য ব্যক্তি জমিদার, জোতদার, সামন্ত, সওদাগর, বণিক, পণ্ডিত মানুষ সব উপস্থিত। রাজা কিংবা মন্ত্রী কেউই সভায় তখনো আসেন নি। বিধু একে বারে সামনের সারিতে গিয়ে বসল।

কিছুক্ষণ পর ঘোষক রাজা ও মন্ত্রির আগমন বার্তা ঘোষণা করে দিল। সকলে উঠে দাঁড়াল। বাইরে রাজার জয়ধ্বনি উঠল। বিধুকুমার চট্পট্ উঠে গিয়ে রাজার সিংহাসনে বসে পড়ল। সভার সবাইতো অবাক। হৈ চৈ বেধে গেল। সেনাপতি, কোটাল, নাজির, উজির যে যেখানে ছিল হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বিধুকুমারকে টানা হেঁচড়া করে সবাই

সিংহাসন থেকে নামাতে চায়। কিন্তু বিধুতো কিছুতেই নামবে না। ততক্ষণে রাজা সিংহাসনের একেবারে কাছে এসে গেছেন। আধ বসা অবস্থায় বিধু রাজাকে প্রশ্ন করল—কেন আমি এই সিংহাসনে বসতে পারব না?

রাজাতো অবাক। তিনি বললেন—সেকি, তুমি যদি সিংহাসনে বস তাহলে আমি কোথায় যাই? আমি রাজা, তাইতো আমার সিংহাসনে বসার কথা।

ততক্ষণে বিধুকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ফেলা হয়েছে। রাজা কাল বিলম্ব না করে সিংহাসনে বসে পড়লেন। কি জানি আবার কি ঘটতে কি ঘটে। বিধু কুমার বলল—মহারাজ, আমার যদি একটা কাজ থাকত তাহলে আমিও ঠিক এক দিন এমনি একটা সিংহাসনে বসতে পারতাম।

কতোয়াল বলল—মহারাজ হুকুম দিন। এই উদ্ধত যুবককে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে এর মুণ্ডু পাত করি।

মন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন - বধ্য ভূমি কেন, এখানেই বর্বরটার শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন, মহারাজ।

রাজা হাত তুলে সকলকে থামিয়ে দিয়ে নিজে একটু চিন্তা করলেন। এত লোক থাকতে এই লোকটাইবা সিংহাসনে বসতে গেল কেন? দেখেতো বিকৃত মস্তিস্ক বলেও মনে হয় না। রাজা বিধুকে প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা, তুমি চাকরি পেলে রাজা হতে পারবে?

চাপের মুখে ভেঙে না পড়ে, বিধু সদম্ভে উত্তর দিল হ্যাঁ, নিশ্চই। আপনি একটা চাকরি দিয়েই দেখুন না। নেহাত বেকার তাই। না হলে বিদ্যে বুদ্ধিতো আমার কম নেই। লেখাপড়াও করেছি বিস্তর, কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারছি কোথায়?

রাজা এবার জানতে চাইলেন — তুমি কি কাজ চাও, কত বেতন চাও?

বিধু বলল — যে কোন কাজ মহারাজ। কোন কাজই অবহেলার নয়। কাজ কখনো ছোট বড় হয় না। আর মাইনে সে তো আপনার বিবেচনা।

রাজা বললেন — 'নাই পয়সা হাতে খরচ।' রাজি আছ?

— হ্যাঁ।

মন্ত্রী বললেন—কথাটার মানে বোঝোতো হে, ছোকরা?

বিধ কুমার বলল—আমি ঠিকই বুঝেছি। বাড়িথেকে খেয়ে আসব, আর আপনার এখানে কাজ করব। মাসগেলে কোন বেতন পাব না। এইতো আপনি বলতে চাইছেন? আমি তাতেই রাজি। কেবল একটা হুকুমনামা আমাকে দিয়ে দিন, আমি কাল থেকেই কাজে যোগ দেব।

রাজা বললেন—মন্ত্রি, মহুরিকে দিয়ে 'নাই পয়সা হাতে খরচ'-এ কাজ করার একটা হুকুম নামা লিখিয়ে এই যুবককে দিয়ে দিন।

মন্ত্রি বললেন —ও কি কাজ করবে মহারাজ?

রাজা একটুও চিন্তা না করে বললেন—আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা গুনবে।

মন্ত্রী, কোটাল, নাজির, উজির সকলে সমস্বরে হেসে উঠলেন। হাসির রোল উঠলো সভার মধ্যেও। ভাবটা এমন যে, ব্যাটা মূর্খ, কেমন জব্দ?

বিদুষক বলল—মহারাজ, সেরা কাজটাই দিয়েছেন।

চার

রাজার স্বাক্ষরিত নিয়োগ পত্র হাতে নিয়ে রাজসভায় রাজপুরুষদের জন্য নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসল বিধুকুমার। হাজার হোক আজ সে রাজ কর্মচারী। নাইবা পেল বেতন।

বিধু সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে এলো। চোখে মুখে তার আনন্দের হাসি। সায়ন্তনীকে বলল দেখো, এবার তোমায় ঠিক রাণী করে দেবো। কাল থেকে কলমটা কালি খাবে।

সায়ন্তনী কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—'কালি খাবে' তো অনেক দিন শুনছি। কি করে কাল থেকে কলম কালি খাবে? আচ্ছা, আমায় একবার দেখাবে তো।

-- সে তোমার দেখে কাজ নেই। তোমার শুধু রাণী হলেই হোলো। কাল আমায় খুব সকাল করে বেরোতে হবে। রাজবাড়িতে কাজ আছে।

সায়ন্তনী অভিমানের সুরে বলে—তোমার কথার ছাই ভষ্ম আমি কিছু বুঝি না। কথার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু। সেইতো তুমি বলেছিলে আমাকে রাণী করে দেবে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে মায়ের কাছে বানিয়ে বানিয়ে তোমাব নামে কত ভাল ভাল কথা বললাম। আর এখন রাণীতো দূরের কথা ভিখারিনীর চেয়েও খারাপ অবস্থা। এখন মায়ের কাছেও এসব কথা বলতে পারি না, তোমায় বলে তো কোন লাভ নেই। বুঝেছি, তোমার কথায় আমি ঠকে গেছি। আধ পেটা শাক ভাত জোটাতে পার না, আবার রাণী করে দেওয়ার স্বপ্ন দেখাও।

বলেই ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল সায়ন্তনী। বিধু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—আমি তোমায় কখনো মিথ্যে বলি নি। চির দিন সুখে থাকার স্বপ্ন আমি দেখেছি। তোমাকেও সুখে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু শত চেষ্টাতেও পারি নি। তবে দেখো, এবার সত্যিই তোমায় সুখে রাখব। তোমার কোন অভাব রাখব না। কাল থেকে রাজবাড়িতে কাজ পেয়েছি। তা সে যে কাজই হোক, রাজ কর্মচারীতো। কাজতো কাজই।

সায়ন্তনীর মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। চোখের জল যেমনি গড়াচ্ছিল তেমনি গড়াতেই লাগল। সে বলল—তবু ভাল একটা চাকরি পেলে। মাস গেলে দু'টো পয়সা বেতন আসবে। দু'বেলা ভাত কাপড়ের একটা ব্যবস্থা হবে, নৈলে এখন যা অবস্থা.......!

বিধু বলল—সে গুড়ে বালি। চাকরিটা 'নাই পয়সা হাতে খরচ।' বুঝলে? বেতন টেতন পাওয়া যাবে না, আর খাওয়া দাওয়া বাড়িতে সারতে হবে।

সায়ন্তনী বলল — তোমার সব কথাতেই হেঁয়ালী। আমি এর কিছু বুঝি না। তবু তোমার মুখ দেখে তোমার কোন কথাই অবিশ্বাস করতে পারি না। আর বিশ্বাস করেই আমার আজ এই মরণ দশা।

পরদিন সকালে বিধুকুমার রাজ বাড়িতে এসে হাজির। এসেই নাজিরকে বলল — মহারাজ আমাকে নিয়োগ করেছেন। আমায় রান্না ঘরের পিছনে চেয়ার টেবিল পেতে দিন। আমার খাতা পত্র, মসি পাত্র, কলম দান প্রভৃতি দিয়ে দিন।

সেইমতো ব্যবস্থা হল, অন্দর মহলের কর্মচারীরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওই করতে লাগল। বিধু এবার রান্নার কজে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীকে ডেকে জানিয়ে দিল—এখন

থেকে রাজ বাড়িতে যে খাবে তার নাম আমার খাতায় নথিভুক্ত করতে হবে। ব্যাতিক্রম হলে শাস্তি। প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

প্রথম ব্যাক্তি আস্তা কুড়ে পাতা ফেলতে এলে বিধু বলল—থাম, কে খেল?

— আজ্ঞে পঞ্চু।

— কি করে?

— ওতো এখানে কিছু করে না। ও দাসীর ছেলে।

— না না, তা হবে কেন? এখানেতো দাসীর ছেলের খাবার কথা নয়। যে কেউ খেলেই তো হল না। ডাক তাকে।

অগত্যা দাসী আর তার ছেলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হল। বিধুকুমার প্রথমে ধমক দিল, তার পর শান্ত ভাবে বোঝাল, যেন কত আপন জন । বলল—দেখ্, রাজবাড়িতে কত লোক এমনি করে খেয়ে যায়। সুতরাং রাজার ভীষণ ক্ষতি হয়। তাই রাজা পাত গোনার ব্যবস্থা করেছেন। আমিতো আর কাজে অবহেলা করতে পারি না। আমাকে সব কথা রাজাকে লিখে জানাতে হবে। রাজা জানতে পারলে কি হবে সে তো বুঝতেই পারছিস? শেষ পর্যন্ত প্রাণটাও যেতে পারে। আবার রাজ বাড়িতে না খেলে, তোদেরই বা চলে কি করে বল্? তা তোরা খাচ্ছিস খা। তবে পাত প্রতি এক পয়সা করে এখানে জমা কর। তাহলে আমি আর রাজাকে সে কথা বলব না। তাতে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। আর রাজারও কোন ক্ষতি হবে না।

পাঁচ

নিরক্ষর দাসী রাজার কেন ক্ষতি হবে না তা বুঝতে না পেরে মনে মনে নানা হিসাব কষে, শেষে হাল ছেড়ে দিল এবং বিধু কুমারের কথাতেই সায় দিল। এভাবে বিধু প্রত্যেকের কাছ থেকে এক পয়সা, এক পয়সা করে আদায় করতে লাগল। এর পর সকলে জেনে গেল বিধু বাবুকে এক পয়সা দিলে রাজবাড়িতে পেট ভরে খাওয়া যাবে। সুতরাং রাজকর্মচারীদের ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন খিড়কির দরজা দিয়ে এসে রাজবাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতে লাগল। আর বিধুর আয় রোজগার বাড়তে লাগল।

রাজ অন্তঃপুরে বিধুর কদর ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। রাঁধুনী, চর্চক, ভাণ্ডারী সবাই কিছু না কিছু জিনিস পত্র বরাবর সরাতো, মানে চুরি করতো আরকি। বিধু এবার সেখানে থাবা বসালো। বললে সে হবেনা। এতে রাজার ক্ষতি হবে, সুতরাং আমায় কিছু দাও। নৈলে রাজার কাছে নালিশ হবে, তোমাদের গর্দান যাবে। প্রাণের মায়া আর উপরি আয় দুটোই মানুষের কাছে সমান প্রিয়। সুতরাং তাদের সঙ্গে মাসে একটা লেন দেনের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিধু প্রথম দিনই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। সকলের আগে দু'জনের জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার তার বাড়িতে পৌছে দিতে হবে। কারণ সেতো 'নাই পয়সা হাতে খরচ'-এর চুক্তিতে কাজ করে। তাকে নিজের বাড়িতে খেতে হবে। আর সায়ন্তনী, সেকি হাত পুড়িয়ে রান্নাকরে খাবে? তাতো হতেই পারে না।

রাজা, রাণী, মন্ত্রী, কোটাল প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের জন্য আলাদা রান্নাশাল। সেখানে রাজভোগ তৈরী হয়। বাকিদের জন্য সাধাবণ রান্নাঘর। কিন্তু বিধুর খাবার আসে সেখান থেকেই, যেখানে রাজা রাণীর জন্য রান্না হয়। অর্থাৎ বিধুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক জন। এভাবে নিজেকে নিজে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে বিধু। চর্চক, ভাণ্ডারী, বাজার সরকার সকলের সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত করে ফেলল বিধু। তারা মাসে মাসে কিছু টাকা বিধুকে দেবে, আর তার বিনিময়ে বিধু রাজার কাছে তাদের অপকর্মের জন্য নালিশ করবে না।

সায়ন্তনী বেশ বুঝতে পারল কলম কালি খাচ্ছে। রোজ রোজ ভাল ভাল খাবার দাবার বাড়িতে আসছে। নূতন শাড়ি গয়না। ভাঙা কাঠের বাক্স সরিয়ে সেখানে লোহার সিন্দুক বসছে। ভাঙা বাড়ি মেরামতির কাজ চলছে। এক কথায় সায়ন্তনী এখন সুখি।

তাই সুখের বহর দেখাতে মাসে একবার বাপের বাড়ি যেতে হয়। যাকে দেখে তাকেই বোঝানোর চেষ্টা করে, তার স্বামী এখন রাজার কর্মচারী। কিন্তু কাজটা যে ঠিক কি করে, তা সে নিজেই জানে না। তাই সবাইকে বলে, সে সব জটিল রাজকাজ, তোমরা বাপু বুঝবে না। আর সে সব উঁচু মহলের গোপন কথা, যেখানে সেখানে বলা বারন।

বছর ঘুরে গেল। আবার সেই বৈশাখী পূর্ণিমা। আবার রাজবাড়ির বাৎসরিক উৎসবের কথা ঘোষক দল ঢেঁড়া পিটিয়ে রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণা করল। দেশ বিদেশের মানুষ এসে জড় হল রাজ দরবারে। রাজা যখন রাজ সভায় প্রবেশ করবেন ঠিক সেই সময় বিধুকুমার ভাল পোশাক আষাক পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে ঘোড়ায় চেপে রাজ সভার সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে আছে অনেক লোক জন। আর একটি বিশাল রূপোর থালায় সাজানো নানা উপঢৌকন।

দু'জন সুসজ্জিত দাসী উপহারের থালা বহন করে রাজ সভায় প্রবেশ করল। রাজা সবে মাত্র আসন গ্রহণ করে সভাসদদের অভিনন্দন বার্তা জ্ঞাপন করছেন এমন সময় বিধুকুমার ও তার দাসীর হাতে অপূর্ব উপহার দেখে রাজা থমকে গেলেন। বিধুকমার রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে তিন পা পিছিয়ে এসে রাজকীয় কায়দায় দাসীর হাত থেকে উপঢৌকনের পাত্র নিয়ে রাজার সামনে ধরল। রাজা সেটা সাদরে গ্রহণ করে পার্শ্বস্থ প্রতিহারির হাতে তুলে দিলেন। এবার মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন — যুবক, আপনি কোন রাজ্য থেকে আগমন করছেন। আপনি কোনও রাজপুত্র, না কি যুবরাজ, আপনার পরিচয় জ্ঞাপন করুন।

অন্দর মহলে বিধুকুমারের হাঁক ডাক হম্বি তম্বি থাকলেও সদরে তার কোন পরিচয় কেউ জানত না। তাই এই রকম জমাটি পোশাক আষাক যা সাধারণতঃ রাজপুত্র বা যুবরাজ পরে থাকে, বিশাল ঘোড়া, দাস দাসী, উপহার সামগ্রী দেখে কে-ই বা বলতে পারে যে, এই সে-ই এক বছর আগের 'নাই পয়সা হাতে খরচ' চাকরী প্রার্থী বিধুকুমার।

বিধুকুমার সহাস্য বদনে মন্ত্রীকে অভিবাদন করে সভাসদদের উদ্দেশে হাত তুলে সম্মান জানিয়ে রাজাকে বলল — মহারাজ, আমি কোন যুবরাজ নই, নই কোন রাজপুত্রও। আমি কেবল মহারাজের এক অধীস্থ কর্মচারী মাত্র। মনে পড়ে মহারাজ, ঠিক এক বছর

আগে এই রকম উৎসবের দিনে আমি খালি হাতে সভায় প্রবেশ করে আপনার সিংহাসনে বসে ছিলাম এবং বলেছিলাম একটা কাজ পেলে আমি রাজা হয়ে যাব। তাই মহারাজ দয়া পরবশ হয়ে আমাকে 'নাই পয়সা হাতে খরচ' শর্তে আস্তাকুড়ের পাতা গোনার কাজ দিয়ে ছিলেন। আমি সেই বিধুকুমার। এক বছরে রাজা হতে পারিনি ঠিকই তবে রাজপুত্র ভেবেতো আপনাদের ভুল করাতে পেরেছি।

রাজা মন্ত্রী সভাসদ সকলে তো অবাক। সে কি কথা! বিনা পয়সার চাকরী, তা'থেকে এত রোজগার হয় কি করে? বিধুকুমার কোনো রকম মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অকপটে স্বীকার করল — মহারাজ, আপনার অন্দর মহলে বহু মানুষ এমনি আহার করে। আমি তাদের কাছ থেকে পাত পিছু মাত্র এক পয়সা ধার্য্য করেছি। আর ভাণ্ডারী, রাঁধুনী, হালুইকর, বাজার সরকার যারা রাজার অর্থ আত্মস্যাৎ করে আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সামান্য মাসহারার চুক্তি করে নিয়েছি। তাতে আপনার কোন ক্ষতি নেই, কোন অতিরিক্ত ব্যয় নেই। রন্ধন, ভোজন, পরিবেশন প্রভৃতির উন্নতি হয়েছে আমার তদারকিতে এবং আমারও কিছু উপার্জন হয়েছে।

তাইতো, মহারাজ আপনার সমস্ত কার্যলয়ে বিজ্ঞাপন টাঙানো আছে — "আপনাকে সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন"। (*Help us to help you*)। আমি ওদের সাহায্য করেছি আর ওরা আমাকে সাহায্য করেছে। একে আপনি 'সহায়ক মূল্য' বলতে পারেন, 'উৎসাহ মূল্য' বলতে পারেন আবার 'উৎকোচ'ও বলতে পারেন। যার একটা মাত্র অর্থ, নিজের অর্থ উপার্জন আর অপরের কার্যোদ্ধার।

মন্ত্রী বললেন--মহারাজ, এই যুবক উৎকোচ গ্রহণ করে অন্যায় কাজ করেছে, এর শাস্তি হওয়া উচিত। একে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হোক।

কতোয়াল বললেন — না মহারাজ, ব্যাটা অধম। এর মুণ্ডুচ্ছেদ করার আদেশ দিন।

রাজা বললেন-- তাইতো বিধুকুমার তুমি উৎকোচ গ্রহণ করে সত্যিই ভাল কাজ কর নি। সুতরাং তোমার শাস্তি হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমার কিছু বলার আছে?

বিধু সাহসের সঙ্গে বলল — সেকি কথা, আমি চাকরি করতে এসেছি কিছু উপার্জনের জন্য। তা আপনি কোনো বেতন দেবেন না, আবার খরচটাও নিজের হাতে, তাহলে একজন প্রজার চলে কি করে?

রাজা বললেন--তাইতো, তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। কিন্তু তা হোক, শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। মন্ত্রী, একে এমন কাজ দিন, যাতে এই যুবক কোন প্রকার উপার্জন করতে না পারে। সেটাই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। আর যদি রাজকার্যে অবহেলা করে তা হলে আমি আগাম মৃত্যুদণ্ড ধার্য করলাম।

মন্ত্রী, উজির, নাজির, সেনাপতি আলোচনা করে ঠিক করলেন বিধুকে রাজ্যের বাইরে নির্জন নদীর ধারে সমুদ্রের কাছাকাছি বসে ঢেউ গণনা করতে হবে। এবং তার বাৎসরিক হিসাব রাজ সভায় পেশ করতে হবে। পুলকিত হয়ে কতোয়াল বলল--বেটাকে আর হিসাব পেশ করতে হবে না, তার আগেই বাঘের পেটে যাবে।

বিধুকুমার হাসি মুখে রাজাদেশ হাতে নিয়ে বাড়ি এল। সায়ন্তনীকে বলল—রাজা আমার পদোন্নতি ঘটিয়েছেন। তাই আজ থেকে আর আমার প্রতিদিন বাড়ি আসা হবেনা। আর বিপদও আছে অনেক। কাজটা ঠিক মত করতে না পারলে প্রাণটাও যেতে পারে।

শুনেতো সায়ন্তনীর মুখ গেল শুকিয়ে। সে বলে—না না বাবা, আমার অমন চাকরীর প্রয়োজন নেই। তুমি জবাব দিয়ে দাও। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকব। একবেলা আধ পেটা খাব সেও বেশ। মরণ ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই।

— সে তো হতে পারে না। রাজার আদেশতো মানতেই হবে। তাছাড়া তোমাকে রাণী করতে না পারলে কথার খেলাপ হবে। সুতরাং আমাকে কাজে যেতেই হবে।

সায়ন্তনী বিধুর হাত ধরে কাকুতি মিনতি করে বললে, সে রাণী হতে চায় না। বিধুকে কোন বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিতে সে পারবে না। তাতে যদি আগের মত দারিদ্রের মধ্যে থাকতে হয় তাও ভাল।

বিধু তাকে বোঝাল — মিথ্যে ভয় পেও না। কাজটা আমি ঠিক্ ঠাক্ করতে পারব। আমার বুদ্ধির ওপর ভরসা রাখো। ভয়কে দেখে, ভয় পেতে নেই। জীবনে ঝুঁকি ছাড়া কোন কাজ হয় না। আর প্রাণতো চির দিনের জন্য নয়, এক দিন ওটা যাবে। তা বৃদ্ধ হয়ে মরার চেয়ে ঝুঁকি নিয়ে মরাতে অনেক বেশি সম্মান। "যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ, কেহ কভু তাহাদের করেনি সম্মান"।

সায়ন্তনী আর কি বলে, তবে বিধুকে আজ যেমন যুগপৎ খুশি আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাতে সে ভয় পাবে না খুশি হবে বুঝতে পারলো না। এত দিন একসাথে থেকে, কেন কি জানি আজও সে তার স্বামীকে তেমন ভাবে বুঝতে পারলো না।

বিধুকুমার রাজবাড়িতে গিয়ে বলল, নির্দিষ্ট স্থানে অফিস নির্মাণ করতে হবে এবং সেখানে একটা বড় করে কাঠের ফলক লাগাতে হবে, যাতে সকলের চোখে পড়ে। সেই ফলকে লেখা থাকবে "রাজ কার্য্যালয় - ঢেউ গণনা কেন্দ্র"। রাজার আদেশনামা রয়েছে সুতরাং সেই মত ব্যবস্থা হয়ে গেল। মাত্র সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে গেল।

জনকোলাহলহীন, সারাদিন কেবল জলের স্রোত আর বনের প্রাণীর আনাগোনা। নদীর মাঝখান দিয়ে জাহাজ নৌকো প্রভৃতি যাতায়াত করে। ক্ষণে ক্ষণে বাঘের গর্জণ শোনা যায়। প্রাণ ভয়ে ভীত হরিণ ও ছোট ছোট প্রাণী ছুটে পালাতে থাকে। বিধু ভাবে প্রাণটা বুঝিবা গেল। দ্বিপ্রহরে নদীতে জল খেতে আসে বাঘ, ভাল্লুক, হায়না প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী। জলহাঁস, খড়হাঁস, সারস প্রভৃতি নানা পাখি নদীর তীরে দেখা যায়। গাছে টিয়া, ময়না, কোয়েল, দোয়েল, পাপিয়া, শালিক, তোতা আরও নানাপ্রকার নাম না-জানা রঙবেরঙের পাখি দেখে বিধুর মন ভরে ওঠে।

বিধুকুমার একা আর তার চার পাশে জনশুণ্য অরণ্য। শ্বাপদ সংকুল সেই নির্জন ভূমিতে সাহস হারায়নি বিধু। জানে কোন না কোন মানুষ আস পাশে পাওয়া যাবে। তাই হল, দেখতে পেল মাঝে মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের কাঠুরে ভালো কাঠের সন্ধানে দল বেঁধে আসে। আদিবাসি সবর শিকার করতে বা মধু সংগ্রহ করতে আসে আবার নিজের ডেরায় ফিরে যায়।

বিধুকুমার এক আদিবাসি যুবককে তার নিজের অনুচর হিসাবে নিয়োগ করল। অনেক টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে তাকে সেই বিপদসঙ্কুল সমুদ্র সৈকতে নিজের কাছে রাখতে সমর্থ হল। সুতরাং কিছুটা সাহস পেল, এবার কাজ শুরু করতে হবে। নদীর জলের সামান্য উঁচুতে একটা মোটা লোহার তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত টাঙিয়ে দিল। এর পর সমুদ্র থেকে নদীতে বা নদী থেকে সমুদ্রে কোন জাহাজ যেতে গেলে বাধা দিল বিধুকুমার।

বিধুকুমার বলল-- না, তার পেরিয়ে কোন জাহাজ নৌকা বজরা যেতে পারবে না। কারণ এখানে রাজার আদেশে ঢেউ গণনা চলছে। যান বাহন চললে ঢেউ নষ্ট হবে। রাজ কার্যে ব্যাঘাত ঘটালে বিপদ, জেল জরিমানা, এমন কি প্রাণও যেতে পারে।

দেশ-বিদেশের বণিক, মৎস্যজীবি, সখের ভ্রমণকারী সকলে পড়ল বিপদে। কি আর করা যায়। অগত্যা বিধুর কাছে কাকুতি মিনতি। বিধু বলল--বেশ তোমাদের কষ্ট আমি বুঝি, তোমাদের বা দোষ কোথায়? কিন্তু আমিতো আর রাজার আদেশ অমান্য করতে পারি না. সুতরাং আমায় কিছু দিলে আমি তোমাদের যেতে দেব আর রাজাকেও কিছু বলব না।

না, আর এক পয়সা নয়। জাহাজ প্রতি দশ বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আর ছোট নৌকা বজরা বোট যে যেমন মাপের তার তেমন ধার্য হল। সুতরাং টাকার পাহাড় জমতে শুরু করল মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। টাকায় টাকা আনে, জলে জল বাড়ে, আর মানুষ দেখলে মানুষ আসে। সুতরাং দূরবর্তী বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল বিধু। এবার শুরু হল প্রাসাদ নির্মাণ। বিভিন্ন রাজ্য থেকে রাজ মিস্ত্রী এবং কাজের লোক আসতে লাগল। তারা এসে বন কেটে বাসভূমি গড়ে তুলল। প্রজাদের বসতি শুরু হল। নদী তীরের উর্বর জমিতে চাষ শুরু হয়ে গেল। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাট তৈরী হতে লাগলো।

প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী হল সায়ন্তনী। না শুধু সায়ন্তনী নয়, রাণী সায়ন্তনী। নব বসতির অধিবাসীরা নিজের থেকেই সায়ন্তনীকে 'রাণীমা' সম্বোধন করতে শুরু করে দিল। লোক লস্কর দাস দাসী সৈন্য সামন্ত সমস্ত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল 'সায়ন্তনী নগর'।

নদীর মোহানায় সমুদ্রের সংযোগ স্থলে তৈরী হল বন্দর। আর সেই বন্দরে দেশ বিদেশের জাহাজ এসে থামতে লাগল। বড় জাহাজ নদীর ভিতরে বর্ষাকাল ছাড়া চলতে পারে না। সুতরাং এখানে তারা মাল নামিয়ে স্থল পথে বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করতে লাগলো। ফলে গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মাথা মুটের অঢেল কাজ পাওয়া যেতে লাগল। আবার ব্যবসায়িক তদারকির জন্য, হিসাব নিকাশ রাখার জন্য শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন বাড়লো। তাই বিভিন্ন রাজ্য থেকে কাজের সন্ধানে লোক জন আসতে লাগলো। তাদের থাকা, খাওয়া দাঁওয়ার জন্য জন্য গড়ে উঠলো সরাইখানা, চটি, বাজার। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য পাঠশালা আর পাঠশালার জন্য শিক্ষক। বিধুর উদ্যোগে তৈরী হল রাস্তা ঘাট। জমজমাটি আধুনিক নগর। শুধু নগর নয়, একটা ব্যবসায়ী কেন্দ্র হিসাবে যেন গড়ে উঠতে চাইছে এই সায়ন্তনী নগর। হাজার মানুষের কর্ম-সংস্থানের হাতছানি। আর কয়ের বছরের মধ্যে হয়তো এটাই হয়ে উঠবে এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী।

নদীর চরে উর্ব্বর জমিতে শুরু হয়েছে কৃষি কাজ। কৃষির সাথে পশু পালন, কৃষি পণ্য বিপনন।

না, বিধু আর উৎকোচ নেয় না। তার বদলে তার নিযুক্ত কর্মচারী বন্দর কর আদায় করে। কর আদায় হয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, বাসিন্দাদের কাছ থেকে। না, জোর করে নয়, স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতার মধ্যে তারা রাজকর রাণী সায়ন্তনীর কার্য্যালয়ে জমা দিয়ে আসে। পাইক পেয়াদার দাপাদাপি নেই। নেই কোন জোর জুলুম। রাজ্যরক্ষা, শান্তিরক্ষা, দস্যু তস্কর প্রতিরোধের জন্য গড়ে উঠেছে রক্ষিবাহিনী, সেনাবাহিনী। তারা সকলে রাজা বিধুকুমার আর রাণী সায়ন্তনীর ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত। প্রয়োজনে তাদের রাণীর জন্য, তাদের রাজ্য সায়ন্তনীগরের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

এভাবে রাজ্য গঠনের কাজ চলছে পুরোদমে। অপর দিকে বিধুকুমারের ধন ভাণ্ডার উপছে পড়ছে। কিন্তু মাত্র একটাতো বছর। এসে গেল সেই বৈশাখী পূর্ণিমা। না, এবার ঘোড়ায় চেপে নয়। একে বারে একটা হাতির পিঠে চেপে লোক লস্কর পাইক বরকন্দাজ নিয়ে রাজসভায় এসে হাজির হল বিধুকুমার।

ছয়

এবার আর চিনতে ভুল হয় নি। বিধুকে সাদরে জড়িয়ে ধরলেন রাজা। বললেন — আমি হেরে গেছি বিধু। প্রথম দিন তোমার সুন্দর মুখ দেখে ভুলে ছিলাম আজ তোমার বুদ্ধি আর সাহস দেখে অবাক হলাম। তোমার বুদ্ধি আছে, মহৎ উদ্দেশ্য আছে, বৃহৎ লক্ষ্যও আছে কিন্তু ঐ উৎকোচ গ্রহণ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। চাঁদের যেমন কলঙ্ক আছে, সূর্যকে যেমন রাহু গ্রাস করে, তেমনি তোমাকে উৎকোচ গ্রহণের শাস্তি পেতেই হবে।

মন্ত্রী উৎসাহ পেয়ে লম্ফদিয়ে, দম্ভ দেখিয়ে গর্জন করে বললেন--মহারাজ, ওকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন। আর ঐ, ওর তৈরী করা রাজ্য আপনার রাজ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

বিধু বিনয়ের সঙ্গে বল--মহারাজ বিচক্ষণ। তিনি যে শাস্তি দেবেন শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি তা মেনে নিতে পারি। কিন্তু মন্ত্রী মশায়, আজ আপনারা চেষ্টা করলেও আমাকে কোনো শাস্তি দিতে পারবেন না। কারণ আমার সামান্য কিছু প্রজা যারা এক সঙ্গে আমার বন্ধুও, তারা আমার কোন শাস্তি মেনে নেবে না। আমার সৈন্যরা, যারা আমার কেবল মাইনে করা ভৃত্য নয়, তারা আমার বন্ধু, আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারা আপনার বেতনভুক সেপাইদের পলকে হটিয়ে দেবে। হয়তো আপনি নিজেই রাজ্য হারাবেন। সুতরাং ...।

বিতর্ক বেশি দূর গড়াতে না দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে রাজা বললেন — ভয় পেয়োনা বিধু, শাস্তি এবং পুরস্কার তুমি পাশাপাশি পাবে। আমি নিজে তোমার সায়ন্তনী নগরে গিয়ে তোমাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করব। এটাই হবে তোমার পুরস্কার। আমি চর মারফৎ সংবাদ পেয়েছি, সায়ন্তনী পুত্র লাভ করেছে। আমি সেখানে গিয়ে তার এমন নাম করণ করব যাতে তোমার কুকীর্তি কাহিনী বহু দিন মানুষ মনে রাখে।

বিধু কুমার অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে সাথে সাথে বললে -- মহারাজ, আমি আপনার পুত্র তুল্য। সুতরাং আমার পুত্র, আপনার পৌত্র। আপনি আপনার নাতির নাম কি রাখবেন সেটা আপনার অধিকারের মধ্যে পড়ে। এ বিষয় আপনি যা চাইবেন আমি তাই মাথা পেতে মেনে নেব।

সাত

রাজা বিধুকুমার এবং সায়ন্তনীর অভিষেকের দিন ধার্য করলেন। অনেক রাজা, অভিজাত, বণিক, সওদাগর উপস্থিত হলেন। বেদ পাঠ আর মন্ত্র উচ্চারণ করে রাজমুকুট বিধুকুমার ও সায়ন্তনীর মাথায় পরিয়ে দিলেন বৃদ্ধ রাজা। তারপর বললেন—বিধু আর সায়ন্তনীর পুত্রের আমি নাম করণ করলাম "উৎকোচ কুমার"।

বিধু বুঝতে পেরেছে রাজা বিধুর কুকর্মের কথা চিরস্থায়ী করতে এভাবে নাম করণ করলেন। জনমানসে যাতে এর কোন প্রতিক্রিয়া না হয় তাই সদ্য রাজ মুকুট-পরা বিধু বলল -- মহারাজ আমার পিতৃতুল্য। তিনি আমার পুত্রের ব্যঙ্গাত্মক নাম রেখেছেন। তাঁর এই নাম করণের জন্য তাঁকে একটি নাতি উৎকোচ হিসাবে দেব, যাতে সে মহারাজের গোঁফ ধরে টানতে পারে।

সভায় হাসির রোল উঠল। বিধু দাসীর হাত থেকে নিজের ছেলেকে নিয়ে রাজার হাতে তুলে দিলে সভায় সাধু বাদ উঠল। নিঃসন্তান রাজা নাতিকে কোলে পেয়ে চোখের জল সামলাতে পারলেন না। তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন -- আমি নিঃসন্তান, আজ থেকে আমি সায়ন্তনীকে কন্যা রূপে গ্রহণ করলাম। আর আমার মৃত্যুর পর এই উৎকোচ কুমারই হবে আমার রাজ্যের রাজা।

অনেক দিন রাজার রাজ্যে কোন ব্যক্তিগত উৎসব হয় নি। সুতরাং বিধুকুমারের অভিষেক এবং উৎকোচ কুমারের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে দুই রাজ্যে মহা ধুম ধাম শুরু হল। উৎকোচ কুমারের মুখেভাতের উপহার হিসাবে রাজ্যের প্রজাদের এক বছরের রাজকর মকুব করে দেওয়া হল। সাত দিন ব্যাপি উৎসব অনুষ্ঠান খাওয়া দাওয়ায় মানুষের সব দুঃখ বেদনা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য অপসারিত হল।

এরপর মূলতঃ দু'টি রাজ্য একসাথে মিশে গেল। বিধুকুমার যুবরাজের মত মর্যাদা পেল। লোকে বলতে শুরু করল বড় রাজা আর ছোট রাজা।

লোহার আংটি

নানান গাছ পালা দিয়ে ঘেরা প্রত্যন্ত গ্রাম। শাল, পিয়াল, বট, পাকুড়, আমলকি, আম, জাম, দেবদারু, বোরকুল, টোবাকুল আরো কত কি। কেউবা সব সময় সবুজ হয়ে আছে। আবার কেউবা শীতের শুরু থেকে পাতা খসাতে শুরু করে। বসন্ত গড়িয়ে গ্রীষ্ম আসে। সাথে সাথে অশোকে পলাশে কৃষ্ণচুড়ায় গ্রামের আকাশ লালে লাল হয়ে যায়। আর রাধাচুড়া, চাকুন্দ, মুকুন্দ তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটিয়ে হলুদে মক্‌মক্ করতে থাকে। তবে চির দিন লালের কদরটা বেশি। কিন্তু সাথে সাথে মল্লিকা, গন্ধরাজও কম যায় না। বর্ষার কদম কেশর শরতের শিউলি অপরাজিতা টগর বেল জুঁই মাধবী মালতী। শীতের গাঁদা দোপাটি, গ্রামতো নয় যেন ফুলের রঙে আল্‌পনা আঁকা একটা ক্যানভাস।

গ্রাম ঘিরে আছে ছোট সরু খাল। মাঝে মধ্যে ছোট বড় পুকুর ডোবা। গ্রীষ্মের আগে কোনটি বা শুকিয়ে যায়। কোনটাতেবা হাঁটু জল। কোনটাতে বেশ ভরা জল থাকে, গাঁয়ের বধুরা স্নান করে, পানের জল নিয়ে যায়। শীতে কচুরীপানার ফুল ফোটে, অদ্ভুত লাগে। কচুরীপানা অস্বাস্থ্যকর বটে কিন্তু তার ফুলের বাহার আছে। নীল হলুদ বেগ্‌নীর বাহার দিয়ে গ্রামটাকে সাজিয়ে দেয়। তাই বুঝি গ্রামের নাম কচুরীবাগ।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামের শোভায় যেমন পরিবর্তন আসে, তেমনি পালা করে আসে ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডাইরিয়া, বসন্ত, কালাজ্বর, পালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর। গ্রামের লড়াকু মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে চলে। হার মানে না, হার মানে নি। স্বজন হারায়, পঙ্গু হয়, অকাল বার্ধক্য আসে। তবু পরাভব নেই। চৈত্রের ঝড়ে চালা ঘর উড়ে যায়, আষাঢ়ে অনাবৃষ্টিতে অজন্মা হয়। আশ্বিনে অসময়ের ঝড়ে নদীর জলে বন্যা আসে, ভেসে যায় মাঠ ভর্তি ফসল। তবু কষ্টেশিষ্টে দুঃখে-সুখে দিন কেটে যায়।

নীতীশের বয়স যখন মাত্র এগার কি বার বছর তখন তার বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় নীতীশের মা বললেন--ছেলেটাকে একে বারে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে?

স্ত্রীর হাতটা ধরার চেষ্টা করে নীতীশের বাবা মৃদু স্বরে বললেন--তুলসী তলার নীচে .....।

কথাটা শেষ করতে পারলেন না। তিনি চলে গেলেন। নিতীশের মা যৎসামান্য আয়োজন করে স্বামীর অন্ত্যেষ্টি সারলেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সংসারে অনটন দেখা দিল। গ্রামের মানুষের সঙ্গে নীতীশের বাবার কোন বিবাদ বিসংবাদ ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন ঘনিষ্টতা বা মেলামেশাও তেমন ছিল না। কেবল পরিচিতি, মুখ চেনা। আসলে ভদ্রলোক মিশুকে ছিলেন না। গ্রামের কোন লোককে তাঁর প্রয়োজন ছিল না আবার তাঁকেও কারো কোন প্রয়োজন ছিল না। এদিকে, কি করে যে সংসার চলত কেবল তিনি ছাড়া আর কেউ জানত না। অথচ সংসারে কোন দিন কোন অভাব অনটন ছিল না।

গ্রামের মানুষ খুব একটা নীতীশের বাড়ির খবর রাখে না। তবু পিতৃবিয়োগের পর কেউ কখনো দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে, কেউবা দুটো উপদেশ দেয়। নীতীশ পাড়ার শীতলা তলার অঙ্গনে সকালে দুপুরে খেলা করতে আসে। পাঠশালায় পড়তে আসে। তার গায়ে যে তেমন বিশাল জোর আছে তা নয়, তবু বুদ্ধির জোরে সে সকলকে হারিয়ে দেয়। গৌর বর্ণ সুঠাম চেহারা। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে কলির কানাই। কেষ্ট যাত্রায় কৃষ্ণ হলে ভালই মানতো। কোনো বন্ধু আবার বলে, গায়ের যা রঙ, রাধা সাজলে বেশ মানায়।

পাঠশালা যাওয়া বন্ধ হল নীতীশের। গুরুমশায়ের দক্ষিণা বাকি পড়েছে। প্রণামী সিধে দিতে পারে না। নীতীশের মা তাই নীতীশকে বললেন বাছা, তোর বাবা মরার আগে তুলসী তলার কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারে নি। আমিতো সবসময় নজর রাখি কৈ কিছুতো দেখতে পাই না। এক দিন ওটা খুঁড়ে দেখলে হয়।

নীতীশ বলল—বাবা রোজ দু' বেলা গাছে জল দিতেন, মন্ত্র পড়তেন, ভক্তি করে প্রণাম করতেন। কিন্তু কোন দিন তো মাটি খুঁড়তে দেখিনি।

মা বললেন—সে যাই হোক একদিন রাতে তুলসী তলাটা খুঁড়ে দেখতে হবে। তুই পারবি?

নীতীশ বলল—তা খুব পারব। কিন্তু অত রাতে তুলসী তালায় আলো জ্বললে লোকে সন্দেহ করবে। কানা কানি জানা জানি হবে।

মা বললেন—কৃষ্ণ পক্ষে যখন পঞ্চমীর চাঁদ উঠবে তখন অনেক রাত। আর ম্লান চাঁদের আলোতে আমরা মাটি খুঁড়তে থাকব। কেউ টের পাবে না।

সেই মতো শাবল কোদাল নিয়ে নীতীশ প্রস্তুত হল। গ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। পুবের আকাশে ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে লাগল্। প্যাঁচা, বাদুড়, চামচিকা, যে যার মত করে শিকার ধরতে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামপ্রান্তে শেয়ালের দল দ্বিতীয় বার খেয়াল গানের আসর শেষ করে আবার আহারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গা ছম্ ছম্ করা ম্লান জ্যোৎস্না রাতে নীতীশ আর তার মা তুলসী তলার মাটি কাটতে আরম্ভ করল। নীতীশ মাটি কেটে চুপড়ি করে মায়ের হাতে দেয় আর তার মা মাটিকে দূরে সরিয়ে ফেলে। অমনি করে অনেকটা নীচু পর্যন্ত কাটার পর ব্যর্থ হয়ে নীতীশের মা বললেন — দেখ্ বাছা, আর মাটি কেটে কাজ নেই। এদিকে রাতওতো শেষ হয়ে এল। শেষ প্রহরের শেয়াল ডেকে চলে গেছে - আর কষ্ট করে লাভ নেই। এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। তোর বাবা ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন তাই হয়তো তুলসি তলাটায় প্রদীপ দেবার কথা বলতে চাইছিলেন।

নীতীশ বলল — দেখ মা, বাবা বলতেন শাস্ত্রে আছে, কোন কাজ শুরু করলে তাকে শেষ করতে হয়। সে যাই হোক, আমি যখন শুরু করেছি তখন এত তাড়াতাড়ি পরাস্ত হব না। দেখাই যাক না। তুমি বরং একটু বিশ্রাম কর, আমি একা দেখছি।

সত্যই তো বয়স হয়েছে, তাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং একটু বসে বিশ্রাম করতে গেলেন। নীতীশ একাই মাটি কেটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। গভীরতা বেড়েছে সেও হাঁপিয়ে উঠেছে। তবু থামছেনা দেখে মা আবার এসে হাত লাগালেন। ভোরের শুক তারা পুব আকাশে অনেকটা উপরে উঠে গেল, এবার ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়বে। মা বললেন এবার থাম খোকা, আর না।

— একটা শিকল দেখা যাচ্ছে। এর শেষে হয়তো কিছু একটা আছে। আমাকে এর শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে।

মা বললেন— অনেক আগে থেকেই পাখ-পাখালি ডাকা ডাকি শুরু করে দিয়েছে। আজ আর নয়। আবার কাল রাতে।

সেই মত ঠিক হল। পাছে শিকলটা হারিয়ে যায়, তাই একটা খুঁটির সঙ্গে শিকলের প্রান্তটা বাঁধল নীতীশ। মা খড় এনে গর্তটা চাপা দিলেন যাতে কারো চোখে না পড়ে। নীতীশ স্নান করে বাড়ি গেল। দু'জন মিলে সারাদিন ঐ জায়গাটা নজরে নজরে রাখল।

পরদিন চাঁদ উঠল আর একটু দেরী করে। খড়ের আঁটি সরিয়ে গর্তে নামল নীতীশ কুমার। লোহার শেকল বরাবর খুঁড়তে লাগল। সামান্য পরে একটা পিঁজরা দেখতে পেল। আস্তে আস্তে মাটি সরিয়ে পিঞ্জরটা তুলে আনল নীতীশ। গর্তের বাইরে এসে দেখল পিঁজরার মধ্যে একটা ছোট মোরগ। অতি সাধারণ আর পাঁচটা মুরগী বাচ্চার মতো। খাঁচার মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।

মা তো হতাশ হয়ে পড়লেন। এত আশা করে এত খোঁড়া খুঁড়ির পর সামান্য একটা মোরগ। যা, কেটে নিয়ে আয়, রান্না করে দিই খাবি।

নীতীশ কুমার কিন্তু আশ্চর্য হল। ভাবল, এটা সামান্য মোরোগ নয়। তিন মানুষ গভীর মাটির নীচে জল নেই, হাওয়া নেই, দানা পানি পায়না, অথচ বেঁচে আছে কি করে? নিশ্চই এর মধ্যে কোন না কোন রহস্য আছে।

দূরে গঞ্জের হাট বসে। ব্যবসায়ী ব্যাপারী দেশ বিদেশ থেকে এসে জড় হয় সপ্তাহে একবার। নীতীশ ভাবল এক বার সে এই মোরগটার দাম যাচাই করবে। পূব আকাশে আলো ফোটার আগে বেরিয়ে পড়ল নীতীশ। সকাল হতেই পৌঁছে গেল গঞ্জের হাটে। তখনো বাজারে খুব বেশি লোক জড় হয়নি। দূর দূরান্তের নৌকো এসে ভিড়ছে ঘাটে। মাথা মুটে, ঝাঁকা মুটে, গরুর গাড়ি করে আসছে নানান জিনিস পত্র। গাধা ঘোড়া খচ্চরের পিঠে চেপে আসছে পাইকার, ব্যাপারীরা। সকলে যে যার মত ব্যস্ত। নীতীশ সেই হাটের এক পাশে খাঁচা সহ মোরোগ নিয়ে বসল। শক্ত করে নিজের হাতে শিকলটা ধরে রাখল যাতে, কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে।

ক্রেতা এল, দাম জিগ্‌গেস করল। নীতীশ জানাল এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা। দাম শুনে সকলের তাক্ লেগে গেল। লোকে তাকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগল। কেউ কেউ বলল—এক আনায় একটা গোটা বড় মোরোগ পাওয়া যায়, এতো একটু খানি। দু' পয়সা কি তিন পয়সা দাম হবে। নয় এক আনাই হল। তা বলে একে বারে এক হাজার মোহর। পিতৃ শোকে মাথাটা গেছে।

হ্যাঁ, মস্তিস্ক বিকৃতিই হয়েছে নীতীশের। তা নইলে একটা মোরগের দাম ... ? কিন্তু আসল রহস্যটা সে কাউকে বলেনি। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলে মা বললেন—হ্যাঁরে, তুই বলেছিস্ এই মোরগের আসল কথা। তা না হলে লোকে তোকে বেশি দাম দিয়ে কিনবে কেন?

নীতীশ বলল — মোরগের সত্যি যে কোন আলাদা মূল্য আছে তার প্রমাণতো আমরাও পাইনি। সুতরাং মিথ্যা কথা আমি লোককে বলব কেন? আর বললেইবা লোকে আমার কথা বিশ্বাস করবে কেন? তবু যদি কেউ বেশি দাম দিয়ে কিনতে চায় তা হলে বুঝতে হবে সত্যিই এর দাম আছে। এর মধ্যে কোন রহস্য আছে।

এমনি করে প্রতি সপ্তাহে হাটে যায় আর আগের দিনের চেয়ে এক শ স্বর্ণ মুদ্রা বেশি দাম হাঁকে। তাই এখন আর কেউ দাম জানতে চায়না। এভাবে আজকের হাটে তার মোরগের দাম দাঁড়িয়েছে দু'হাজার এক শ' স্বর্ণ মুদ্রা। এক জন মহাজন ব্যবসায়ী বিশাল নৌকা নিয়ে হাটে এলেন। বেশ সাজানো গুছানো সুন্দর ছাউনি। সাত দাঁড়ি মাঝি বিশাল রঙিন পাল। ঘাটে ভিড়তেই পাইকার, ফড়ে, দালাল যে যার নানা দ্রব্য সামগ্রীর কথা নূতন ব্যবসায়ীর কাছে জানাতে লাগল। নবাগত ব্যবসায়ী জানিয়ে দিলেন তিনি কোন কেনা-বেচা করবেন না। আজ শুধু বাজারটা দেখে যাবেন। পচ্ছন্দ হলে তিনি পরে কারবার করবেন। কেবল দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য তাঁর একটি মোরগের প্রয়োজন।

সওদাগর বণিক এগিয়ে চললেন। নূতন সওদাগরকে দেখে এক আনার মোরোগ কেউ দেড় আনা, দু'আনায় বেচতে পারবে ভেবে এগিয়ে এল। কিন্তু সওদাগর গিয়ে থামলেন নীতীশের কাছে। জানতে চাইলেন তার মোরগের দাম। নীতীশ বলল—দুই হাজার এক শত স্বর্ণ মুদ্রা।

সওদাগর বললেন - উত্তম। তোমার পিঞ্জরের দাম?

নীতীশ বলল - দুই হাজার এক শত রৌপ্য মুদ্রা।

সওদাগর যেন প্রস্তুত হয়েই এসে ছিলেন। তিনি সরাসরি দু'টি থলি বাহকের হাত থেকে নিয়ে নীতীশের হাতে দিয়ে বললেন — এখানে গুনে নেবে না বাড়ি গিয়ে গুনবে?

নীতীশ কিছুটা বিহ্বল হয়ে গেল। তার সারা শরীরটা কাঁপতে লাগল। মনে হল কোথায় কোন ভুল হয়ে যাচ্ছে। কোন অমূল্য সম্পদ সে সামান্য দামে দিয়ে দিচ্ছে। যাই হোক, এখন আর উপায় নেই। সে সওদাগরের কথার উত্তর দিতে পারলো না। তা দেখে সওদাগর বললেন — বাড়ি গিয়ে গুনে দেখ। যদি কম হয় তাহলে পরের হাটে চেয়ে নিও। আর যদি বেশি হয় তবে ফেরৎ দিও।

কিন্তু নীতীশ কথার কোন উত্তর না দিয়ে, টাকার থলি দুটো হাতে নিয়ে একটা ঘোড়া ভাড়া করল। তার পর দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করল নীতীশ। সওদাগর ভাবলেন, এত টাকা এক সাথে পেয়ে ছেলেটা হতবম্ব হয়ে বাড়ি পালিয়েছে।

নীতীশ বাড়ি গিয়ে মাকে বলল — মা, আমার মনে হয় মোরগটা একটা অমূল্য রত্ন। যে চিনতে পেরেছে সে বিনা বাক্য ব্যয়ে এত দাম দিয়ে অক্লেশে কিনে নিয়েছে। এই অর্থ দিয়ে তোমার আর আমার সারা জীবন চলে যাবে, আমি জানি। কিন্তু আমি এখনি সেই সওদাগরকে অনুসরণ করব। তুমি এই স্বর্ণ মুদ্রা আর রৌপ্য মুদ্রা সাবধানে কোথাও পুঁতে রাখ। প্রয়োজন মত খরচ কর। আমি রওনা হলাম।

মা আকুল হয়ে বললেন—বাছা আমার, যাচ্ছিস্ কোথায়? মহামূল্য মোরগ গেছে যাক্, কিন্তু তুইতো আমার অমূল্য ধন। তোকে আমি বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারব না।

নীতীশ মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে — আমায় যেতে দাও মা। বিপদের ঝুঁকি না নিলে কোন দিন কোন বড় কাজ হয় না। একথা ঠিক্, যে সওদাগর বিশাল মূল্য দিয়ে সামান্য মোরগ কিনেছে, সে নিশ্চই তার আসল মূল্য বুঝতে পেরেছে। এত বড় সম্পদ সে হাত ছাড়া করবে না। আবার সেই মোরগ কি কাজে লাগে সেটাও আমার জানা নেই। সুতরাং আমাকে গোপনে তাকে অনুসরণ করে আসল রহস্যটা বুঝতে হবে।

মা নীতীশকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু সিক্ত নয়নে বললেন — যে কজে তুই যাচ্ছিস্ যা, আমি তোকে বাধা দেব না। কিন্তু সাবধান, এ কাজে ঝুঁকি আছে, প্রাণের ভয় আছে। যে লোক এত জানে, সে খুব শক্ত মানুষ। খুব সাবধানে পথ চলবি। চারিদিকে নজর রাখবি।

ঘোড়া ছুটে চলল। নীতীশ হাটে না গিয়ে, হাট থেকে বেশ কিছুটা আগে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। ঘোড়ার মালিক ঘোড়া নিয়ে চলে গেল। নীতীশ নদীর ধারে ধারে পথ ধরে এগিয়ে চলল যে দিকে সওদাগরের নৌকা বাঁধা আছে। মাঝিদের কাছে গিয়ে বলল — ভাই, আমি বড়ই গরীব। খেতে পাই না। তোমরা যদি আমাকে সাথে নাও আর দু'টো খেতে দাও তাহলে আমি বিনা মজুরীতে দাঁড় টানব, গুন টানব আর যা যা বলবে তাই তাই করব। কিন্তু তোমাদের বাবুকে বোলো না। বড়লোক দেখলে আমার বড্ড ভয় হয়।

কৌতূহলি মাঝি মল্লারা জানতে চাইল — বড়লোক দেখলে ভয় হয় কেন?

নীতীশ বলল, এক সময় আমি এক ধনী জমিদারের বাড়িতে হুঁকো বাহকের কাজ নিয়ে ছিলাম। হুজুর যেখানে যাবেন তাঁর পিছনে তাঁর হুঁকাটি বয়ে নিয়ে যেতে হবে। এক দিন মনে হল শুধুই বয়ে বেড়ানো যায়, মাঝে মধ্যে এক আধবার টান দিলে কেমন হয়। তাই বাবু যখন সামনের দিকে হেঁটে চলেছেন, আর বয়স্য বিদুষকের সঙ্গে মধুর বাক্যালাপে জমে আছেন তখন আমি আলতো করে নলটাতে এক টান দিলাম। ভূ...রূ..রু..ররররররররর করে একটা শব্দ হল। জমিদারের হুঁস নেই। তিনি এগিয়ে চলেছেন। তার পর আবার একটান। তার পর আবার ভূরররররররর...। ব্যস, পেট থেকে ঠেলে বেরুল কাশি। খক্... খক্ .. ক্ষক্ষ..ক্ষ।

জমিদার বাবুর কথার মধ্যে বাধা পড়ল। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। গড়গড়া টানার কথাটা জানতে পরেন নি বটে কিন্তু তাঁর বিনা অনুমতিতে কাশবার সাহস আমাকে কে দিল? তিনিতো আমাকে কাশির অনুমতি দেননি। এবার তবেরে বলে হাতের ছড়িটা উঁচিয়ে যে...ই আমার বাম কাঁধে বসিয়ে দিয়েছেন অমনি ডান হাতের হুঁকো থেকে কলকে গেল ছিটকে, লাগল হুজুরের নাকে। গনগনে টিকিয়ার ছ্যাঁকা খেয়ে বাবুর নাকটা গেল ঝলসে।

বাবু তেলে বেগুনে ক্ষেপে উঠলেন। এবার চলল চাবুক। আমার টিকি ধরে চাবকাতে লাগলেন। কিন্তু আমার চুল তেলে চপচপ করছে। বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেন নি। হাত ফস্কে সুরুৎ করে সটান পিঠ্‌টান দিলাম। প্রাণ পণে ছুটতে আরম্ভ করলাম। সে যাত্রা কোনক্রমে রক্ষা পেলাম বটে, আর কোনো দিন ও মুখো হইনি। সেই থেকে আমি ধনী জমিদার সওদাগরের ধার পাশ মাড়াই না।

গল্প শুনে মাঝি মল্লারা হো হো করে হাসতে লাগল। ভাবল বোকা-সোকা ছোকরা। দু'টো খেতে দিলে যদি দাঁড় বায়, গুন টানে, ফাই ফরমাস্ খাটে তাহলে মন্দ কি? রাজি

হয়ে গেল মাঝির দল। সওদাগর তখনো নৌকায় ফেরেন নি। নীতীশ সহজে মিশে গেল মাঝি মল্লাদের সাথে। নীতীশের সহজ সরল কিশোর সুলভ স্বভাব তাদের আহ্লাদিত করল।

সওদাগর মোরগের পিঞ্জর হাতে নিয়ে ফিরে এলেন। এই মোরগটি ছাড়া আর কোন সওদা করেননি তিনি। সন্ধ্যার পর চাঁদের রাতে শরতের মৃদু বাতাসে নৌকা ছেড়ে দিল। গ্রাম গঞ্জ ছাড়িয়ে স্রোতের টানে নৌকা চলল তরতরিয়ে। নীতীশ দাঁড় বাইল খুব জোরে। এক দিকে তিন জন আর অপর দিকে একা নীতীশ। ছোকরা খাটিয়ে আছে।

নিশুতি রাত। চাঁদের আলো পশ্চিমাকাশে ম্লান হয়ে এসেছে। ভোরের আলো ফুটতে তখনো বাকি। অরণ্যে পাখি জাগেনি। এদিক ওদিক নিশাচর বন্য প্রাণীরা ঘোরা ফেরা করছে। নদীর কিনারে গভীর অরণ্যে নৌকা থামল। দাঁড়ের শব্দ বন্ধ হল। মাঝিরা পাল নামিয়ে আনল। পরিচারক ছাড়া একা নামলেন সওদাগর। মোরগের পিঁজরা হাতে নিলেন। শ্বাপদ সঙ্কুল ঘন বন, মাঝিরা নামতে সাহস করে না। নামল নীতীশ। মাঝিরা বাধা দিল। বলল এখুনি শিয়ালে খেয়ে ফেলবে। নীতীশ বাধা মানল না। 'এক্ষুনি আসছি' বলে দ্রুত চলে গেল।

সওদাগরকে অনুসরণ করতে করতে চলল নীতীশ কুমার, অলক্ষ্যে অতি সন্তর্পনে। কিছু ক্ষণ পর ধীরে ধীরে ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠল। অন্ধকার পাতলা হয়ে এলো। গাছের ডালে একটি দুটি পাখি ডাকতে শুরু করে দিল। বন্য প্রাণীরা গভীর জঙ্গলের অন্তরালে আশ্রয় নিল। প্যাঁচা বাদুড় যে যার মত নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। অরণ্য আরো গভীর। এগিয়ে চলছে সওদাগর, এগিয়ে চলছে নীতীশ কুমার।

অস্পষ্ট পায়ে মাড়ানো সরু পথ এসে শেষ হল একটা প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদে। গভীর অরণ্যে প্রাসাদ! অবাক হল নীতীশ। জানালা দরজা অধিকাংশই ভাঙা। দু' একটা বট অশ্বত্থ গজিয়ে উঠেছে প্রাচীরে ও দেওয়ালে। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন সওদাগর। আড়ালে আত্মগোপন করল নীতীশ।

রৌদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ল অরণ্যময়। সওদাগর ভিতরে গিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করল। নাম মাত্র গৈরীক বসন। হাতে ত্রিশুল। মাথায় জটা, কি ভীষণ চেহারা! দূর থেকে লক্ষ্য করছে নীতীশ। সুন্দর চুল হঠাৎ জটায় ভরে গেল! কি অদ্ভুত। বিস্ময়ে বিহ্বল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল সে। বিপদের আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু পালানোর উপায় নেই। অরণ্যে জন্তু জানোয়ার আর ভগ্ন প্রাসাদে সওদাগর সন্ন্যাসী। কে বেশি ভয়ঙ্কর তা নিয়ে মনে মনে গবেষনা করতে লাগল নীতীশ। দেখতে দেখতে সন্ন্যাসী বাইরে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু খাঁচাটা তাঁর হাতে নেই। হয় তো এই প্রাসাদে কোথাও লুকিয়ে রেখে গেছেন।

সন্ন্যাসী দূরে চলে গেলে সাহসে ভর করে নীতীশ এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আলো আঁধারী অপরিচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে চক্ চক্ করছে দু'টি বিশাল বপু। দু'টি বিশালাকৃতি বাঘ শুয়ে আছে, মুখো মুখি ভাবে আলস্য ভরে। আর তাদের মাঝ খানে বসানো আছে সেই খাঁচা সহ মোরগ। নীতীশ বুঝতে পারল বাঘ দু'টোকে পাহারায় রেখে সন্ন্যাসী চলে

গেছেন, হয়তো অনেক দূরে অন্য কোন উদ্দেশ্যে। বুঝতে বাকি রইলনা যে এই ব্যক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এখানে এসে সে ভাল করে নি। তবু যখন আসতে একবার পেরেছে এর শেষ দেখে ছাড়বে। শেষ পরিণতিতে মৃত্যু হতে পারে তার, এর বেশিতো কিছু নয়? একটা প্রাণতো একবার মরার জন্য।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যে পথ ধরে সন্ন্যাসী গিয়েছেন সেই পথকে নজরে রেখে অরণ্যের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগল নীতীশ কুমার। এগিয়ে চলল জীবনের মায়া ছেড়ে। সন্ন্যাসী কোথায় কি করছেন তার খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন।

একটি অতি পুরাতন মন্দির। একটি মাত্র জরাজীর্ণ জানালা, কাঁটা ঝোঁপে ভর্তি। কিন্তু আঙিনা পরিচ্ছন্ন। মানুষের যাতায়াত আছে। এগিয়ে চলল সে। মন্দিরের সামনে সেই অলৌকিক দৃশ্য। দু'টো বিশালকায় শার্দুল আলস্য ভরে শুয়ে আছে। সূর্যের কিরণ এসে পড়েছে তাদের গায়ে। রোদ এড়াতে চোখ দুটো বন্ধ। বিপদ বুঝে মাকে স্মরণ করল নীতীশ। যখন সে বিপদে পড়ে, তখনি সে মায়ের কথা মনে করে। মনে হল ছল্ ছল্ চোখে মা বলছেন — এগিয়ে যা খোকা, সাবধানে এগিয়ে যা। জয় তোর হবেই। সাহস ছাড়া জয় আসে না। সাহসের সঙ্গে চাই উপস্থিত বুদ্ধি।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে মায়ের সঙ্কেত অনুধাবন করল নীতীশ। তার পর ধীরে ধীরে মন্দিরের পিছন দিয়ে কাঁটা ঝোপ ঝাড় অতিক্রম করে জানালা বেয়ে উপরে উঠল। দেখল একটি কালী মূর্তি। তার সামনে চোখ বন্ধ করে বসে আছে কাপালিক বেশে, সেই সন্ন্যাসী সওদাগর। কি ভীষণ এই মানুষটা, বাঘকে বশ মানায়। শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে কোন ভয় ডর নেই তার। অথচ লোকালয়ে তার অবাধ গতি বিধি। সেখানে কে বুঝবে যে সেই মানুষ এই কাপালিক। ভক্তি করে মা কালীকে প্রণাম করল নীতীশ। সাহস শক্তি আর বুদ্ধি প্রার্থনা করল।

মনে মনে ভাবল আজ বোধ হয় এই সন্ন্যাসীর সিদ্ধিলাভ হবে। শুনেছে অমাবস্যা রাতে কাপালিকরা কালী পূজা করে। কিন্তু আজতো পূর্ণিমা, আবার দিনের বেলা। কোন বলি দানের ব্যবস্থাতো দেখতে পাচ্ছে না। তবে? তবুও আজ তার সিদ্ধিলাভের দিন। কে যেন নীতীশকে মনে করিয়ে দিল -- সন্ন্যাসী সিদ্ধ হলে তোর মনের আশা পূর্ণ হবে না। তুই এই পূজা পণ্ড কর। নইলে তোর সর্বনাশ সুনিশ্চিত।

সাহসে ভর করে এক পা এক পা করে এগিয়ে বিগ্রহের পিছনে এসে দাঁড়াল। কি করবে? কি করতে পারে? ধ্যান মগ্ন সন্ন্যাসী। চিন্তামগ্ন নীতীশ। শিশু সুলভ চপল দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় খেলে গেল তার। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বিগ্রহকে আঘাত করল। ঠেলা খেয়ে, কালী মূর্তি ছিটকে এসে পড়ল সন্ন্যাসীর উপর। সন্ন্যাসী জ্ঞান হারাল, পাষান প্রতিমা প্রচণ্ড আঘাতে তিন খান হয়ে ভেঙে গেল। হুঙ্কার দিয়ে গর্জে উঠল বাঘ দু'টো। ভয়ে ত্রাসে নীতীশের শরীর কাঁপতে লাগল। মূহুর্তের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সে শুনতে পেল হয়তো বা অনুভব করল কে যেন বলছে -- তুই আমাকে মুক্তি দিলি বাছা, আমি এই পাপিষ্ঠের কাছে বন্দী ছিলাম। তোর মঙ্গল হবে। তুই জয়ী হবি। সততা আর সাহস তোকে জয়ের পথে নিয়ে যাবে।

এক দিকে পাষানের আঘাতে মূর্ছিত সন্ন্যাসী অপর দিকে জাগ্রত ভয়ঙ্কর বাঘ। নীতীশ ক্ষিপ্র গতিতে বাহিরে এসে দূরে দাঁড়িয়ে দেখল বাঘ দু'টো মুক্তির আনন্দে রজকীয় মন্থর গতিতে গভীর অরণ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এত ক্ষণ কে যেন এদের বেঁধে রেখে ছিল। ছাড়া পেয়ে যেন স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পেল।

দুই

এর পর সেই প্রাসাদে আবার ফিরে এল নীতীশ। বাঘ দুটো তেমনি শুয়ে আছে। রয়েছে মোরগটাও। পাহারায় রইল নীতীশ। এদিক ওদিক সন্তর্পণে লক্ষ্য করতে লাগল। সন্ন্যাসীতো মরে নি, সে অবশ্যই এক সময় ফিরে আসবে।

সত্যি সত্যি ফিরে এল সন্ন্যাসী। তখন সন্ধে। তার ডান হাত, ডান পা ভেঙে গেছে। কোমরে জোর আঘাত পেয়ে সোজা হয়ে হাঁটতেও পারছে না। গাছের ডালকে লাঠি করে অতি কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রাসাদে ফিরেছে। সাধনা তার সফল হয়নি। ব্যর্থতায় সে যেন আজ আরো হিংস্র, আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে। ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের কাছে হতাশা বয়ে আনলেও শয়তানের কছে সে আরও দৃঢ়তা এনেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে চাঁদের আলো ছড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু নিবিড় অরণ্য ভেদ করে সেই আলো মাটিতে পড়তে পারছে না। আর প্রাসাদের ভিতরটাতো নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। তারই মাঝখানে সন্ন্যাসী একটা হিংস্র পশুর মত এগিয়ে চলেছে। আগের সেই সৌম্য চেহারা আর তার নেই। অদ্ভুত রকমের একটা পরিবর্তন হয়েছে। সন্ন্যাসী তিন বার তালি দিল। বাঘ দু'টো উঠে আস্তে আস্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। খাঁচা থেকে মোরগটাকে বার করে সন্ন্যাসী ডাকল - ভয়ঙ্কর।

মোরগ সাড়া দিল - হুজুর।

-- তুমি আমার আজ্ঞাবহ হবে?

ভয়ঙ্কর - আমি তার আজ্ঞাবহ হব যে আমায় মুক্তি দেবে।

— তোমার মুক্তির উপায়?

ভয়ঙ্কর -- সেটা আমার বলা বারন। সেটা জানতে সিদ্ধিলাভ চাই। হতে হবে নিস্পাপ আর সরল মনের।

সন্ন্যাসী -- হয় তুমি আমায় বলে দাও কি হলে তুমি আমার আজ্ঞাবহ হবে নয়তো আমি তোমার চরম শাস্তির ব্যবস্থা করব।

এবার ভয়ঙ্কর কোন উত্তর দিল না। সন্ন্যাসী মোরগ নিয়ে এগিয়ে চলল। একটি বিশাল কক্ষ। দ্বার বন্ধ ছিল। সন্ন্যাসী ডাকল 'কবন্ধ, দরজা খোল'। দরজা খুলে গেল। নীতীশ দেখল একটা মুণ্ড হীন দেহ দরজা খুলে দূরে সরে চলে গেল।

-- কবন্ধ, পুরী আলোকিত কর।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কক্ষে একটি পাষাণ খোলক সরে গেল। সেই পাথরের পেঁটরার মধ্যে একটি মূল্যবান পাথর। তারই ছটায় মৃদু আলো ঘর ময় ছড়িয়ে পড়ল। অর্ধপাষাণ মূর্তিগুলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অদ্ভুত দৃশ্য দেখে নীতীশের তো আতঙ্কে প্রাণ

কেঁদে উঠল। ভাবল এ কি নরকের রাজা, না শয়তানের শিরোমণি। শয়তানও তো এমন নিষ্ঠুর হতে পারে না। অথচ এহেন নরাধম অসীম শক্তির অধিকারী হল কি করে? ভয়ে তার গলা শুকিয়ে এল। বিপদের সময় সে আবার তার মায়ের মুখ স্মরণ করল।

সন্ন্যাসী বলল — তাকিয়ে দেখ ভয়ঙ্কর, ইনি অম্বর পুরীর রাজা, সিদ্ধ পুরুষ। আমার কথার অবাধ্য হতে এর শিরচ্ছেদ করেছি আমি। এই দেখ তারই ছিন্ন মুণ্ড ঝুলছে। সিদ্ধ পুরুষের অকাল মৃত্যু হয় না, তাই তিনি তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবেন। আর এই যে অর্ধপাষাণ মূর্তি সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এরা সবাই কোন না কোন দেশের রাজা অথবা গণ্য মান্য ধনী ব্যক্তি। এরা সকলে আমার কথার অবাধ্য হয়েছিল। তাই আমি এদের অর্ধেক শরীরকে পাষাণ করে রেখেছি। বাকি অর্ধেক শরীরের উপর চাবুক মেরে আমি আমার খেয়াল চরিতার্থ করি। ভয়ঙ্কর তুমি আমার কথামত আমার আজ্ঞাবহ না হলে, আমি তোমাকে তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করব।

মোরগ উত্তর দিল - সে তোমার অভিরুচি।

অর্ধপাষাণ মানুষগুলি ভয়ে কাঁদতে লাগলো।

সন্ন্যাসী বলল — কান্না থামাও, আজ তোমাদের আমি চাবুক মারব না। আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। চাবুক ধরার ক্ষমতা নেই। উরু এবং কটি দেশ চুর্ণ হয়েছে। পাষাণী দেবীর পূজা আমি সারা জীবন করে এসেছি। অথচ আজ সে আমার উপর ঝাঁপ দিয়েছে। নিজেও তিন টুকরো হয়েছে ভেঙে গেছে। আজ আমি ভয়ঙ্করকে তপ্ত তৈলে ডোবাব। দেখি, সে আমার বশ মানে কিনা। তার পর সেই উষ্ণ তেল তোমাদের শরীরে ছিটিয়ে মজা দেখব। তোমাদের যন্ত্রণা আমাকে যে আনন্দ দেবে তাতে আমি নিজে সেরে উঠব।

অর্ধপাষাণগুলি আবার একবার সমস্বরে আর্ত চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

সন্ন্যাসীর নির্দেশে বিশাল এক লৌহ কড়াইতে তেল ভর্তি করল কবন্ধ। তারপর সেটাকে তদনুযায়ী এক চুল্লিতে চাপিয়ে বড় বড় কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতেই কিছু ক্ষণের মধ্যে টগ্ বগ্ করে তেল ফুটতে লাগল। সেই তপ্ত তেলে মোরগটাকে ডুবিয়ে দিল সন্ন্যাসী। নীতীশ ভাবল 'মোরগ তো কোনো শব্দ করল না, ছট্ফট্ও করল না। হয়তো মরে গেল। কিন্তু যে প্রাণী মাটির নীচে মরে নি, সে এত সহজে মরবে না। কি নিষ্ঠুর এই লোকটা'। লাঠির উপর ভর করে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সবকিছু দেখছিল নীতীশ। সন্ন্যাসী অনেক দূরে চলে গেলে নীতীশ ডাকল — কবন্ধ, দরজা খোল।

দরজা খুলে গেল। নীতীশ ফুটন্ত তেলের কাছে এসে দেখল, পাশে একটা বিশাল লোহার খুনতি রাখা আছে। সেই খুনতি দিয়ে মোরগটাকে তোলার চেষ্টা করল নীতীশ। কিন্তু কোথায় মোরগ? উঠে এল একটা লোহার আংটি। আংটি হাতে নিতেই বলে উঠল —আমি ভয়ঙ্কর। তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। আমি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে রইব। যখন তুমি যাই চাইবে তাই পাবে। কিন্তু মনে রেখো তুমি সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করনি। তাই যখন আমি যার হাতে থাকব তখন তার কথামত কাজ করব। সাবধান, আমায় কখনো হাত ছাড়া করো না।

নীতীশ বলল — ভয়ঙ্কর, এই অর্ধ-পাষাণ মানুষগুলোকে মুক্ত করা যাবে?

ভয়ঙ্কর বলল — না, এদের মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সেই সন্ন্যাসী।

অর্ধ-পাষাণেরা কাতর সুরে বলল — তাহলে তোমরা আমাদের পুরোপুরি পাষাণ করে দাও যাতে ঐ নিষ্ঠুর লোকটা আমাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে।

নীতীশ বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। অনেক রাতে সন্ন্যাসী ফিরে এল। কবন্ধ আগের মত দ্বার খুলে দিল। সন্ন্যাসী প্রবেশ করলে পুনরায় দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। নীতীশ ডাকল — ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর—হুজুর।

নীতীশ—সন্ন্যাসীকে পাষান করে দিতে পারবে?

ভয়ঙ্কর—সন্ন্যাসী বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। ওর অনেক ক্ষমতা। তাকে পাষান করে দেবার মত সাধনা তোমার নেই। সাধনার সাহায্যে শক্তি অর্জন করতে পারলে তবেই তোমার আদেশে আমি সন্ন্যাসীকে পাষাণ করে দিতে পারব।

নীতীশ বলল — তাহলে কবন্ধ সহ অর্ধ-পাষাণদের তুমি সম্পূর্ণ পাষাণ করে দাও। কবন্ধ পাষাণ হয়ে গেলে দরজা খোলার কেউ থাকবে না। তাহলে দ্বার খুলে সন্ন্যাসী সহজে বাহিরে আসতে পারবে না। তারপর আমাকে একটি সুরম্য দেশ নিয়ে চলে যাও। এখান থেকে সহস্র মাইল দূরে।

তিন

মুহূর্তে নীতীশ দেখল সে এক রাজ প্রাসাদের নিকটে একটি বিশাল ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে সজলা নদী, প্রশস্থ রাজ পথ। ছবির মত সাজানো ঘর বাড়ি, লোকালয়। নীতীশ চারি দিক ভালো করে দেখল। তার পর এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে নদীতে নেমে স্নান করল। দু'দিনের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে গেল। ঘাটে এসে বসল নীতীশ। মনে মনে ভাবল — এখানে অদ্ভুত কিছু করা যাক্।

ভয়ঙ্করকে ডেকে জানতে পারল এই রাজ্যের নাম রম্যপুর। রাজা অতি সৌখিন ব্যক্তি, রাজ্যে কোন অভাব বা অশান্তি নেই। সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি ঘর, পথ ঘাট। নীতীশ ভয়ঙ্করকে নির্দেশ দিল —এখানে এই রাতের মধ্যে একটা প্রাসাদ গড়ে দাও। আর দাস দাসী, লোক লস্কর, হাতি ঘোড়া যেখানে যা দরকার সব মোতায়েন করে দাও। ঘরের মধ্যে সব রকম সৌখিন আসবাব পত্রের ব্যবস্থা কর। রাজ বাড়িতে যেমনটি আছে তার চেয়ে অনেক সুন্দর করে করবে, যাতে সকালে উঠে রাজ্যের মানুষের তাক্ লেগে যায়। বাড়িটা বানাবে ঠিক রাজপ্রাসাদের মত করে যাতে লোকের ভুল হয় চিনতে।

সত্যি অবাক কাণ্ড। পাশাপাশি দুটো রাজপ্রাসাদ। রাজ্যের মানুষের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। মন্ত্রী সান্ত্রী, কটোয়াল রখোওয়াল, সেনাপতি অধিপতি, সবাই ছুটো ছুটি আরম্ভ করে দিল। রাজপ্রাসাদের সবাই কৌতূহলি হয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। মহারাজের ঘুম ভাঙিয়ে দাসী সংবাদ দিল। রাণী ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের বেলকনি থেকে নূতন প্রাসাদের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন। নূতন প্রাসাদে এক 'নওলকিশোর' অতি

উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে আরাম কেদারায় অর্ধ-নিমিলিত চোখে প্রভাতি আলিস্যি কাটাচ্ছে। দু'জন দাসী মণি মুক্তা খচিত ব্যজনে হাওয়া করেছে।

যত বেলা বাড়তে লাগল, অদ্ভুত সংবাদটি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। নীতীশ ডাকল -- ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর সাড়া দিল — হুজুর।

—ব্যবস্থা কর, আমি রাজ দর্শনে যাব।

সুসজ্জিত অশ্ব। পঞ্চাশ জন যুবক আর পঞ্চাশ জন যুবতী। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রূপোর রেকাব, আর প্রত্যেক রেকাবে এক শত স্বর্ণমুদ্রা। দ্বারী মারফৎ রাজার কাছে সংবাদ গেল - বিদেশী রাজকুমার যে এক রাতে প্রাসাদ গড়েছে সে এসেছে রাজদর্শনে। বলা বাহুল্য এত ক্ষণ রাজসভায় নীতীশের বিষয়ই আলোচনা হচ্ছিল।

রাজা সাদরে নীতীশকে অভ্যর্থনা জানালেন। উপঢৌকন সাজিয়ে রেখে পরিচারক পরিচারিকা চলে গেল। সভায় সম্মাননীয় অতিথির আসনে বসল নীতীশ। রাজা জানতে চাইলেন নীতীশ কোন রাজ্যের রাজপুত্র। নীতীশ সবিনয়ে বলল -- মহারাজ, পৃথিবীতে এক জনই রাজা আছেন, তিনি জগতের ঈশ্বর। আর সবাই তাঁর প্রজা। মানুষ তার কর্ম ও যোগ্যতার মর্যাদা পায়। সুতরাং ব্যক্তিই ব্যক্তির পরিচয়। অন্য পরিচয় বাহুল্য মাত্র।

রাজা অল্প বয়সী নীতীশের পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতি কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি হৃষ্ট চিত্তে বললেন — তা, তুমি যখন এই রাজ্যে বসবাস করার বাসনা করেছ তখন আমি তোমাকে এই রাজসভার সদস্য করে নিলাম। তুমি আজ থেকে সভাসদ হলে। তোমার জন্য আসন নির্দিষ্ট থাকবে।

এইভাবে দিন চলতে লাগল। রাজার সাত জন মেয়ে আর একটি ছেলে। ছয় কন্যার বিবাহ হয়েছে, ছয় রাজ্যে। ছোট মেয়েরও বিয়ে দেওয়ার দরকার। ছেলের নাম সতীশ আর ছোট মেয়ের নাম সরমা। সতীশের সঙ্গে নীতীশের আলাপ হল। বন্ধুত্ব হল।

প্রতিদিন সকালে নীতীশ প্রাসাদের বেলকনিতে আরাম চেয়ারে বসে আরাম করে। আর রাজকন্যা সরমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকে। দাসী মারফৎ সংবাদ যায় রাণীর কাছে, রাণীর থেকে রাজা। নীতীশ জামাই হলে বেশ হয়। রাজা বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন নীতীশের কাছে। শুভ দিনে শুভক্ষণে কূল-পুরোহিত রাজ-প্রস্তাব নীতীশের কাছে পৌঁছে দিলেন। তার পর আশাতীত দক্ষিণা নিয়ে হৃষ্ট চিত্তে নীতীশকে আশীর্বাদ করে, তার জয় গান গাইতে গাইতে বিদায় হলেন।

বিয়ে হলে মায়ের আসার দরকার। মাকে দূরে রেখে বিয়ে করতে যেতে পারে না নীতীশ। তাই ভয়ঙ্করকে হুকুম দিল, মা'কে এনে দাও। তিন মাসের পথ অতিক্রম করে এক মুহূর্তে নীতীশের মা এসে পৌঁছালেন নীতীশের প্রাসাদে। বড় ধুমধাম করে বিয়ে হল সরমার সঙ্গে নীতীশের। ছয় দিদি এল। এল ছয় রাজপুত্র জামাই। কিন্তু সবাইকে হার মানিয়ে রূপে গুণে অর্থে প্রাচুর্যে নীতীশ যেন তুলনা হীন। সরমার ভাগ্যকে হিংসা করে দিদিরা।

নীতীশের মা বাড়ি ফিরে গেলেন। কাটল বেশ কিছুদিন সুখে স্বাচ্ছন্দে। এ দিকে সেই সন্ন্যাসী বুঝতে পারল আসল রহস্যটা। যে মোরগ বিক্রি করেছিল সেই ছোকরা ভয়ঙ্করকে বশ করেছে। ভাঙা হাত, ভাঙা কোমর নিয়ে সে দেশে দেশে ঘুরতে লাগল নীতীশের খোঁজে। অবশেষে এক দিন সে এসে পড়ল রম্যপুর রাজ্যে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল রাজার ছোট জামাই'র অলৌকিক কাণ্ড কারখানার কাহিনী। বুঝতে তার দেরি হল না। সে ঠিক জায়গায় এসে গেছে। এবার কৌশলে লোহার আংটিটা হাতাতে হবে। তার পরে আর কোন চিন্তা নেই। দুনিয়ার সব শক্তিশালী রাজা জমিদারকে ধরে কারাগারে পুরে তাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করতে পারবে। সারা দুনিয়ার সম্রাট হয়ে বসে থাকবে।

যখন নীতীশ রাজদরবারে গেল অমনি সুযোগ বুঝে এল সেই সওদাগর সন্ন্যাসী। সরমাকে ডেকে পাঠাল। হাত দেখতে জানে সে। ছোট রাণীর ভাগ্য গণনা করবে। সরমা খুশি হয়ে সন্ন্যাসীর কাছে মেলে ধরল তার বাম হাতটা। সন্ন্যাসীও তার মনের কথাগুলো বলতে লাগল। সরমার ছয় দিদি রাণী হবে। আর রাজা হবে সরমার ভাই সতীশ। আর সরমা? রাণী হবার সমস্ত লক্ষণ তার হাতে, তবু তার স্বামী রাজসভায় সভাসদ হয়ে থাকবে।

সরমা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—এর কোন উপায় নেই সন্ন্যাসী ঠাকুর? আমার দিদিরা আমায় বড় হিংসে করে। তারা একে একে রাণী হয়ে গেলে তাদের অহংকার আকাশ ছুঁয়ে যাবে। আর অমিতো সাধারণ গৃহবধু ছাড়া কিছু নই। তুমি এর একটা উপায় করো ঠাকুর। তুমি যা চাও তাই দেব। সোনা দানা হিরে যা চাও। শুধু আমাকে রাণী হবার উপয় বলে দাও।

সন্ন্যাসী অনেক মন্ত্র পড়ল, মাটিতে খড়ি ঘসল, তারপর অঙ্ক কষে কি যেন গণনা করল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল -- লৌহ .... লৌহ ...... লৌহ অঙ্গুরীয়। স্বর্ণ হীরক নীলা পলার মধ্যে বেমানান লৌহ। আচ্ছা মা, তোমার বা তোমার স্বামীর হাতে কোন লোহার আংটি আছে?

সরমা সহজ ভাবে উত্তর দিল -- আছে আছে, আমার স্বামীর হাতে তর্জনীতে একটি লোহার আংটি আছে।

-- ঐ, ওটাই তোমার বিপদের কারণ। আচ্ছা তুমিই বলনা মা, কেউ কি কখনো লোহার আংটি পরে? যদি তোমার এবং তোমার স্বামীর মঙ্গল চাও তাহলে আজই তোমার স্বামী ঘুমিয়ে গেলে তার হাতের সেই লোহার আংটিটা খুলে নেবে। সাবধান ও যেন টের না পায়। তোমার স্বামী জানতে পারলে অনর্থ বাধবে। কাল অমাবস্যা, কাল আমি আবার এই সময় আসব। তিন ছটাক চাল আর তিনটি তামা পয়সার সঙ্গে ঐ পাপ আংটি তুমি আমার হাতে সমর্পণ করবে। দেখতে পাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে তুমি সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বরী হবে। সুপুত্রের জননী হবে। কথাটা যেন পাঁচ কান না হয়। মনে রেখো তোমার স্বামী যেন জানতে না পারে। জানতে পারলে অনর্থ বাধবে। তোমার অথবা তোমার স্বামী, যে কোন এক জনের অকাল মৃত্যু হবে।

যথা রীতি আজও রাজ সভায় গেল নীতীশ। অমনি সন্ন্যাসী এসে হাজির হল। সরমা সোনার থালায় তিন ছটাক চাল আর তিনটে তামার পয়সার সঙ্গে গত রাতে খুলে নেওয়া

আংটিটা দাসীর হাতে দিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে এল। সন্ন্যাসীর কাছে আসতেই সে ঝাঁপ দিয়ে থালা থেকে লোহার আংটি তুলে নিল। দাসীর হাতের সোনার থালা ছিটকে পড়ল। অট্টহাস্য হেসে সন্ন্যাসী বিকট কাপালিক মূর্তি ধারণ করল। সরমা ভয় পেয়ে দাসীকে জড়িয়ে ধরল।

সন্ন্যাসী ডাকল — ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর সাড়া দিল - হুজুর।

এই মুহূর্তে নীতীশকে কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্ত কর। সরমাকে পরাও ভিখারীর বেশ। এই প্রাসাদ দাস দাসী ধন রত্ন সরিয়ে আগের মত খালি জমি করে দাও।

পলকের মধ্যে সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেল। আকাশে সহসা বজ্রের গর্জন শোনা গেল। কোথায় গেল সেই প্রাসাদপুরী। কোথায় হাতি ঘোড়া লোক লস্কর। সরমা নদীর ধারে দাসীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ভিখারিনীর বেশ। ভয়ে অনেক ক্ষণ চোখ খুলতে পারল না সে। তার পর কাতর স্বরে দাসীকে বলল — এ আমি কি করলাম?

রাজসাভায় বসে থাকা নীতীশ সহসা কেঁপে উঠল। তার সারা হাতে পায়ে দুষ্ট ক্ষত দেখা দিল। রাজকীয় পোশাকের পরিবর্তে ভিক্ষুকের মলিন বেশ। সবাই চমকে উঠল। ঘটনার আকস্মিকতায় রাজসভার দ্বারী চিৎকার করতে লাগল। সভাসদরা হুড়ো হুড়ি ছুটো ছুটি করতে লাগল।

নীতীশ দেখল তার হাতে আংটিটা নেই। কখন সে তা হারিয়ে ফেলেছে, নিজেই বুঝতে পারেনি। নীতীশ ধীরে ধীরে রাজসভাথেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে দেখল সরমা ভিখারিণীর বেশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

নীতীশকে দেখে সরমা তার পায়ে পড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে বলল — আমি বড় ভুল করেছি। তোমার লোহার আংটি তোমার হাত থেকে নিয়ে এক সন্ন্যাসীকে দিয়ে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারিনি এমনটি হয়ে যাবে। আমায় তুমি ক্ষমা করো না, আমায় মেরে ফেল।

নীতীশ ব্যাধিগ্রস্ত হাত দিয়ে সরমাকে তুলে ধরে বলল — কেঁদো না। খবরদার সেই আংটির কথা কাউকে বোলো না। তাতে আমরা আরো উপহাসের পাত্র হয়ে যাব। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও। আমি পথেই থাকব। যদি কোনদিন ভাগ্য ফেরাতে পারি তাহলে আবার আসব তোমার কাছে।

কিন্তু সরমা রাজি হলনা। সে বলল — আমি তোমাকে ছেড়ে স্বর্গেও যেতে চাই না। তাছাড়া আমার দোষে তোমার আজ এ অবস্থা। সুতরাং তোমায় ছেড়ে আমি কি করে রাজপ্রাসাদে রাজভোগে থাকি বল?

রাজারাণী অত্যন্ত কাতর হয়ে সরমাকে বললেন — তুই আমার প্রাসাদে ফিরে আয়। ব্যাধিগ্রস্ত নীতীশ যেখানে যায় যাক্। তার ভাবনা সে ভেবে নিক্।

সরমা বলল — মা, আমি জানি তোমার জামাই'র কোন দোষ নেই। অপরাধ করলে আমি করেছি। তাই আমি তাকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াব। তবু তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

নীতীশ আগেই বলে রেখেছে, আংটির কথা, সন্ন্যাসীর কথা কাউকে বলতে না। হতাশ রাজা আর রাণী তাঁর প্রাসাদের পিছনে একটি কুটীর নির্মান করে সেখানে নীতীশ আর সরমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাজবাড়ি থেকে দু'বেলা খাবার আসতে লাগল। নীতীশ মনে মনে তার মায়ের মুখটা স্মরণ করতে লাগল। তাতে কষ্টের কিছুটা লাঘব হল।

নীতীশ অভ্যাস বসে ডাকল -- "ভয়ঙ্কর"। কিন্তু কোথায় ভয়ঙ্কর। সে তো এখন সন্ন্যাসীর আজ্ঞাবহ দাস। নীতীশ ভাবল তার আরও একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ধীরে ধীরে পাশে এসে বসল সরমা। দূরত্ব বজায় রেখে নীতীশ বলল -- আমায় কাল ব্যাধি আক্রমন করেছে। আমার কাছ থেকে দূরে থাক।

সরমা কাঁদতে কাঁদতে বলল -- তোমারতো সত্যিকারে কোনো অসুখ হয়নি। এতো শুধু আমার ভুলের ফল। আমার লোভের প্রায়শ্চিত্ত। আমি রাণী হতে চেয়েছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি, রাণী না হয়েও আমি কত সুখে ছিলাম। আর সন্ন্যাসী আমার লোভের সুযোগ নিয়ে তোমার সর্বনাশ করল। আজ আমার জ্ঞান হয়েছে - মানুষের বেশি লোভ ভাল নয়। তা না হলে এমন যাদু আংটি পেয়েও কেন তুমি রাজা মহারাজা হতে চাওনি।

নীতীশ বলল -- তোমার কোন দোষ নেই। রাজার মেয়ে রাণী হবে, সেটাইতো স্বাভাবিক বাসনা। কিন্তু আমি তোমাকে রাণী করতে পারি নি। সে দোষ তো আমার।

হঠাৎ ভয়ঙ্করের কণ্ঠস্বর শোনা গেল -- হুজুর, আমি আজ তোমার কোন কাজে লাগতে পারব না। কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসি। সন্ন্যাসী আমাকে হাতে পেয়েছে। এই ব্যাক্তি আমায় ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে যন্ত্রনা দিয়েছিল। সুতরাং আমি তার কাছে বেশি দিন থাকতে পারব না। তবে তোমার কাছে ফিরে আসতে কিছু দিন সময় লাগবে, ততদিন অপেক্ষা কর। হাতশ হয়ো না, চিরদিন কারো দুর্দিন থাকে না।

এদিকে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সন্ন্যাসী নৌকো বেয়ে চলেছে। সাতটা পাল তোলা নৌকো, আংটিটাকে নাচাচ্ছে আর ভাবছে কি সম্পদ চাইবে। সসাগরা পৃথিবী সাম্রাজ্য নাকি নারকীয় সুখ। প্রাসাদ না প্রাচুর্য। সারি সারি বন্দী রাজা মহারাজা যাদের চাবুক মেরে নারকীয় সুখ অনুভব করবে। আজ আর তার কাছে কিছুই অধরা নেই। যত খুশি মানুষের উপর অত্যাচার করতে পারবে। স্বর্গের পরী, আর বেহস্তের হুরিদের ধরে এনে বন্দী করে রাখবে। তাদের শরীরে সহস্র ভীমরুল, মৌমাছির হুল ফুটিয়ে তাদের যন্ত্রনা কাতর মুখগুলো দেখবে। সবচেয়ে সুখি রাজাদের ধরে এনে চাবুক মারবে। আর তাদের কান্নার সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনে নিজের মনকে আনন্দ দেবে। ইচ্ছে করলে সারা দেশটাকে পাথর করে দিতে পারবে।

যেখানে যত সুন্দর আছে সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারবে। শুধু বিভীষিকা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। সব ফুল শুকিয়ে যাবে, সব আলো নিভে যাবে। শিশুদের গায়ে শুল ফুটিয়ে যন্ত্রণা দেবে, মানুষ চাবুকের ঘায়ে ছট্ ফট্ করে মরবে। করুণ সুরে কাঁদবে।

বাঘ সিংহ হাতি সমস্ত শক্তিশালি প্রাণী নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকবে। পাখির সুমিষ্ট গান থেমে যাবে। তার বদলে শোনা যাবে শৃগাল শকুনের কর্কশ চিৎকার। ভুত প্রেত পিশাচের বিভৎস তাণ্ডব। মানুষের কোলাহল কান্নায় পরিণত হবে।

একবার আকাশের দিকে তাকায় আবার আংটির দিকে। 'যদি আকাশের তারা গুলোকে নীচে নামিয়ে আনা যেত তাদের এমনি করে নাচাতে নাচাতে খেলা করতে পারতাম।' অবহেলায় অলক্ষ্যে হাত থেকে ফসকে আংটি গড়িয়ে পড়ল অতল জলে। দারুণ বেদনায় আর্ত চিৎকার করে উঠল সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন আর তার কিছুই করার নেই। কোনও যাদু বলে যাদু আংটিকে উদ্ধার করা যাবে না।

তবু এই ভেবে সান্ত্বনা পেল যে আর কারো এই যাদু আংটি রইল না। নীতীশ ব্যাধিগ্রস্ত আর সরমা ভিখারিনী হয়েছে। তাকে প্রতারণা করার উচিত শাস্তি তারা পেয়েছে।

এদিকে সরমার পিতার মনে সুখ নেই। সাধের ছোট মেয়ে আর জামাই'র এহেন করুণ অবস্থা দেখে কার মনের অবস্থা ভাল থাকতে পারে? মনের অবসাদ কাটাতে রাজা ঠিক করলেন তিনি পিতৃ পুরুষের তর্পণ করবেন। রাজ্যে উৎসব করবেন। প্রজাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করবেন। আমন্ত্রণ জানাবেন জামাইদের, প্রতিবেশী রাজাদের আর গন্যমান্য ব্যক্তিদের। আনন্দ উৎসবে মেতে থাকলে মন ভাল থাকবে। এক বছর ধরে রাজবাড়ির উৎসব চলতে থাকল।

এক বছর ধরে চলা উৎসব শেষ হতে চলেছে। দেশ বিদেশের রাজা, রাজপুত্ররা এসেছে, এসেছে অনেক গন্যমান্য ব্যক্তি। এলো ছয় জামাই, ছয় মেয়ে। তার সঙ্গে দাস দাসী লোক লস্কর। আলোক মালায় সেজেছে সারা রাজ্য। রাজপথে তৈরী হয়েছে সুন্দর সুন্দর তোরণ। রম্যপুরের রাজার জয় গানে মুখরিত আকাশ বাতাস। শুধু একজন লজ্জায় মুখ লুকোতে ব্যস্ত। সে হল সরমা। হিংসা কাতর দিদিদের আজই তো সুযোগ। কুটিরে এসে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, কৌতুক করে যায় তারা। দুঃখে সরমার বুক ফেটে যায়।

মাছ মাংস খাদ্য পানীয়র বিপুল আয়োজন। খাল বিল নদী থেকে মাছ ধরে আনছে ধীবরেরা। ভিয়েন বসেছে। মিষ্টি দইয়ের অঢেল আয়োজন। রাজকন্যারা নানা নোংরা জিনিস কুড়িয়ে এনে ছুঁড়ে মারে নীতীশকে। কোনদিন দইয়ের ভাঁড় কখনো বা মাছের পাকস্থলি। বিদ্রূপ...বিদ্রূপ আর বিদ্রূপ। চৌকির উপর ছেঁড়া কাঁথায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে সরমা।

সেদিন মধ্যম রাজকন্যা দাসীর হাত দিয়ে একটা মাছের পাকস্থলি আনিয়ে একে বারে নীতীশের মুখের উপর ছুঁড়ে মারল। কপালে করাঘাত করে হাহুতাশ করে কাঁদতে কাঁদতে সরমা বলল -- কেন দিদি, তোরা আমায় এমন অপমান করছিস্। আমি তোদের রাজবাড়িতে যাই না। তোদের বোন বলে পরিচয়টাও দিই না। তবে কেন তোরা এই অসুস্থ লোকটার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছিস?

বিদ্রূপ করে রাজকন্যা বলল -- আহারে মরে যাই। কতনা সোহাগ।

হাসতে হাসতে দিদি চলে গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে জ্বলে উঠল নীতীশ। কিন্তু অক্ষমের রাগ বৃথা। কিছুই করার নেই তার। মুখটা পরিস্কার করার জন্য আঙুলহীন

হাতের চেটো দিয়ে ঘসে ঘসে সরাতে লাগল নোংরাটাকে। হাতের চাপে বেরিয়ে এল সেই লোহার আংটি। চিনতে পারল নীতীশ।

নীতীশ ডাকল — ভয়ঙ্কর।

আংটি জবাব দিল — হুজুর।

নীতীশ — রাজবাড়ির খবর কি? আমার শালি আর শালিপতিরা কে কি করছে?

ভয়ঙ্কর — তোমার শালিপতিরা মৃগয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর শালিকারা তারই যোগাড় করছে। কাল প্রভাতে ওরা হরিণ শিকারের জন্য যাবে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ছয় জামাই আর সতীশ ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল শিকারের জন্য। তার আগেই নীতীশ পৌঁছে গেল জঙ্গলে। ভয়ঙ্করের সাহায্যে কুটীর নির্মাণ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ধূনি (*অগ্নিকুণ্ড*) জ্বালিয়ে বসল। ভয়ঙ্করকে হুকুম দিল অরণ্যের সমস্ত হরিণ, বন্যবরাহ প্রভৃতি শিকারযোগ্য প্রাণীকে ধরে এনে সেখানে আটকে রাখতে।

সরমা দেখল — নীতীশ কুটিরে নেই। ভাবল ক্ষোভে দুঃখে হয়তো কোথাও চলে গেছে। কিন্তু হাত পা নেই, পঙ্গু মানুষটা গেল কি করে? যাই হোক মনে দারুণ বেদনা পেলেও কাউকে কিছু বলল না। কাকেই বা বলবে? মনের দুঃখ মনেই মরে।

এদিকে তীর ধনুক কাঁধে সাত জন সারা অরণ্য খুঁজে হয়রাণ। কোথাও একটি শিকারযোগ্য পশু তারা দেখতে পেল না। পাবে কি করে? সব পশুকে তো নীতীশ কুমার এক জায়গায় জড় করে রেখেছে। অপরাহ্ণে ক্লান্ত হয়ে তারা এসে থামল সন্ন্যাসী বেশী নীতীশের আশ্রমে। কি কাণ্ড, যত রাজ্যের হরিণ এসে জড় হয়েছে এই সন্ন্যাসীর আশ্রমের আসপাশে। শ্যালক আর শালিপতিদের দেখে নীতীশ বাইরে এলো।

সকলের প্রতি উদ্দেশ করে বলল — ইহা অহিংসা আশ্রম। এই আশ্রমে সমস্ত পশু পক্ষি নির্ভয়ে বিচরণ করে। এখানে কোন পশু-বধ নিষিদ্ধ। পশু হত্যার চেষ্টা করলে তোমাদের মস্তক ছেদন করা হইবে।

নীতীশের হাতের বিশাল খড়্গ দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তারা সন্ন্যাসী বেশধারী নীতীশ কুমারকে প্রণাম করল। সকলে এসে বসল ধূনির সামনে। নীতীশ তাদের অহিংসার উপদেশ দিতে লাগল। 'হিংসা মানুষের একটি ব্যাধি', তা তাদের পরম তাত্ত্বিকের মত বোঝাতে লাগলো। তখন ভয়ঙ্কর ঋষি বালকের বেশে তাদের সকলকে পানীয় জল আর ফল মূল পরিবেশন করল। অনেক ক্ষণ অভুক্ত থাকার পর খাবার পেয়ে তারা সকলে তৃপ্ত হল।

কিন্তু তাদেরতো হরিণের প্রয়োজন। খালি হাতে বাড়ি ফিরলে তাদের মান সম্মান থাকে না। অপরিসীম লজ্জায় পড়তে হবে। তাই তারা হাত জোড় করে দাঁড়াল নীতীশের সামনে — সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনি যদি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদিগকে একটি করিয়া হরিণ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা যাহার পর নাই কৃতার্থ হই। আপনি জ্ঞানবান পুরুষ। আপনি জ্ঞাত আছেন যে হরিণ মাংস ব্যতীত পিতৃ তর্পণ সম্পন্ন হয় না। সুতরাং প্রসন্ন হউন।

নীতীশতো তাই চাইছিল। এবার সে সুযোগ পেয়ে গেল। বলল — বৎসগণ, তোমাদের কথায় আমি প্রীত হইলাম। তোমরা সুবুদ্ধি রাজা অথবা রাজপুত্র।

একথা বলেই নীতীশ প্রত্যেকের নাম ও পরিচয় বর্নণা করতে লাগল। সন্ন্যাসীর কথাশুনে সকলেতো একে বারে হতবাক। ভাবল এ ব্যক্তিতো তাহলে সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা। তাদের ভক্তি আরো বেড়ে গেল। তারা এবার অনুনয় বিনয় করতে লাগল। নীতীশ বলল — বৎসগণ শোন, পরম পিতা পরমেশ্বর আপন অপত্য রূপে পৃথিবীর প্রাণী কুলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের পুত্রস্নেহে পালন করিলেও তাদের মধ্যে হিংসাকে ছড়াইয়া দিয়াছেন। একের সঙ্গে অপরের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। উদ্ভিদ প্রাণীর খাদ্য, আবার এক প্রাণী অপর প্রাণীর খাদ্য। অথচ সকলেরই প্রাণ রহিয়াছে, সবাই বাঁচিতে চায়, ব্যাথা লাগে সকলের। ঈশ্বরের এই অদ্ভুত বিধান পরম পিতারই সৃষ্টি। তাঁহারই খেলা মাত্র। কিন্তু কেন জান?

সকলে নীরব শ্রোতা মাত্র। এই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের কোন উত্তর তারা দিতে পারল না। সন্ন্যাসীবেশী নীতীশ কুমার আবার তারই প্রশ্নের ব্যখ্যা করতে শুরু করল — তবে শ্রবণ কর। যে, সকল প্রাণীকে সর্বনিম্ন দুঃখ প্রাদান করে, যাহার অন্তর সকল প্রাণীর জন্য বেদনায় কাতর হয়, একান্ত নিরুপায় না হইলে অন্য জীবকে হত্যা করে না, কেবল মাত্র নিজের জীবন ধারণের প্রয়োজন ব্যতীত অপর প্রাণীকে বধ করে না, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রশন্ন হন। একটি প্রাণের জন্য আপন প্রাণে যন্ত্রণা সহ্য না করিলে ভগবান বিরূপ হন।

তোমাদিগের সকলের একটি করিয়া মোট সাতটি হরিণের প্রয়োজন। ইহাদের প্রাণ তোমাদের প্রয়োজনে উৎসর্গীকৃত হইবেক। মৃত্যু কালে ইহাদিগকে নিদারুণ যাতনা অনুভব করিতে হইবে। অতএব আমি এই বিধান দিতেছি যে তোমাদের সকলের নাভি কুণ্ডলির তলদেশে তপ্ত লৌহ শলাকার চিহ্ন আঁকিয়া দিব। তাহাতে তোমরা কিঞ্চিত যাতনা অনুভব করিবে। সেই হেতু মৃগ বধের পাপ সামান্য লাঘব হইতে পারে। পরে ঈঙ্গুদী তৈল সহ ঔষধি প্রয়োগ করিলে তোমাদিগের বেদনা লাঘব হইবে। তবু চিহ্ন থাকিয়া যাইবে। তোমরা যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত থাক তাহা হইলে তোমাদের ইচ্ছা মত একটি করিয়া হরিণ পাইবে।

পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। সতীশ বলল--নাভির নীচে তো, ও কেউ দেখতে পাবে না। দিন! আমি রাজি আছি।

এরপর সকলেই রাজি হয়ে গেল। কথামত একটি করে লোহার চিমটির ছ্যাঁকা দিয়ে একটা করে হরিণ দিল নীতীশ। কেবল সতীশকে লোহার চিমটে ছ্যাঁকা থেকে বাদ দিল। কারণ সে নিতান্ত কিশোর। তাই তাকে এমনিতেই একটা হরিণ উপহার দিল। আসল কথা ছোট ভাইকে ছ্যাঁকা দিলে সরমা রাগ করবেতো, তাই।

যন্ত্রণা কাতর ছয় জামাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঈঙ্গুদী তৈল মর্দন করতে করতে বাড়ির পথে ফিরল। কিন্তু তলপেটে ব্যাথা নিয়ে ঘোড়ায় চাপতে কষ্ট হচ্ছে। তাই আস্তে ঘোড়া চালাতে হল। সুতরাং ফিরতে দেরি তো হবেই। সন্ন্যাসীর এহেন আচরণে মনে মনে লজ্জা পেল সতীশ। ভাবল তাকে না হয় একটা ছ্যাঁকা দিতই, তা এমন কি ক্ষতি হোত।

সবাই চলে গেলে নীতীশ কুমার ডাকল - ভয়ঙ্কর।

ভয়ঙ্কর সাড়া দিলে নীতীশ বলল — এখান থেকে বেছে বেছে সেবা পঞ্চাশটি হরিণ নাও। বাকি সব হরিণকে মুক্তি দাও। তারা আগের মতো বনে বিচরণ করে বেড়াক্।

আজ মহা সমারোহের বর্ষপূর্তি উৎসর শুরু হয়েছে। আয়োজন বিশাল। কিন্তু এই বিপুল সমারোহে মাত্র সাতটি হরিণ মোটেই যথেষ্ট নয়। তাই রাজা মহা চিন্তায় পড়লেন। রাত পোহালে হাজার হাজার অতিথিকে মাংস খাওয়াতে হবে। সে যাই হোক, জামাইরা হরিণ শিকারের নানা মিথ্যা বর্ণনা দিতে লাগল। কে কত সাহসী, কার ধনুকের জোর কত। কে কেমন লক্ষ্যে তীর ছুঁড়তে পারে। যার স্বামী যত বেশি আস্ফালন দেখায় সেই রাজকন্যা ততই গর্বে ফেটে পড়ে। ব্যতিক্রম কেবল সতীশ। সেই কেবল কোনো কথা বলে না।

এদিকে সরমা কিসের সাড়া পেয়ে তাকিয়ে দেখে সারি দিয়ে পঞ্চাশটি হরিণ বাঁধা। পাশে দাঁড়িয়ে সুবেশ সুন্দর নীতীশ। সকাল থেকে সরমা নীতীশের চিন্তায় ছিল। মনের দুঃখে কাউকে কিছু বলে নি। কারণ এত বড় সমারোহে নীতীশের কথা উঠলে আবার সরমাকে অপমানিত হতে হবে। তাই চোখের জল চোখে রেখে সারাদিন ঈশ্বরের চিন্তা করেছে সরমা। সহসা নীতীশকে পূর্ব বেশে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

সরমা নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল তার পরণে পট্টবস্ত্র , শরীরে ভারি ভারি অলংকার ঠিক যেমনটি সে আগে ছিল। সরমা আনন্দে উচ্ছ্বাসে কেঁদে ফেলল। বলল -- সব নষ্টের মূলে আমি।

নীতীশ তার হাত ধরে বলল -- তোমার কোন দোষ নেই সরমা। যাদু সন্ন্যাসী, যে তোমার কাছ থেকে লোহার আংটি নিয়েছিল, তোমার দুর্ভোগের জন্য সেই দায়ী।

আনন্দের সঙ্গে অনুতাপ। কান্না থামাতে পারলনা সরমা। নীতীশের বুকে মাথা রেখে বলল -- সব দোষ আমার। তোমার কাল ব্যাধি, অপমান, লাঞ্ছনা গঞ্জনা এ সব কিছুর জন্য আমি দায়ী। দায়ী আমার রাণী হবার সাধ। তুমি আমায় ক্ষমা কর। এই আনন্দের দিনে আমি নূতন করে বাঁচতে চাই।

-- তুমি রাজর্কন্যা। রাণী হবার সাধতো তোমার অন্যায় কিছু নয়। রাণী নয় মহারাণী হবে। জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু কষ্ট, কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। তাই তোমার আর আমার এই দুঃখ ভবিষ্যৎ সুখের ইশারা। আর কোন ভয় নেই। চল আমাদের প্রাসাদে যাই।

-- কোথায় প্রাসাদ?

-- যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই আছে।

-- আর এই কুটির?

-- কাল আর এখানে এটা থাকবে না।

কুটিরের দিকে সত্যিই কারো কোন নজর ছিল না। সকালে যে যার মত উৎসবে মেতে উঠেছে। সকলকে অবাক করে দিয়ে দিদিদের মধ্যে সুবেশা সুন্দরী সরমা এসে হাজির হল। সবার চেয়ে মূল্যবান মণি মাণিক্যের অলঙ্কার তার শরীরে ঝলমল করছে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। অবাক বিস্ময়ে আর ভয়ঙ্করের প্রভাবে সকলে ভুলে গেল যে কাল এই সরমার ভিখারিণীর বেশ ছিল। তাই তারা যেমন আগে সরমার ভাগ্যকে হিংসা করত আজও তাই করল। কিন্তু সম্পদকে কে না সমীহ করে? তাই সকলের মধ্যে সরমার যেন আলাদা

সম্মান। তেমনি আলাদা গ্ল্যামার। অযথা দাস দাসীদের দয়া দাক্ষিণ্য বিতরণ করে। একে ওকে মণি মুক্তা উপহার দেয়।

রাজসভায় নির্ধারিত আসনে এসে বসল নীতীশ কুমার। কোথায় যেন কি একটা ঘটে গেছে। সবাই এর ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু বেশি কিছু মনে করতে পারল না। অন্য জামাইদের মধ্যে কোথায় যেন একটা ছন্দ পতন ঘটল। নীতীশের মহা মূল্যবান পোশাক আশাক কথা বার্তা, সপ্রতিভ উপস্থিতিতে অন্য জামাতারা যেন ম্লান হয়ে গেল। তবু তারা সদম্ভে গত দিনের আলোচনায় মসগুল হয়ে পড়ল। যেন একটা কটাক্ষে নীতীশকে উপেক্ষা করতে চায়। বড় জামাতা অস্ফালন করে বলল — কাল জঙ্গলে শিকারে গিয়ে যা ধকলটা গেছে। হরিণের পিছনে ধাওয়া করা, আর নিশানা ঠিক করে তীর ছোঁড়া, সেকি সহজ কাজ। দস্তুর মত এলেম লাগে।

নীতীশ হাসতে হাসতে বলল — তা যাই বলুন, সন্ন্যাসীর দয়ার শরীর। কেবল মাত্র একটি করে ছ্যাঁকা দিয়ে একটা করে হরিণ দিলেন। না হলে কি অপমানটাই না হতে হত তার সীমা পরিসীমা থাকত না। পুরো অনুষ্ঠানটাই মাটি হত।

সভাসদরা অবাক হয়ে জানতে চাইল — কি ব্যাপার? 'সন্ন্যাসী', 'ছ্যাঁকা' এসব আবার কি জিনিস?

মুহূর্তের জন্য আগের সব ঘটনা জামাইদের মনে পড়ে গেল। তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল — যত সব আবোল তাবোল বকুনি। রোগে শোকে কুঁড়ে ঘরে থেকে থেকে মাথাটা একে বারে গেছে। রাজবাড়ি থেকে পোশাক আষাক চেয়ে নিয়ে না হয় রাজসভায় এসেছিস্। তা বলে আমরা হলাম রাজা, রাজপুত্র, আমাদের সঙ্গে আনাড়ি রসিকতা তোমার মানায় না।

নীতীশ মোটেই উত্তেজিত না হয়ে বলল — তা তো হতেই পারে। কারণ মাত্র একটা করে হরিণ চেয়ে আনতে যদি আপনাদের এত পরিশ্রম হয়ে থাকে তাহলে কাল পঞ্চাশটা হরিণ জীবন্ত ধরে আনতে আমার একটু আধটু মাথা টাথা খারাপ হতেই পরে। তবে সে যাই হোক, দিদিদের বলবেন ক্ষতস্থানটা একটু ভাল করে ঈঙ্গুদী তেল দিতে। আহা বেচারাদের কি কষ্ট।

এক জন জামাতা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল — পঞ্চাশটা হরিণ মেরে আনা এত সহজ কাজ নয়। রাজসভায় বসে উলটো পালটা না বললে কি নয়?

— হরিণ আমি মারি নি। কারন আমি তো আর তীর ধনুক নিয়ে যাই নি। ওদের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে ছুটে ধরে এনেছি। আরো ধরতে পারতাম তা অযথা পশু হত্যা করি না। আর প্রমাণ সে তো, রাজ বাড়ির পিছনে হরিণ বাঁধা দেখলে বোঝা যাবে। এতক্ষণে কসাই হয়তো মাংস কাটতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার কথা সত্যি কিনা তার জন্য সকলের নাভির নীচে দাগ দেখলেই বোঝা যাবে।

কথা শুনে সব জামাইরা এবার মাথা নত করতে লাগল। বেগতিক দেখে রাজা ভাবলেন কোথাও কিছু একটা হয়েছে। তা যাই হোক জামাইদের তো আর রাজসভায়

অপমান কারা যায় না। তাই রাজা বললেন — যাকগে সে কথা বাদ দাও। নীতীশ যখন পঞ্চাশটা হরিণ এনেছে তখনতো সমস্যা নেই। খুশি মত সবাই মাংস খেতে পারবে।

কিন্তু তাতে কি? কথাটা পাঁচ কান ঘুরে রাজ অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌছে গেল। রাজার সব জামাইরা নাকি কার কাছ থেকে একটা করে হরিণ চেয়ে এনেছে। কেবল বাড়ির ছোট জামাই — সেই এক মাত্র বীর পুরুষ। সেই পঞ্চাশটা হরিণ শিকার করেছে। শুনে তো গর্বে সরমার বুক ফুলে উঠল। আর অন্য দিদিদের মুখ গেল শুকিয়ে।

জানা গেছে সব রাজকন্যারা নাকি নিজ নিজ স্বামীর নাভির নীচে দাগ দেখতে পেয়ে যার পর নাই কাণ্ড ঘটিয়ে বসে ছিল। তবে সেটা প্রাকাশ্যে কেউ টের পায়নি। কেউ কাউকে বলেনি। তবে সবাই জানে।

চার

উৎসব অনুষ্ঠান মিটে মাটে গেল। নীতীশ ভয়ঙ্করের কাছে জানতে চাইল — কি করলে অমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে পারব যাতে, মায়া পুরীর সমস্ত পাষাণ মূর্তিকে মানুষে রূপান্তরিত করা যায়। অনেক আগে আমার সে কাজ করা উচিত ছিল। তা না করে আমি বিলাস ব্যসনে দিন কাটিয়েছি। তাই তার জন্য শাস্তিও পেয়েছি বিস্তর। এবার আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

ভয়ঙ্কর বলল — হুজুর, তুমি মহাপ্রাণ। পরের দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদে। তাই তোমার সিদ্ধি লাভ সহজে হবে। কিন্তু সাধনার আগে চাই জ্ঞান। সুতরাং তুমি পণ্ডিতের কাছে আগে এক বছর অধ্যয়ন কর। সাধারণ শিক্ষা লাভ করার পর ফিরে যাও সেই মায়াপুরীতে। সেদিন যে প্রতিমা তুমি নিজ হাতে ভেঙেছ সেই পাষান প্রতিমাকে জোড়া লাগিয়ে মন্ত্র জপ কর। যে দিন সেই টুকরো মুর্তি সম্পুর্ণ জোড়া লেগে যাবে সেদিন তোমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ হবে। আমি তোমার সাথে আছি, তোমার কোন ভয় নেই।

সরমাকে বলল নীতীশ — বাপের বাড়ি বেশি দিন থাকা ভাল দেখায় না। আর শ্বশুর বাড়ির দেশেও জামাইর মানায় না। চল আমরা আমাদের গ্রামে ফিরে যাই। সেখানে কিন্তু আমি রাজা নই। আমার মায়ের কাছে থাকতে তোমার অসুবিধা হবেনা তো?

সরমা বলল — আমার উচিত্ত শিক্ষা হয়েছে। আমি আর রাণী হতে চাই না। কেবল সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারলেই হল।

সরমাকে মায়ের কাছে রেখে নীতীশ বেরিয়ে পড়ল। জ্ঞান অর্জন ও সিদ্ধি লাভ করতে, বেশ কয়েক বছর লেগে গেল নীতীশের। একদিন দেবী প্রশন্না হলেন। ত্রিখণ্ডিত পাষাণ মুর্তি জোড়া লেগে গেল। জাগ্রতা দেবী বর দিলেন — ন্যায় ও সত্যের পথে চললে তোমার কোন দিন বাধা আসুবে না। তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত ভয়ঙ্কর তোমার পাশে থাকবে। আর তাকে হারাবার কোন ভয় তোমার রইলনা।

মায়া পুরীর মধ্যে গিয়ে পাষাণ মূর্তির গায়ে হাত দিল নীতীশ। পাষাণ মূর্তি অর্ধপাষাণে রূপান্তরিত হল। ভয়ঙ্কর বলল — হুজুর, সেই যাদু সন্ন্যাসী ছাড়া বাকি অর্ধেক পাষাণমুক্ত করা যাবে না। যদি আদেশ করতো সে দুষ্টকে ধরে আনি।

নীতীশের হুকুমে সন্ন্যাসীকে ধরে আনল ভয়ঙ্কর। সন্ন্যাসী তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীতীশকে বশ করতে চাইল। কিন্তু যেহেতু নীতীশ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে তাই সন্ন্যাসীর কোন ক্ষমতাই নীতীশের উপর কার্যকর হল না। বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী সমস্ত পাষাণ মূর্তিকে মুক্তি দিল। কল-কোলাহলে ভরে গেল মায়া পুরী। মুক্তির আনন্দে সকলে আত্মহারা।

ভয়ঙ্কর কবন্ধের মুণ্ডুটা নামিয়ে এনে অম্বরপুরীর রাজার মাথায় বসিয়ে দিল। আপন শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর কাটা মুণ্ড জোড়া লাগিয়ে দিল। অম্বরপুরীর রাজা তাঁর পূর্বরূপ ধারণ করলেন।

নীতীশ যাদু সন্ন্যাসীকে বলল -- তুমি অতি নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ। আমি তোমার শাস্তির বিধান করব। তোমাকে অর্ধপাষাণ করে এই মায়াপুরীতে আবদ্ধ রাখব আর এই সব রাজা ও সজ্জন ব্যক্তিরা তোমাকে প্রতিদিন কষাঘাত করবেন, যেমন তুমি করতে। মৃত্যুতোমার উপযুক্ত শাস্তি নয়। তুমি ছলনা করে শক্তি অর্জন করেছিলে। সে শক্তির তুমি অপব্যবহার করেছ।

সন্ন্যাসী কর জোড় করে বলল -- আমি পাপে পূর্ণ হয়েছি। আমার শাস্তি আমিই বিধান করব। তাই আমার অনুরোধ, তুমি শুধু তোমার বাম হাতটা আমার মাথায় ছোঁয়াও।

সহসা বিকট মূর্তি ধারণ করে ভয়ঙ্কর উপস্থিত হল। বলল -- হুজুর, ওকাজ করো না। ও মায়াবী। তুমি ওকে স্পর্শ করা মাত্র পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তুমি আমাকে হুকুম কর আমি একে পাহাড়ের উপর স্থাপন করে পাষাণে রূপান্তরিত করি। যেদিন ওর আয়ু শেষ হবে সেদিন পাষাণ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

হুজুর, প্রশ্ন না করলে আমি কোন কথা বলি না। কিন্তু তুমি দেবীর বর পেয়েছ। তার উপর তোমার সমূহ বিপদ। তোমার পিতা আমাকে অতি যত্নে পবিত্র তুলসী তলায় স্থাপন করেছিলেন। সহজ সরল জীবন যাপন ছাড়া কখনো কোন সম্পদ প্রার্থনা করেন নি। তাই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। তোমার কাছে আমৃত্যু থাকব। এমনকি তোমার সন্তান সন্ততিকেও সাহায্য দেব।

নীতীশ বলল -- ভয়ঙ্কর, তুমি বলেছিলে তুমি আমার আজ্ঞাবহ দাস। আজ থেকে তুমি আর আমার দাস নও, তুমি আমার বন্ধু। আর হুকুম না পেলে যদি তোমার কোন কথা বলায় অসুবিধা থাকে তাহলে আমি তোমায় হুকুম দিলাম -- আজ থেকে যখন যেটা করার প্রয়োজন তখন সে বিষয় আমাকে অবগত করবে।

সেই মত বিধান হল। সন্ন্যাসী পাষাণ মূর্তি হয়ে রইল। সমস্ত রাজারা যে যার দেশে ফিরে যাওয়ার আগে নীতীশ কুমারকে সম্রাট বলে ঘোষনা করল। তারা সকলে নীতীশের করদ রাজা হয়ে থাকার অঙ্গীকার করল। বহু দিন তারা দেশে ফেরেনি তাই তখনকার মত সকলে বিদায় নিল।

এই মায়াপুরী একদিন সুরম্য নগরী ছিল। কিন্তু এই মায়া সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। প্রতিদিন একশত মানুষকে বন্দী করে তাদের উপস্থিতিতে দশ

জনকে নিজ হাতে বলি দিয়ে পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করেছে। বিভৎস অত্যাচারে যারা পেরেছে অন্য রাজ্যে পালিয়েছে। গোটা নগরটি পরিণত হয়েছে অরণ্যে। মায়া পুরীর অরণ্য কেটে আবার বসতি স্থাপন করা হল। ভগ্ন প্রাসাদ ভয়ঙ্করের শক্তিতে বিশাল সুরম্য প্রাসাদে রূপান্তরিত হল। প্রাসাদের নাম হল সরমাপুরী। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে নগর প্রতিষ্ঠিত হল। পলাতকদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তারা সংবাদ পেয়ে ফিরে এলো। নূতন রাজ্যে নূতন লোকেরা এসে বাস করল। কচুরিবাগ থেকে সরমা এল, এলেন নীতীশের মা। এলেন সরমার মা-বাবা। এল ছয় জামাই আর ছয় দিদি। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা, জ্ঞানী গুণী মানুষ, বড় বড় বণিক সওদাগর।

অভিষেক হবে সম্রাট নীতীশ কুমারের। এক শত রাজা যাকে সম্রাট বলে ঘোষনা করবে, সেই নীতীশ কুমারের অভিষেক। সমারোহ বলে সমারোহ। চিত্রিত তোরোণ। আলোর রোশনাই।

সরমার ইচ্ছা পূরণ হল। আজ সে শুধু রাণী নয়, মহারাণী, সম্রাজ্ঞী। দিদিরা আর হিংসা করার মত সাহস না করে নিজেদের সম্রাজ্ঞীর দিদি বলে গর্ব বোধ করতে লাগল।

নূতন রাজ্য 'সরমাপুরী ' আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ্য। কারণ এক শত রাজা স্বেচ্ছায় নীতীশের বশ্যতা স্বীকার করেছে।

আর ভয়ঙ্কর? ভয়ঙ্করের কি হল?

সে তো রাজার বন্ধু। কিন্তু তার তো কোন রূপ নেই। দেবীর বরে তোতা পাখির রূপ ধরে নীতীশের পাশে পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজ্যের দেখাশোনা ভাল মন্দ কার্যত ভয়ঙ্করের উপদেশে চলতে লাগল। কেবল নিজের রাজ্য নয় এই এক শ করদ রাজ্যও পরোক্ষ ভাবে নীতীশই শাসন করতে লাগল। সরমাপুরী একটা আদর্শ সম্রাজ্যে পরিণত হল।

লাখ টাকার মেজবৌ

রাজ্যের নাম সুবুদ্ধপুর। তারই এক গ্রামে একটি দর্জি পরিবার বাস করতো। তাদের অভাবের সংসার হলেও সংসারে সুখ শান্তি ছিল। দর্জির ছিল দুই ছেলে এক মেয়ে। বড় ছেলের নাম কুয়াশা, মেজটির নাম প্রত্যাশা আর তার ছোট বোনের নাম বিদিশা। একদিন ছেলে মেয়েরা খেলা করতে করতে এক জঙ্গলের ধারে গেল। তার পর জঙ্গলের নানা প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে নানা রকমের ফল ফুল কুল পাড়তে লাগল। অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল লতা পাতা দেখতে দেখতে তাদের মন ভরে উঠল।

আনন্দে ডগমগ হয়ে তিন ভাই বোন মিলে খেলে বেড়াতে বেড়াতে এক সাধুর কুটিরে এসে হাজির হল। সাধুবাবা তাদের দেখে খুব আদর করে কাছে বসালেন। তার পর তাদের এক টুকরো করে মিছরি খেতে দিলেন। এমন মিছরি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। খেয়েতো তাদের মন ভরে গেল।

প্রত্যাশা বলল -- আচ্ছা সাধুবাবা, আপনি তো মহাপুরুষ। আপনি মানুষকে বর দেন?

সাধুবাবা একটু হাসলেন, তারপর বললেন -- তোমরা কি বর চাও বল?

কুয়াশা জানতে চাইল -- আপনাকে যা চাইব তাই দিতে পারবেন?

সাধুবাবা বললেন - না, আমি তা পারব না, তবে তোমাদের কার ভাগ্যে কি আছে সেটা বলতে পারব, আর তোমরা এখন কি ভাবছ তাও বলতে পারবো, আসলে মানুষের ভাগ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশি কিছু তাকে দেওয়া যায় না, তবে ভাগ্যকে জয় করে নিতে হয়। তাছাড়া আমি তো আর দেবতা নই, তাই তোমাদের কিছুই দিতে পারবো না।

বিদিশা বলল - তাহলে বলুন তো, আমি এখন কি ভাবছি?

সাধুবাবা কোন কিছুই চিন্তা ভাবনা না করেই বললেন -- আমার বর দেবার কথা শুনে তুমি তোমার জন্য একটা সুন্দর 'বর' চাইবে ভাবছ।

শুনেইতো বিদিশার টুকটুকে ফরসা মুখ খানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মনের কথাটা সাধুর মুখে শুনে সহসা দাদাদের মুখের দিকে তাকাতে পারল না।

সাধু বাবা বললেন -- এতে লজ্জা পাবার কি আছে মা? মেয়েরা বুঝতে শেখার আগেই স্বামীর কথা ভাবতে শুরু করে। আমি আশীর্বাদ করছি তুমি ভাল বরই পাবে।

বিদিশা আরো একটু মাথাটা নীচু করল। সাধুবাবা এবার বিদিশার মাথায় হাত রেখে বললেন। রাজরাণী হবি মা। ঈশ্বর তোমাদের সকলের মঙ্গল করবেন। আর তোমরা ভাবছ - তুমি (*কুয়াশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন*) ভাবছ তোমার ভাগ্যে কি আছে? তা তোমার জীবনটা সত্যিই ধোঁয়াশায় ভরা, তোমার ভাগ্যদেবী যে তোমায় কখন কোথায় কিভাবে নিয়ে যাবেন তা আগে থেকে বলা শক্ত। কথায় আছে, 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ।' তোমার পুরুষকারই তোমার ভাগ্যকে নির্ধারণ করবে।

এবার প্রত্যাশার দিকে তাকিয়ে বললেন ঘাবড়িও না। তোমার নামের মধ্যেই তোমার ভাগ্য লুকিয়ে আছে। লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখবে কিন্তু তা বাস্তবায়িত হতে সময় লাগবে। আপন বুদ্ধি আর কৌশলে তুমি সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারবে। তোমার কাজে তুমি অন্যের সাহায্য আর সহযোগিতা পাবে।

তিন ভাইবোনের বয়স যেন এক ঝট্‌কায় অনেকটা বেড়ে গেল। তারা এতক্ষণ যে ভাবে শিশুসুলভ চপলতা নিয়ে অরণ্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তেমনটি আর তাদের মধ্যে রইল না। তারা যে যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় কিছুক্ষণের জন্য নিমগ্ন হয়ে রইল।

দরিদ্র দর্জির ছেলে মেয়েদের বিশেষ লেখা পড়া হয় না, তবু দর্জি গ্রামের পাঠশালায় তাদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করল। কুয়াশার লেখাপড়ার দিকে তেমন নজর না থাকলেও তার আশা আকাঙ্খা ছিল প্রবল। তাই সে সব সময় বড় হবার স্বপ্ন দেখতো। ধনী আর বুদ্ধিমান মানুষের সঙ্গে মেলা মেশা করত। এমনি করে এক বণিকের ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হল।

বাবার অনুমতি আর মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে একদিন কিশোর কুয়াশা সওদাগরের ছেলের সাথে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিল। বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে সবুজদ্বীপে এসে হাজির হল তাদের জাহাজ। কুয়াশা সওদাগরপুত্রের সাথে যাবে রাজদর্শনে। কিন্তু সে দেশের ভাষা তাদের জানা নেই। মুস্কিলে পড়ল তারা। কুয়াশা জাহাজ থেকে নেমে ইশারা ইঙ্গিতে সেখানকার লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। ওদের নানা রকম ছোট খাটো উপহার দিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে তাদের মুখের ভাষা আয়ত্তে এনে ফেলল। তারপর গেল রাজদর্শনে।

বৃদ্ধরাজা অবসর নিয়ে রাজ-কার্য থেকে বিরত হয়েছেন। তিনি গেছেন তীর্থ ভ্রমণে। যুবরাজ তামুকাড়ে সিংহাসনে আরোহন করেছে। বয়সে প্রায় কুয়াশার মতই হবে। এক বিদেশি সমবয়সী যুবককে দেখে যুবরাজতো খুব খুশি হল। তার হাত ধরে সে দেশের রীতি অনুযায়ী মাথায় হাত দিয়ে সম্মান জানাল। বাংলাদেশের কথা, ভারতবর্ষের কথা তার কাছে জানতে চাইল। জানাল তাদের দেশের সব রকমের ভাল জিনিসের কথা, তাদের নানান সমস্যার কথা, আরো জানতে চাইল এধরণের সমস্যায় এদেশে কেমন করে সমাধান করা হয়ে থাকে। মোটকথা তামুকাড়ে এক বিদেশী বন্ধু তথা মন্ত্রী পেল।

যেহেতু বণিকপুত্র ও অন্যান্য সকলে সেদেশের ভাষা বুঝতে পারে না তাই তাদের পক্ষে মানুষ জনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে কুয়াশার মাধ্যমে করতে হতো। ব্যবসা বানিজ্য চালাতে হত তারই মাধ্যমে। বনিকপুত্র বা অন্যরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের ভাষা আয়ত্ত করতে পারল না। কুয়াশা সাহায্য করাতেও সামান্য কয়েকটি শব্দ ছাড়া বিশেষ কিছু হল না। কারণ একটা ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করতে হলে যে পরিমান উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। আর সেদেশের ভাষার সঙ্গে ভারতীয় ভাষার কোন মিল ছিল না।

যুবরাজ তামুকাড়ে রাজদরবারে একটা স্থায়ী আসন করে দিল কুয়াশাকে। কুয়াশা হল দেশের দ্বিতীয় মন্ত্রী। কিন্তু যে কোন সমস্যায় তামুকাড়ে কুয়াশার সঙ্গেই পারামর্শ করে

অথবা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলেও কুয়াশা যে বিধান দেয় তাই মেনে নেয়। তাতে মন্ত্রী আকিহুতোর খুব রাগ হতে লাগল।

তামুকাড়ের একটি বোন ছিল, তার নাম তানাসিকো। তানাসিকো যেমন সুন্দরী তেমনই বুদ্ধিমতি। সেদেশের রীতি অনুযায়ী রাজকুমারীদের হয় অন্যরাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হতো অথবা যুবক মন্ত্রী থাকলে তার সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু মন্ত্রী আকিহুতোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, আর তানাসিকো নিতান্ত কিশোরী।

সেদেশে পুরুষ অথবা নারীর বহুবিবাহের চল আছে। কোনও নারী একসঙ্গে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করতে পারতো, আর পুরুষের বহুবিবাহতো আমাদের দেশেও চালু ছিল। কিন্তু রাজপরিবার কিংবা অভিজাত বংশে কেবল পুরুষরাই একাধিক বিবাহ করত। নারীরা আমাদের দেশের মত কেবল একজনকে বিবাহ করত।

সমস্যা হল কোন নারী যদি দু'টি বা তিনটি বিবাহ করে এবং তাদের স্বামীরাও দু'তিনটি করে বিয়ে করে তাহলে কে থাকবে কার ঘরে। কে কার ভরণ পোষণ করবে। প্রতিদিন এই নিয়ে রাজ দরবারে নানা অভিযোগ আসে। বৃদ্ধ রাজা থেকে শুরু করে যুবরাজ তামুকাড়ে, মন্ত্রী আকিহুতো কেউই এই সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান করতে পারে নি। এই নিয়ে রাজ্যের মধ্যে নিত্য অশান্তি। জটিলতা সৃষ্টি হল আইন শৃঙ্খলা আর সামাজিক পন্থা পদ্ধতি নিয়ে।

যুবরাজ তামুকাড়ে তার এই সমস্যার কথা কুয়াশাকে বলল। কুয়াশা বলল বন্ধু তোমাদের দেশের সমস্যা অতি প্রাচীন এবং জটিল। সুতরাং এর সমাধান করতে হলে সময় লাগবে। সারাদেশ ঘুরে দেখতে হবে। কথা বলতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, থাকতে হবে তাদের মধ্যে। তার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তুমি বরং সাধারণ মানুষের বেশে তাদের মধ্যে যাও। তাদের সঙ্গে কথা বল। তার পর সিদ্ধান্ত নেবে।

সেইমত বাঙালী পোশাক পরে কুয়াশার সঙ্গী সেজে তামুকাড়ে চলল নিজের দেশ ভ্রমণে। আনন্দে ভরে উঠল তার মন। রাজপুত্র হওয়ার সুবাদে জন্ম থেকে রাজপ্রাসাদের বাইরে রক্ষী স্তাবক পরিবৃত না হয়ে কখনো কোথাও যাওয়া হয়নি। দেখা হয়নি নদী খাল বিল, গাছে ফুটে থাকা নাম নাজানা ফুল। কথা বলা হয়নি কোন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ ভাবে। রাজসভায় রজকীয় মর্যাদায় অভিবাদন করে মর্জিত ভাষায় তাদের কথা বলতে দেখেছে। দেখেনি কলস্বনা নদীর তীরে যুবতীদের রঙবেরঙের ঘাঘরা পরে কলসি করে জল আনতে যেতে। তাদের সাধারণ রঙ্গ তামাশা কখনো শোনে নি। গাছের ডালে বসে রাখাল বালকের উৎফুল্ল প্রাণখোলা সুরে বাঁশের বাঁশি শুনে তামুকাড়ে এতই খুশি হল যে তাকে ডেকে নগদ একটি স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিল।

দেখে কুয়াশা বলল, একি করছ। লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে। তা হলে তোমার ছদ্মবেশ আর থাকবে না। লোকে তোমাকে তাদের মনের কথা খুলে বলবে না। সুতরাং আবেগকে সংযত করতে হবে।

তামুকাড়ে এতদিনে কুয়াশার কাছথেকে বাংলা ভাষা শিখে ফেলেছে আবার কুয়াশাও সেদেশী তক্কড়ি ভাষায় আরো পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। এখন সে সেদেশের মানুষের মত

সরল সহজ ভাবে তাদের ভাষা বলতে পারে, বুঝতে পারে। আর যুবরাজের সঙ্গে গোপন পরামর্শ চলে বাংলা মাধ্যমে।

যে বণিক দলের সঙ্গে কুয়াশা এসেছিল ভাষা বুঝে কাজ করতে তাদের অসুবিধা হলেও ব্যবসা বানিজ্য মন্দ হল না। তাদের সমস্ত পন্য বিক্রি হয়ে গেল। তার পর এদেশী জিনিসপত্র জাহাজে বোঝাই করে কুয়াশাকে দেশে ফিরে যেতে বলল। কিন্তু কুয়াশা যেতে রাজি হল না। সে রয়ে গেল সবুজ দ্বীপে।

দুই

পরে বলছি কুয়াশার কথা। কুমারী বিদিশা বড় হয়েছে। সে যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী হয়েছে। মাথায় এক ঢাল কালো চুল। মুখশ্রীতে লাবণ্য ফুটে উঠেছে। বান্ধবীদের সঙ্গে নদীতে স্নান করে, ফুলের সাজে সেজে ওঠে। হাতে পরে কুসুম বলয়, খোঁপায় বেল ফুলের মালা, কানে ঝুম্‌কো লতার দুল, ঠিক যেন ফুল পরীটির মত সাজে ওরা। তারপর সকলে মিলে যায় শিব মন্দিরে, একলিঙ্গ স্বামীর পূজা দিতে। সকলের মধ্যে বিদিশা যেন অনন্য সুন্দরী।

এক দিন সেই মন্দিরে এল এক বিদেশী যুবক। ঘোড়ায় চেপে এসে দাঁড়াল একলিঙ্গ স্বামীর মন্দিরের পাশের চাঁপা গাছটার তলায়। দেখা হল বিদিশা আর তার সখিদের সঙ্গে। তারপর সেও মন্দিরে পূজো দিয়ে চলে গেল। পরদিন ঠিক সেই সময় আবার বিদিশা আর তার সখির দল যখন মন্দিরে এল, তখন এল সেই যুবকও। আজ সে প্রসাদ চাইল বিদিশার কাছে। দেবতার মন্দিরে কেউ প্রসাদ চাইলে তাকে দিতে হয়। বিদিশাও দিল প্রসাদ।

এভাবে দিনের পর দিন দেখা হতে লাগল। এক দিন সেই যুবক বিদিশাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। বিদিশা লজ্জায় মাথা নত করল। সম্মতি অসম্মতির কথা জানাতে পারল না। তাতে কি হবে, সখিরা সমস্বরে হেসে উঠল। তখন তার মুখখানি আরো লাল হয়ে উঠল। ছুটে পালাল বিদিশা। সখিরা তাকে অনুসরণ করল। যুবক ঘোড়ায় চেপে চলে গেল।

পরদিন বিদিশা সত্যিই দিশা হারিয়ে ফেলল। বিয়ের কথা ছাড়া আর তার মনে কিছুই রইল না। কিন্তু লজ্জায় মা বাবাকে কিছুই বলতে পারল না। সেদিন সখিদের সঙ্গে যখন মন্দিরে এল তখন তার কণ্ঠে ভাষা নেই, নেই অধরোষ্ঠে সেই মৃদু এবং উজ্জ্বল হাসি। সকলের মধ্যে গুড়ি গুড়ি করে হেঁটে চলেছে যেন বিয়ের কনে বউটি। চাঁপা গাছটার তলায় আগের দিনের মত অপেক্ষা করছিল সেই যুবক। জানতে চাইল তার আগের দিনের প্রশ্নের উত্তর।

সখিরা এগিয়ে এল। মৃদু ভর্ৎসনা করে বলল — তুমি কেমন মানুষ সখা, তোমার কি লাজ লজ্জা নেই। আমাদের সখির মা বাবা আছেন। সমাজ আছে সংস্কার আছে। আছে দেশের একটা আইন কানুনও। বিয়ের প্রস্তাব দিতে হলে তুমি তার মা বাবার কাছে যাও। সাহসের পরিচয় দাও।

পরদিনই এল এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দরজির কাছে প্রস্তাব দিল, নিকটবর্তী রাজ্য প্রবৃদ্ধপুরমের রাজপুত্র বিদিশার পাণি প্রার্থী। ব্রাহ্মণ ভেবেছিল দরিদ্র দরজি হয়তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু হল বিপরীত। দরজি বলল — হোক না রাজপুত্র, বিদেশী যুবকের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। আমার মেয়েকে কোন গরীব দরজির ছেলের

সঙ্গে বিবাহ দেব, তাতে সে সুখে না থাকলেও শান্তিতে থাকবে। রাজপ্রাসাদ আমাদের জন্য নয়। তোমার রাজকুমারকে কোন রাজকুমারীর খোঁজ করতে বল। সে ভুল জায়গায় এসেছে। আমরা গরীব হতে পারি তবু লোভী নই।

ব্রাহ্মণ বললেন — ভেবে দেখ, মেয়ে রাজরাণী হবে।

— ভেবেই বলছি। আজ রূপের মোহে এক যুবক যাকে ভালবাসছে কাল রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাকে খেলার শেষে মলিন পুতুলের মত কোন আলমারিতে বা কোন ঘরের কোনে আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেবে। রাণীতো দূরের কথা স্ত্রীর মর্যাদাও সে পাবে না। তুমি যাও।

হিংসে হচ্ছিল ব্রাহ্মণেরও। সামান্য দরিদ্র দরজির মেয়ে রাজরাণী হবে সেটা তার মোটেই প্রাণে সইছিল না। তাই সে গিয়ে রাজপুত্রের কাছে নানা প্রাকার কটুকথা বানিয়ে বানিয়ে বলল। বলল — ' দরজি বলেছে, রাজপুত্র না ছাই, কোথাকার কে, চাল চুলো নেই। হতচ্ছাড়া কোথাকার। তাকে যেতে বল। আমার এমন সুন্দরী মেয়ে দেখে যে লোভ সামলাতে পারে না, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' আরও কতকি কটু কথা বলল তার ইয়ত্তা নেই। শুনেতো রাজপুত্র রেগে আগুন হয়ে উঠল। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেল।

বাবা আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সব কথা আড়াল থেকে শুনেছিল বিদিশা। পরদিন সকালে এল সখিরা। যেতে ইচ্ছে নেই তবু জোর করে নিয়ে গেল নদীতে স্নান করতে। সেকালে মেয়েদের প্রকৃত আড্ডা দেবার একটা যায়গা ছিল নদী বা পুস্করিণীর ঘাট। সেখানেই হত যত হাসি মস্করা যত কথা আলোচনা। তাই বিদিশা না গেলে চলে? যেতে হল তাকে। কিন্তু বিদিশার সারা অন্তরটা জুড়ে রইল সেই যুবক। তখন কি ছাই জানতো যে সে যুবক একজন রাজপুত্র। তা হলেকি আর তাকে সে ভালবেসে মরত? বাবাতো ঠিকই বলেছেন, রাজার ঘরে কি দরজির মেয়ে মানায়?

কিন্তু না জেনে যাকে মন দিয়েছে, জেনে তা তো আর সেই মন ফেরৎ নেওয়া যায় না। সত্যিইতো রাজপুত্রের সাথে এক দরিদ্র দরজির পরিবারের আত্মীয়তা হয় না। তাই অতি লোভ ভাল নয়। কিন্তু মনকে কোন মতে প্রবোধ দিতে পারছে না। আর এক বার দেখা হবার আশা নিয়ে চলল মন্দির প্রাঙ্গনে। কিন্তু চাঁপাতলা আজ শুন্য। কেউ নেই। চোখ ফেটে জল এল বিদিশার। সখিদের কাছে তার মনের কথা গোপন রইল না।

ইতিমধ্যে পাড়ায় পাঁচকান হয়েছে। বিদিশাকে বিবাহের জন্য রাজপুত্র প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু দরজির দেমাক, সে তার মেয়েকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয় নি। এমন মূর্খও দেশে আছে? সখিদের কেউ কেউ মনে মনে হিংসে করতে লাগল। কেন? রাজপুত্র কি বিদিশা ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারতো না। মানছি বিদিশা অপূর্ব সুন্দরী, তা বলে তারাও কিছু কম নয়। আর বিদিশার বাবাটাই বা কেমন? রাজপুত্রকে হাতের কাছে পেয়ে অবহেলা!

ঠিক দশ দিন পার হল। একাদশ দিনের দুপুর বেলায় বিদিশা মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিজের ঘরে শুয়ে যুবকের কথা মনে করে কাঁদছে নীরবে নিভৃতে। এমন সময় রাজার

পাইক বর্কন্দাজরা দরজির ঘর ঘিরে ফেলল। ধরে নিয়ে গেল বৃদ্ধকে। রাজার হুকুম -- বাড়ির ভিতর থেকে কারো বাইরে যাবার অনুমতি নেই। কি সর্বনাশ!

রাজ কর্মচারীরা দরজিকে রাজার সামনে উপস্থিত করল। ক্রুদ্ধ মহারাজ প্রশ্ন করলেন -- তোমার এক বিবাহ যোগ্যা কন্যা আছে, তার নাম বিদিশা?

-- হ্যাঁ, মহারাজ।

-- কুমার ধৃষ্টদেব তার পাণিপ্রার্থী হয়ে তোমায় খবর পাঠিয়ে ছিলেন। আর সে প্রস্তাব তুমি খারিজ করেছ অথচ আমাকে জানাও নি। তোমার এত আস্পর্ধা কি করে হল?

-- মহারাজ আমি কন্যার পিতা। কন্যার ভাল মন্দ বিচার বিবেচনা করার অধিকার আমার আছে। তাই আমি মেয়ের ভাল যাতে হয় তাই ভেবে রাজপুত্রের প্রস্তাব বাতিল করেছি। কুমার ধৃষ্টদেব তো প্রস্তাবটা আপনার মাধ্যমে দেন নি। আপনি দেশের রাজা, অপর রাজ্যের রাজপুত্র নীতি অনুযায়ী তাঁর বাসনা তিনি রাজার মাধ্যমে জানাতে পারতেন। তা না করে কাজটা কি তিনি ভালো করেছেন? এতে তো আপনারও অসম্মান।

-- হ্যাঁ, পিতা হিসাবে কন্যার অভিভাবক তুমি কিন্তু সেটা সাধারণ সময় এবং এই রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে। কিন্তু এখন প্রবৃদ্ধপুরম আমাদের রাজ্য আক্রমন করেছে। যুদ্ধ শুরু হয়েছে। দু'পক্ষের সৈন্য মরছে। যুদ্ধ হলে দেশের ক্ষতি; প্রজাদের উপর কর বসবে, পরাজিত হলে সৈন্যরা লুঠতরাজ করবে, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। জয় হলেও যুদ্ধের খরচ মেটাতে হবে সেই প্রজাদের। দেশের তরতাজা যুবকদের প্রাণ দিতে হবে। তাই আমি সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছি, উপযুক্ত পণ যৌতুক দিয়ে বিদিশাকে রাজপুত্রের হাতে তুলে দেব।

দরজি হাত যোড় করে বলল -- মহারাজ, আমার কন্যাকে আমি কোথায় বিবাহ দেব সেটা এক প্রশ্ন কিন্তু এক বিদেশী রাজ্যের কাছে মাথা নত করে এক গরীব মেয়েকে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে এ বা কেমন কথা?

-- বিবাহ যোগ্যা কন্যার বিবাহের আয়োজন করাই বিধান। সে ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধপুরমের রাজপুত্র কোন অযোগ্য পাত্র নয়। তাছাড়া, রাজনীতির তুমি কি বোঝ? অলংকার বস্ত্র সহ শিবিকা যাবে তোমার বাড়িতে। উপযুক্ত সাজ সজ্জা করে বিদিশাকে শিবিকায় তুলে দেবে। আর তার সঙ্গে যাবে বিদিশার তিন সখি যৌতুক হিসাবে। তাদের অভিভাবকরা সকলে একে সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। মেয়েরাও খুশি, কিন্তু কেন জানি না তুমি এতে সুখি হতে পারছো না।

দরজি হাত জোড় করে কী যেন বলতে চাইছিল, রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন -- আর কোন কথা নয়। কাল প্রভাতে বিদিশাকে শিবিকায় তুলে দিতে হবে। যদি আপত্তি কর তাহলে তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তোমার মেয়েকে কেড়ে নেওয়া হবে।

গরীব দরজি কি আর করে, রাজার আদেশ মেনে নিতে হল। কিন্তু বিদিশা এতক্ষণ যার জন্য চোখের জল ফেলছিল এভাবে জোর করে কেড়েনেবার প্রস্তাবে তার মন সায় দিল না। কিন্তু সেওতো নিরুপায়। যথাসময়ে তিন সখি পরিবৃতা হয়ে রাজপোশাকে, অলংকারে ভূষিতা হয়ে বিদিশা রাজ দরবারে হাজির হল। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এসে বিদিশা ও

তার সখিদের বললেন -- মা তোমরা ভাগ্যবতী। কেবল রাজপুত্রকে বিবাহ করছ বলে নয়, তোমরা দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছ। তোমাদের কোন অমর্যাদা হলে গোটা রাজ্য রইল তোমাদের জন্য। তোমাদের অপমান মানে সারাদেশের অপমান তাই প্রয়োজন হলে দেশের সৈনিকরা লড়বে তোমাদের জন্য। তবে তা হবার কথা নয়, কারণ তোমাদের পছন্দ করেই রাজপুত্র বিবাহ করছে। যে দিন রাজপুত্র যুবরাজ হবে, সেদিন আমাদের দেশের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত থাকবে। তোমাদের কোন ভয় নেই।

তিন

বিদিশা আর তার সখিরা চলেগেল প্রবৃদ্ধপুরমের পথে। এবার শোন প্রত্যাশার কথা। দাদা বিদেশ থেকে এখনো ফেরে নি। ফিরেছে তার সঙ্গিসাথীরা। তারা খবর দিয়েছে সবুজদ্বীপের রাজার সঙ্গে কুয়াশার বন্ধুত্বের কথা। কিন্তু কুয়াশা কবে ফিরবে সে খবর দিতে পারে নি। বোন চলে গেল রাজবধূ হয়ে, ঘরে রইল একা প্রত্যাশা।

পিতা মাতা ঠিক করলেন কোনো এক সাধারণ দরজির মেয়ের সঙ্গে প্রত্যাশার বিবাহ দেবেন। সে থাকবে আর পাঁচটা দরজির ছেলের মত। এদিকে, এই দরজি পরিবারের কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক ভাই সবুজদ্বীপের রাজার বন্ধু, মেয়ে রাজরাণী হয়ে চলে গেল। সুতরাং এহেন পরিবারকে কে না চেনে। কিন্তু তাদের দুর্দশা যে আগের মতই রয়েছে সেটা মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না। সত্যকে কে কবে সহজভাবে বিশ্বাস করেছিল?

জামালি অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু বড়ই নির্বোধ আর সরল। রূপের সঙ্গে তার বুদ্ধির মিল নেই। তার সঙ্গে সম্বন্ধ করা হল প্রত্যাশার। জামালির রূপ দেখে প্রত্যাশাতো মুগ্ধ। সে ও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। যথা নিয়মে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বিবাহ হল জামালির সঙ্গে প্রত্যাশার। ঘরে নব বধূ এল। হাসি ফুটল বাবা মায়ের মুখে। এক ছেলে আর মেয়ে বিদেশ বিভুঁয়ে কোথায় কেমন আছে তার ঠিক নেই, তাই স্নেহের বৌমাকে বড় ভালবাসেন দরজি দম্পতি।

দরজি কাপড় সেলাই করে। চোখের জ্যোতি কমেছে। তখনকার দিনে এমন কাপড় সেলাইয়ের কল ছিল না। ছুঁচ সুতো দিয়ে সেলাই করতে হতো, নক্সা করা হতো। কিন্তু দরজির হাত ছিল খুব পাকা। তার হাতের তৈরী পোশাক আষাক রাজা, জমিদার, রাজপুরুষেরা ব্যবহার করতেন। তাই তার দাম ছিল ভাল। বুড়ো পোশাক তৈরী করত আর প্রত্যাশা সেই পোশাক বড় বড় দোকানে, বাজারে সরবরাহ করে আসতো। এমনি করে আগের মতো তাদের সংসার চলে যায়।

এক দিন জামালি দেখে বৃদ্ধ দরজি কি যেন খুঁজছে। জামালি বলল -- বাবা, আপনি কি খুঁজছেন?

দরজি বলল - মা'রে, আমার লাখটাকার সম্পত্তি।

আর অমনি জামালি সেটা নিয়ে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখল। এমনি করে যখন তখন বুড়ো খোঁজে কিন্তু পায় না। পাবে কি করে, আসলে জামালিতো লুকিয়ে রেখেছে।

একদিন প্রত্যাশাকে বলল জামালি -- তুমি আলাদা থাক। কেন এই দরিদ্র সংসারের ঘানি টানছো? পৃথক হয়ে আমরা সুখে শান্তিতে থাকব।

প্রত্যাশা বলে -- তা কি করে সম্ভব? আমার তো কোন আয় রোজগার নেই। বাবা পোশাক বানিয়ে দেন, তাই আমি বাজারে বেচি। আর আমি যে পোশাক বানাই সেতো তেমন ভাল নয়। তাই তার দামও ভাল পাওয়া যায় না। আলাদা হয়ে থাকলে সুখে স্বাচ্ছন্দে কেন, তোমাকে দু' মুঠো ডাল ভাতও খাওয়াতে পারব না।

শুনে জামালি বলল -- কেন? আমি কি এতই বোকা, জান আমার কাছে যা আছে তার দাম এক একটা লাখ টাকা।

শুনে তো প্রত্যাশার মন উতলা হয়ে উঠল। বলল -- কৈ দেখাও দেখি তোমার কাছে কি আছে!

জামালি বলল -- কেন? আগে দেখাবো কেন? তুমি আগে পৃথক হও তার পরে বলব। নৈলে তুমি সেই সব সম্পত্তি তোমার বাবা মাকে দিয়ে দেবে।

এমনি করে প্রতি রাতে শোবার সময় জামালি প্রত্যাশাকে বলে। প্রত্যাশাও লাখটাকার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু জামালির কথায় নির্ভর করতে পারে না। তাই একদিন গোপনে সব কথা তার মাকে বলল প্রত্যাশা। মা বললেন -- দেখ দেখি, তোর বৌ'র কাছে কি আছে। না হয় পৃথক হবার ভান করে তুই আলাদা হয়ে যা। তার পর বোঝা যাবে জামালির কাছে কি আছে! হতে পারে বাপের বাড়ি থেকে আসার সময় কিছু নিয়ে এসে থাকবে।

বাংলা দেশের বৌয়েরা যৌথ পরিবার ভেঙে দেয়, এ বদনাম চিরদিনের। মা মনে মনে ভাবলেন, বৌমাকে আমরা এত ভালোবাসি, অথচ তার কাছে যদি সত্যিই কোন সম্পদ থাকে, তা হলে সে তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে নিজেরা ভোগ করতে চায়। তবু স্নেহের বশবর্তী হয়ে, কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোনো কটু কথা বললেন না। মায়ের কথা মতো ব্যবস্থা করে প্রত্যাশা পৃথক সংসার করল। রাতের বেলা হাসি হাসি মুখ করে প্রত্যাশা জামালিকে জিগ্গেস করল -- কৈ কি রেখেছ দাও?

'দেবো তো এত অস্থির কিসের?' বলেই হংস গমনে হেলতে দুলতে চাবি এনে তার বাপের বাড়ি থেকে দেওয়া বিশাল পেঁটরাটা খুলল। ধীরে সুস্থে অতি সাবধানে একটি কৌটো এনে খাটের উপর রাখল। তারপর খুলে দেখালো তার শ্বশুরের হারিয়ে যাওয়া ছুঁচগুলো।

প্রত্যাশা এবার প্রকৃত পক্ষে হতাশ হল। বলল -- এগুলো কি হবে?

-- কেন? বাবা যে বলেন 'হায় আমার লাখ টাকার সম্পত্তি!'

জামালিকে মৃদু তিরস্কার করে মায়ের কাছে গিয়ে ভাঙা সংসার আবার জোড়া দিয়ে সে যাত্রা কোন রকম সামাল দিল প্রত্যাশা। মা তাঁর বৌমার যুগপৎ নির্বুদ্ধিতা ও ছেলেমানুষি দেখে একটু হাসলেন। কিন্তু তিরস্কার করলেন না। বরং উপদেশ দিয়ে বললেন -- 'এত বোকা হলে সংসারে চলে মা?' নিজের বোকামি ধরা পড়ায় লজ্জা পেলো জামালি।

চার

এদিকে কুয়াশা যুবরাজ তামুকাড়ের সঙ্গে সারা রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তামুকাড়ে দেখে অবাক হল নিজের রাজ্যকে। রাজ্যের জলে-জঙ্গলে, মাঠ ঘাট নদীতে এত সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে আছে তা সে নিজেই জানত না। জানত না তার প্রজাদের সুখ দুঃখ আনন্দ ভালবাসার কথা। ভীষণ দুঃখের মধ্যে রাজ্যবাসীরা সামান্য আনন্দ খুঁজে নেয়, কিন্তু রাজপুরুষেরা তাদের ওপর নানাপ্রকার অত্যাচার করে, তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়। বহু বিবাহের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের দাম্পত্য জীবন নষ্ট করে দেয়।

তামুকাড়ে বলল — বন্ধু, এখন কি হবে?

কুয়াশা বলল — তুমি তোমার রাজসভায় একটা পরিষদ তৈরী কর। যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধি থাকবে। তারা তোমাকে রাজ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে। তাহলে তুমিও রাজ্যের মানুষের কথা সঠিক ভাবে জানতে পারবে। প্রতি বছর সেই লোকেদের পরিবর্তণ করবে। কারণ অনেক দিন একই ব্যক্তি রাজসভায় থাকলে নানা প্রকার দুর্নীতি করার সুযোগ পাবে। আর আইন করে দাও এক স্ত্রী বা স্বামী থাকতে প্রজারা আর বিবাহ করতে পারবে না। আর যারা এখন একাধিক বিবাহ করেছে, তাদের নির্ধারিণ করে একজন পুরুষকে বেছে নিতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে ভরণ পোষণ দেবে।

তামুকাড়ে কুয়াশার কথা মত সব রকম ব্যবস্থা করল। তাতে অনেক দিনের অব্যবস্থার অবসান ঘটল কিন্তু যে সমস্ত রাজপুরুষ এত দিন এই অব্যবস্থার সুযোগ নিত, তারা কিছুটা বিরূপ হল। তারা রইল সুযোগের অপেক্ষায়।

এত দিনে কুয়াশার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তানাসিকোর। সেও তাদের সঙ্গে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ে রাজ্য ভ্রমণে, যেটা আবার মন্ত্রী আকিহুতোর পছন্দ নয়। তার ইচ্ছে সে রাজকুমারী তানাসিকোকে বিয়ে করে। কিন্তু সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে, সেটা হবার নয়, কারণ তামুকাড়ে কিছুতেই তার সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দেবে না। বয়সের বহু গুণ বড়। তাই এই প্রৌঢ়ের চেয়ে সে তার যুবক বন্ধু কুয়াশার সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করবে। কোনও পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব আসে নি। তবু কেন যেন সকলে জেনে গেছে। তাই আকিহুতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সমুদ্রের মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেক দ্বীপ আছে, যেখানে কোন সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা নেই। সেই সব দ্বীপের অধিবাসীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এক দ্বীপের মানুষ অন্য দ্বীপের উপর চড়াও হয়। লড়াই বাধে। আর বাইরের থেকে কেউ গেলে তাদের আক্রমণ করে। যার ফলে সেই সব দ্বীপে কেউ যেতে পারে না।

কুয়াশা রাজ্যের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু মানুষকে যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করিয়ে তাদের সাথে নিয়ে এই সব দ্বীপে যাবার জন্য মনস্থ করল, প্রস্তাব শুনে তানাসিকো বলল — ওখানে অনেক হিংস্র প্রকৃতির মানুষ বাস করে, তাদের মধ্যে অনেকে নর-খাদক। মানুষে পশুতে বড় বেশি তফাত নেই। যদি যেতেই হয় আমিও সাথে যাবো।

প্রবোধ দিয়ে কুয়াশা বলল -- তুমি নিশ্চিন্ত থেকো আমার কোন বিপদ হবে না। আমি কথা দিচ্ছি কোন বিপদের ঝুঁকি আমি নেব না।

তানাসিকো বলল - ঠিক আছে, তুমি কথা দাও, দেশে ফেরার সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

তানাসিকোর মনের কথা বুঝতে দেরি হলনা কুয়াশার। কুয়াশারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু তানাসিকো যে রাজকন্যা। তাই সে অকপটে বলল -- নিয়ে যেতেতো আমার আপত্তি নেই কিন্তু তুমি জান, আমি এক সামান্য দরজির ছেলে। আমাদের কুঁড়ে ঘর। তারচেয়ে মন্ত্রী আকিহুতোকে বিবাহ কর। সুখে থাকবে।

তানাসিকো প্রত্যুত্তরে কেবল মাথা নীচু করে নীরবে কাঁদতে লাগল। তার চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল। চমকে উঠল কুয়াশা। সস্নেহে চোখের জল মুছে দিয়ে বলল -- আচ্ছা তোমার কথাই রইল। তুমি রাজকন্যা, তা তোমার কথাই আদেশ। তোমার আদেশ মেনে নিলাম।

তানাসিকো তাড়াতাড়ি কুয়াশার মুখ চেপে ধরে বলল -- শপথ করো, আর কোনদিন একথা বলবে না।

-- কোন কথা?

-- আকিহুতোকে বিয়ে করার কথা। আমি রাজকন্যা নই, হতে চাই না যুবরাণী। আজ থেকে আমার একটাই পরিচয়, আমি তোমার স্ত্রী, তোমার বাংলাদেশের এক গরীব দরজি পরিবারের গৃহ বধূ।

এরপর কুয়াশার কি আর করার থাকতে পারে। কথা দিল -- দেশে ফেরার সময় তোমাকে বিবাহ করে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় বাড়ি নিয়ে যাবো।

তানাসিকো ছুটে গিয়ে দাদাকে তাদের কথা জানাল। তামুকাড়ে কুয়াশাকে ডেকে বলল -- বন্ধু আমার বোন ঠিক কাজই করেছে। আমিও তাই চেয়েছিলাম। এসো তোমাদের বিয়ে দিই।

কুয়াশা বলল -- না, এখনো সময় আসে নি। আমার অনেক কাজ বাকি। ঘুরে দেখতে হবে সব দ্বীপ। বড় হতে হবে জীবনে। জয় করতে হবে ভাগ্যকে। তার পর তোমার জন্য তোমার উপযুক্ত এক সুন্দরীর খোঁজ করতে হবে। তখন একই লগ্নে দু'জনে বিবাহ করব।

তামুকাড়ে আর তানাসিকোর কাছথেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করল কুয়াশা। গেল অপেক্ষাকৃত বড় একটি দ্বীপে। বাধা পেল প্রাথমিক ভাবে। বল্লম, টাঙ্গি, তোমব, লাঠি নিয়ে হিংস্র অরণ্যবাসীরা আক্রমন করল কুয়াশার লোকজনদের। কিন্তু কুয়াশার প্রশিক্ষিত সৈনিকের সঙ্গে তারা পেরে উঠল না। সহজে পরাস্ত হল। পাশাপাশি দ্বীপের মানুষের ভাষা প্রায় একই রকম। তারা নিজের ভাষা এদের মুখে শুনতে পেয়ে আশ্বস্ত হল। তাদের কাছে গিয়ে কুয়াশা ও তার সঙ্গী সাথিরা নানা প্রকার পোশাক আষাক, রান্নাকরা খাবার দিল।

সুন্দর পোশাক, সুন্দর খাবার, অলঙ্কার পেয়ে তারা মহা খুশি। তাদের সঙ্গে মিশে সব গোষ্ঠির মধ্যে একটা আপোস রফা তৈরী করে দিল কুয়াশা। কুয়াশাকে তারা দলনেতা বলে

মেনে নিল। ফলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কমে গেল। অবশেষে কুয়াশাকে রাজা বলে ঘোষণা করা হল। সবুজদ্বীপের যুবরাজ তামুকাড়ে নিজে উপস্থিত থেকে কুয়াশার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিল, দ্বীপের নাম দিল অবুঝদ্বীপ। দুই বন্ধু দুই দ্বীপ রাজ্যের রাজা। এই অনুষ্ঠানে সব চেয়ে আনন্দ পেল তানাসিকো।

কুয়াশা দেখল অঢেল বনজ সম্পদ চারিদিকে রয়েছে। মধু, মশলা, নানা প্রকার সুগন্ধি লতা, চন্দন, মেহগিনি নানা রকম নামী দামী কাঠ। সেই সব জিনিস পত্র জাহাজ ভর্তি করে দেশে পাঠাল প্রত্যাশাকে। দেশের বন্দরে জাহাজ থামল। কুয়াশার লোক জন প্রত্যাশার খোঁজ করে তার হাতে কুয়াশার চিঠি তুলে দিল। প্রত্যাশা হঠাৎ হাতে স্বর্গ পেল। এতটা সে কোনো দিন প্রত্যাশা করতে পরে নি। রাজ্যের মধ্যে বাজারে সে এই সব জিনিস পত্র বিক্রি করতে লাগল।

নিজের রাজ্য তামুকাড়ের জিম্মায় রেখে কুয়াশা নিজে একটা জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অন্য দেশে। কিছু দিন বাদে সে ফিরে এল নিজের দেশে, সুবুদ্ধপুরে। বহু অর্থের মালিক অবুঝ দ্বীপের রাজা কুয়াশা এসে মা বাবাকে প্রণাম করল।

পাঁচ

এদিকে প্রবৃদ্ধপুরমের যুবরাজ বিদিশা আর তার সখিদের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে করলেও তাদের এক রকম বন্দী করে ফেলেছে। তাদের একটা প্রকোষ্ঠে আটকে রেখেছে। দরজির উপর প্রতিশোধ নিতে সে এদের ওপর দারুণ মানসিক আর শারীরিক অত্যাচার শুরু করল। অশোক বনে সীতার চার পাশে যেমন করে চেড়িদের নিয়োগ কথা হয়েছিল, তেমনি বিদিশা ও তার তিন সখির চারদিকে বৃদ্ধা দাই আর দাসীদের নিয়োগ করল। তারা সব সময় এদের গঞ্জনা যাতনা দিতে লাগল। এমনকি মারধরও করছে।

চার চারটি কিশোরী, কেবল নিজের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর তাদের কোন উপায় নেই। তিন সখি বলল ভাই বিদিশা, তোমার বাবাই ঠিক চিন্তা করে ছিলেন। রাজপুত্র কখনো আমাদের মতো সাধারণ মেয়েকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে না। তবু ভাল হতো যদি কোন সাধারণ যুবককে বিয়ে করে কুটিরে থাকতে পারতাম।

রাজার চর সংবাদ নিয়ে এল। বিদিশার এই অবস্থার কাহিনী শুনে সুবুদ্ধপুরের রাজা অসহায় বোধ করতে লাগলেন। একি কাণ্ড! এক রাজপুত্রের এ আবার কি রকম ব্যবহার? কিন্তু সামান্য ঘটনার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ মোটেই ভাল কথা নয়। আবার বিদিশার অপমান মানে তো গোটা রাজ্যের অপমান। তাই তিনি কুটনীতির অশ্রয় নিলেন। রাজ্যে জামাতা হিসাবে আমন্ত্রণ জানালেন ধৃষ্টদেবকে, সৌজন্য সাক্ষাৎকারের জন্য।

ধৃষ্টদেব তো এল না, উপরন্তু সে যুগের রীতি অনুযায়ী দূতের মস্তক মুণ্ডন করে মাথায় ঘোল ঢেলে, অপমান করল। সেই ন্যাড়ামাথা রাজদূত দেশে ফিরে এলে রাজা মন্ত্রণা সভা আহ্বান করলেন। সেই দিনই খবর এল, বিশাল বিশাল জাহাজ নিয়ে অবুঝদ্বীপের রাজা রাজ্যের প্রধান বন্দরে এসে হাজির হয়েছেন। রাজকীয় মর্যাদায় রাজা অবুঝ দ্বীপের রাজাকে বরণ করে আনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর বরণ ডালা সহ রাজ্যের প্রধান নর্তকীকে পাঠালেন।

রাজকীয় মর্যাদায় সভায় এল কুয়াশা। রাজা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তরুণ রাজাকে সভায় আসন গ্রহন করতে বললেন। কিন্তু কুয়াশা সাধারণ প্রজার মতো রাজাকে অভিবাদন করে বলল -- মহারাজ, সত্য বটে আমি অবুঝদ্বীরে রাজা। কিন্তু আমার আর একটা পরিচয় আছে, সেটা হল আমি এই রাজ্যের এক দরজির ছেলে। সুতরাং আপনি আমার রাজা। আপনি রাজার রাজা। আপনি মহারাজ।

পরিচয় পেয়ে রাজা বললেন -- যুবক, তোমার ভগিনীকে আমি প্রবৃদ্ধপুরমের রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলাম কিন্তু সে পাষণ্ড তাদের সঙ্গে বন্দিনীর মত ব্যবহার করছে। আর আমার দূতের মাথা ন্যাড়া করে আমাকে ও আমার রাজ্যকে অপমান করেছে।

সব শুনে কুয়াশা বলল -- মহারাজ, আপনি আমার গুরুজন, তবু আমি বলব আপনিই ভুলটা করেছেন। কারণ পৃথিবীতে দুর্বলকে কখনো কেউ সম্মান দেয় না। আপনি যদি যুদ্ধ করে ধৃষ্টদেবকে বন্দীকরে তার সাথে বিদিশার বিবাহ দিতেন তাহলে সে যেমন আপনাকে সম্মান দিত, তেমনি বিদিশাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিত। কিন্তু আপনাকে দুর্বল ভেবে সে আমার বোনের উপর অত্যাচার করার সাহস পেয়েছে। সে আমার মাতৃভূমির অপমান করেছে, আমি তাকে সমুচিত শাস্তি দেব। ধৃষ্টদেবের ধৃষ্টতার উপযুক্ত উত্তর সে পাবে।

কুয়াশা নিজের বাড়িতে গেল। লোক পাঠাল সবুজ দ্বীপে সমস্ত সংবাদ দিয়ে। এর পর যুদ্ধের আয়োজন করল। যে কয়েক জন লোক কুয়াশার জাহাজে ছিল তারা বলল, আমরা প্রাণ দিয়ে লড়ব, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি কেবল অনুমতি দিন।

কুয়াশা জানে, অরণ্যবাসী দুর্ধর্ষ মানুষগুলো ভয় কাকে বলে জানে না। তবু সে অপেক্ষা করল সবুজদ্বীপের রাজার জন্য। তিন সপ্তাহের মাথায় এক দ্রুত গামী বজরায় চড়ে কয়েক জন সৈনিক সুবুদ্ধপুরে এসে খবর দিল, দু'শ সৈন্য নিয়ে যুবরাজ তামুকাড়ে রওনা হয়েছেন। সঙ্গে আসছে ভগীনি তানাসিকো।

কুয়াশা এবার বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে রইল প্রত্যাশা, নিজের রাজ্যের সৈন্য আর সবুজদ্বীপ, অবুঝদ্বীপের অরণ্যবাসীরা। প্রবৃদ্ধপুরমের সীমানায় গিয়ে যখন হানা দিল তখন সবাইকে পিছনে ফেলে সবুজদ্বীপ ও অবুঝদ্বীপের সৈন্যেরা গাছের ডাল টাঙ্গি বল্লম তীর ধনু নিয়ে 'হে রে রে .... ' ভীষণ শব্দ করতে করতে ধাবিত হল। তাদের বিচিত্র পোশাক, বিকট শব্দ, দুর্ধর্ষ ব্যবহার দেখে প্রবৃদ্ধপুরমের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে, যেদিকে পারল পালাল। অনেকে ভয় পেয়ে গ্রামবাসীদের অন্তঃপুরে লুকিয়ে পড়ল। যুবরাজ ধৃষ্টদেব পড়ল মহা ফাঁপরে (*বিপদে*)। সৈন্যরা কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। তাদের বক্তব্য, ওরা সব অতিমানব, দানব কিংবা রাক্ষস, তাদের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করতে পারে না। পুরবাসীরা ভয় পেয়ে ফল মূল, মিষ্টি এনে তাদের পূজা করতে লাগল। তাদের বলল -- ঠাকুর, তোমরা ফল মূল খাও, খাও যা তোমাদের খুশি কেবল আমাদের খেয়ো না। মজা হল, প্রবৃদ্ধপুরমের মানুষেরা যেমন সবুজ-অবুঝ দ্বীপের মানুষের ভাষা বোঝে না তেমনি ওরাও তাদের ভাষা বোঝ না। কুয়াশার নির্দেশে তারা একটা ছাউনিতে বিশ্রাম করল। আর সুবুদ্ধপুরের সৈন্যরা গিয়ে ধৃষ্টদেবকে বন্দী করল। তার পর নিয়ে এল নিজের দেশে।

পিছনে আসছে বিদিশা আর তার তিন সখি। তারা যখন সুবুদ্ধপুরের সীমানার ভিতর ঢুকল, তখন রাজার নির্দেশে ধৃষ্টদেবকে মুক্তি দেওয়া হল। তাকে জামাইয়ের মর্যাদায় নিয়ে আসা হল দরজির বাড়িতে। না, আজ আর দরজির সেই কুটির নেই। রীতি মত প্রাসাদে পরিণত হয়েছে।

ছয়

বিচার সভা বসল রাজ প্রাসাদে। নিতান্ত ঘরোয়া সভা, সেখানে কোনো মন্ত্রী বা সভাসদ উপস্থিত নেই, আছেন রাজা নিজে। রাজ পরিবারের লোক জন। কুয়াশার পরিবারের লোক জন, তামাকুড়ে ও তার ভগিনী তানাসিকো।

সুবুদ্ধপুরের রাজা বললেন -- রাজকুমার ধৃষ্টদেব, তুমি স্বেচ্ছায় বিদিশাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলে। তোমার ভালবাসার মর্যাদা দিয়ে যুদ্ধ না করে তোমার সঙ্গে বিদিশা ও তিন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সে সদিচ্ছার অমর্যাদা করেছ। তুমি হলে এই অপরাধের জন্য কি শাস্তি দিতে?

ধৃষ্টদেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল -- মহারাজ, আজ এখানে অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত আছেন। উপস্থিত স্বয়ং মহারাজ, সবুজদ্বীপের যুবরাজ, অবুঝদ্বীপের রাজা আর আমি পরাজিত রাজকুমার। তবু গর্বের সঙ্গে বলব, ভাল মানুষের সান্নিধ্য আমি পেয়েছি। এ রাজ্যের রাজা যেমন মহৎ তেমনি এখানকার মানুষরা। সাধারণ দরজি হলেও তার মেয়েকে সে রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে নির্লোভের পরিচয় দিয়েছে। আর রাজা আমাকে বন্দী করেও নিজের রাজ্যে জামাতার মর্যাদায় আমার শ্বশুরালয়ে থাকতে দিয়েছেন।

আমি তবু সত্যি বলতে চাই। আমি রাজপুত্র, আমি যুবরাজ, অহেতুক অনৃত (*মিথ্যা*) ভাষণ অত্যন্ত গরহিত কাজ। বিদিশা ও তার সখিদের প্রতি যে অপরাধ আমি করেছি তা তাদের প্রতি ভালবাসার অভাবের জন্য নয়, এক গরিব দরজির কাছে অপমানিত হবার প্রতিশোধ নিতে। তবে আমি যে অন্যায় করেছি সে অন্যায় যদি অন্য কেউ করত তাহলে আমি তাকে তার রাজ্যেই হত্যা করতাম। এভাবে বিচার করা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দিতাম না।

রাজা বললেন -- তাহলে তুমি বলছ, তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড?

কথাটা শুনে বিদিশা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার চোখে জল। সখিরা কাঁদতে লাগল।

রাজা বললেন - তোমরা বোসো। তোমাদের কথা বলার অধিকার নেই। কারণ তোমাদের কোন কথা বলার হুকুম আমি দিইনি।

বিদিশা আসনে বসল। সবাই লক্ষ্য করল, চার জনেরই চোখের কোণ জলে ভরে গেছে। তানাসিকো আবেগপূর্ণ চোখে একবার কুয়াশার দিকে, একবার তার দাদার দিকে তাকাল তারপর রাজার দিকে আকুতি ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

ধৃষ্টদেব দেখল যাদের প্রতি সে অমানুষিক অত্যাচার করেছে আজ তার মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনে সেই চোখগুলো জলে ভরে উঠেছে। এই চোখগুলো একদিন তারই অত্যাচারে নীরবে চোখের জল ফেলছিল। কি অন্যায় সে করেছে।

রাজা বললেন -- ধৃষ্টদেব, আজ তোমার কেবল একটাই পরিচয়, তুমি বিদিশা আর তার সখিদের স্বামী, এরাজ্যের জামাই। তোমাকে বাঁচাতে পারে ঐ চার জোড়া চোখের জল। তুমি তোমার রাজ্য হারিয়েছ। সুতরাং আমি যদি তোমাকে ক্ষমা করি এবং রাজ্য ফেরত দিই তাহলে তা হবে শর্তের ভিত্তিতে। তুমি শর্ত মানতে রাজি আছ?

ধৃষ্টদেব বলল -- মহারাজ, আমি পরাজিত হলেও রাজপুত্র। সুতরাং শর্ত না জেনে কোনো কথা দিতে পারব না। যদি শর্ত সম্মান জনক না হয়, তা হলে আমি মৃত্যুদণ্ডই বেছে নেব।

রাজা বললেন -- তোমার মর্যাদাবোধ দেখে আমি খুশি হলাম। আমার প্রথম শর্ত, তোমার রাজ্য এখন আমার অধীন। আমি সেই রাজ্য, এরাজ্যের জামাতাকে যৌতুক হিসাবে দেব এবং তা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হল, তোমার ভগিনী বিপাশাকে অবুঝদীপের রাজা কুয়াশার সাথে বিবাহ দিতে হবে।

শর্ত শুনে ধৃষ্টদেব চিন্তা করতে লাগল। ওপাশ থেকে দুটো চোখ ভাবলেশহীন ভাবে কুয়াশার দিকে চেয়ে রইল। তানাসিকোর উদাস চোখ দুটো যেন বলতে চাইছে একবার আমার দিকে দেখ। তাকিয়ে দেখল কুয়াশা।

রাজাকে সম্বোধন করে কুয়াশা বলল -- মহারাজ, আমার একটা নিবেদন আছে। তানাসিকো আমার বাগদত্তা। আবার আমি কথা দিয়েছিলাম বন্ধু তামুকাড়ের জন্য তার উপযুক্ত এক সুন্দরীর খোঁজ করব, তার পর একই লগ্নে দু'জনে বিবাহ করব। কুমারী বিপাশা অনন্যা সুন্দরী, রাজকন্যা। সুতরাং আমি মনে করি বিপাশাদেবী আমার বন্ধু তামুকাড়ের উপযুক্তা। সুতরাং আপনি অনুমতি করলে এবং বিপাশাদেবী রাজি হলে তার সঙ্গে আমার বন্ধু তামুকাড়ের বিবাহের প্রস্তাব আমি করছি

এবার একজন নয়, দুজনের চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তানাসিকো আর বিপাশা। তানাসিকো বিপাশার হাত ধরে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল -- কি, তুমি রাজিতো?

প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে তানাসিকোর বুকে মুখ লুকালো বিপাশা।

এমন সময় প্রহরী এসে সংবাদ দিল, এক সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি মহারাজের দর্শন প্রার্থী। তাঁর প্রয়োজন খুবই জরুরী। তিনি আপনার সাক্ষাৎ চান।

রাজা বললেন -- নিয়ে এসো।

সন্ন্যাসীকে হাজির করা হল সভায়। সন্ন্যাসী রাজাকে যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন করে আসন গ্রহণ করে সকলের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মহারাজ বললেন -- আপনার কি প্রয়োজন আপনি সংক্ষেপে জ্ঞাপন করুন। আমাদের জরুরী কাজ আছে।

সহসা উঠে দাঁড়িয়ে তামুকাড়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তকড়ি ভাষায় জানতে চাইল -- আপনি?

বিদিশা বলল -- আপনিতো সেই সাধু যার সঙ্গে বছর সাত আগে বনের প্রান্তে আমাদের দেখা হয়েছিল।

বলেই দাদাদের দিকে তাকাল। সায় দিয়ে কুয়াশা বলল -- সেই সন্ন্যাসী তো। আপনার এখানে কি প্রয়োজন?

সন্ন্যাসী বললেন -- হ্যাঁ, আমি সেই সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু আমি আসলে কোন সাধু সন্ন্যাসী নই। আমি ....

তামুকাড়ে উঠে এসে ব্যগ্র ভাবে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বলল -- পিতা, আপনি এভাবে এখানে কেন?

রাজা বললেন—যুবরাজ, তুমি এনাকে চেন? (*কারণ রাজাতো তক্কড়ি ভাষা বোঝেন না।*)

ততক্ষণে তানাসিকো উঠে এসে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে। তামুকাড়ে সন্ন্যাসীকে সকলের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল -- ইনি আমার পিতা, সবুজদ্বীপের রাজা। বছর সাতেক আগে আমার উপর রাজ্য ভার দিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন।

সন্ন্যাসী তথা সবুজদ্বীপের রাজা বললেন -- আমি সবুজদ্বীপে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে দেখলাম তুমি নেই। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আকিহুতো সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। তোমাকে পথিমধ্যে হত্যা করার জন্য গোপনে ঘাতক পাঠিয়েছে। এবং সে আমাকে চিনতে না পেরে আমাকেই সে কাজে নিয়োগ করেছে। তার লোকজন আমাকে কোন বাঙালী হিসাবে ভেবেছিল। কিন্তু আকিহুতোকে আমি যতটা চিনি সে কোন ফাঁক রেখে কাজ করে না। সে অন্য কোন ব্যক্তিকে একাজে অন্যভাবে নিয়োগ করে থাকবে।

সুবুদ্ধপুরের রাজা সবুজদ্বীপের রাজাকে সম্বোধন করে বললেন -- আপনি যে সংবাদ বহন করে এনেছেন তা অতি জরুরী। আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত, আপনি বিশ্রাম করুন। আমার রাজ্যে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আপনার পুত্রের কোন ভয় নেই। তাছাড়া এই যুবক যথেষ্ট বুদ্ধিমান। ক্ষমতার পিছনে সতত শত্রু থাকে। তাই রাজাকে সহস্র লোচন হতে হয়, রাজার চোখে ঘুম থাকতে নেই। রাজা, রাজপুত্রকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়।

সবুজদ্বীপের রাজা বললেন -- তাহলে আমি যাই। আপনারা যে আলোচনা করছিলেন তা শেষ করুন। আমার উপস্থিতি আপনাদের আলোচনায় ব্যঘাত ঘটাতে পারে।

রাজা বললেন -- না, এখন আপনিও আমাদের এক জন। সুতরাং আপনার থাকাতে কোন আপত্তি নেই। যখন আপনার পুত্র কন্যার বিবাহের কথা হচ্ছে তখনতো আপনার থাকাটা খুবই জরুরী।

পুনরায় সভার কাজ শুরু হলে ধৃষ্টদেব জানাল -- দু'টি শর্তেই আমি রাজি। যৌতুক হিসাবে রাজ্য লাভে কোন অসম্মান নেই, আর তামুকাড়ে আমার ভগিনীর উপযুক্ত, সুতরাং বিবাহে আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এখন জরুরী হল তামুকাড়ের রাজ্য উদ্ধার এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ঠিক হল সুবুদ্ধপুর আর প্রবৃদ্ধপুরম দু'দেশ থেকে বাছা বাছা কিছু সৈন্য নেওয়া হবে আর যে সব সৈনিক সবুজদ্বীপ থেকে এসেছে তাদের নিয়ে বারটি জাহাজ যাত্রা করবে সবুজ দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সব মেয়েরা থাকবে এ রাজ্যের রাজপ্রাসাদে। নিজের রাজ্য উদ্ধার করে ফিরে এলে সুবুদ্ধপুরেই বিবাহ সম্পন্ন হবে।

দ্বীপ রাজ্যের অরণ্যবাসী সৈন্যরা তামুকাড়ে ও কুয়াশার জয়ধ্বনি দিতে দিতে যুদ্ধের জন্য উতলা হয়ে উঠল। সুবুদ্ধপুর এবং প্রবৃদ্ধপুরমের সমস্ত স্থল বাহিনীর সৈন্যরা ঘোড়ায়

কিংবা হাতিতে চেপে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত হলেও তারা জল পথে যুদ্ধে মোটেই পটু নয়। সুতরাং তারা জলপথে যুদ্ধে যেতে ভয় পেতে লাগল। আবার কিছু যুবক চাইল সুন্দর অরণ্য আর বিশাল সমুদ্রের মায়াময় হাত ছানিতে জলে ভেসে যেতে। তারা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাদের অভিযান চালাতে প্রস্তুত হল।

এক হাজার সৈন্য সহ দ্বাদশ রণতরী ভাসল বঙ্গোপসাগরে। সুসজ্জিত রণতরী তার ময়ূরপঙ্খি পাল তুলে দিল। সৈন্যরা যে যার রাজার নাম করে জয়ধ্বনি করতে লাগল। এদিকে পুরবাসীরা চোখের জলে তাদের প্রিয় সৈন্য আর রাজকুমারদের বিদায় জানাতে এল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তানাসিকো, বিদিশা আর তার তিন সখি পারে দাঁড়িয়ে রইলো, আর রইলো বিপাশা তাদের পাশে জামালি। তাদের পিছনে যত পুরাঙ্গনা, সৈনিকদের স্ত্রী-মাতা-ভগিনী সকলে যে যার প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় নানা আচার অনুষ্ঠান করছে। এসেছেন সুবুদ্ধপুরের রাজা-রাণী রাজপুত্র আর সৈন্য বাহিনীকে বিদায় জানাতে। আর রাজ্যের মানুষ জড় হয়েছে এই দৃশ্য দেখতে। বাজছে রণদামামা, তুর্য, ভেরি, দুন্দুভি আরো কতকি। এ যে মহোৎসব। এমন সাজ সাজ কাণ্ড কারখানা এর আগে কেউ দেখেছে বলে স্মরণ করতে পারছে না।

শুভক্ষণে ঈশ্বরের নাম করে জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে নোঙর তুলে নিল। যতক্ষণ চোখে দেখা গেল তত ক্ষণ বহু মানুষ পারে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ধীরে ধীরে সবাই যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু তানাসিকো বিপাশা বিদিশা আর তার সখিরা চোখ ফেরাতে পারল না। তারা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

এবার জামালি এসে তাদের হাত ধরল। বলল চল ভাই, এবার ঘরে চল। তোমাদের স্বামী, ভাবীস্বামী আর ভ্রাতাদের কোনো বিঘ্ন হবে না। ওদের বাহুতে শক্তি আছে, হৃদয়ে ভক্তি আছে, মগজে বুদ্ধি আছে, আর সবার উপরে ভগবান আছেন। তোমাদের কোন চিন্তা নেই বোন।

সাত

নীল সাগরের বুক চিরে বারোখানি জাহাজ এগিয়ে চলল। প্রথম সারিতে তিনটি মাঝের সারিতে ছয়টি এবং পেছনের সারিতে বাকি তিনটি। প্রথম সারির দু' দিকের দু'টি জাহাজে আছে দ্বীপ রাজ্যের সৈন্যেরা আর মাঝেরটিতে আছে তিন রাজা-রাজপুত্র। মাঝের সারির দু'টি জাহাজে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র আর রসদ। বাকিগুলিতে আছে স্থলরাজ্যের সৈন্যেরা। সব জাহাজেই যুদ্ধ করার মত অস্ত্র আছে। এই জাহাজ গুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ছোট ছোট কয়েকটা নৌকো।

মন্ত্রী আকিহুতো যতনা বুদ্ধিমান তার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত ব্যক্তি। গুপ্ত চরের মাধ্যমে সে খবর পেয়ে গেল। বুঝতে পারল এত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া যে সৈন্যরা তামুকাড়ের প্রতি অনুগত ছিল তারা মন্ত্রী আকিহুতোর নির্দেশ সেভাবে মান্য করতে চায় না। তাই বুদ্ধি করে. সুসজ্জিত বজরা পাঠালো রাজপুত্র তামুকাড়ে,

রাজকুমারী তানাসিকো ও কুয়াশাকে বরণ করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আকিহুতো বুঝতে পারেনি যে রাজকন্যা জাহাজে নেই।

কুয়াশা বলল বন্ধু মন্ত্রী তোমাকে বরণ করতে নৌকা পাঠিয়েছে, কিন্তু আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র আছে। সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। আবার বজরাতে না উঠলে তাদের সন্দেহ হবে। তাছাড়া রাজা বা যুবরাজকে বরণ করে নিয়ে যাওয়া তোমাদের দেশের রীতি। সেই রীতি ভাঙা উচিত নয়।

তামুকাড়ে বলল -- তাইতো, এখন তাহলে কি করা যায়?

আলোচনা করে কুয়াশা বলল -- ভারতীয় রীতি অনুযায়ী তিন খানি ছোট নৌকো রাজার বজরার আগেপিছে যাবে। আর সেই নৌকাতে থাকবে আমাদের বিশ্বস্ত সৈনিক ও সাঁতারু। যদি কখনো কোন বিপদ আসে তাহলে তারা আমাদের রক্ষা করবে। রাজ্য চালাতে গেলে কিছুটা ঝুঁকি থাকবে আর সেই ঝুঁকি সামলানোর মত উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন আছে। তা না হলে চলবে কেন?

সেইমত তামুকাড়ে কুয়াশা আর ধৃষ্টদেব সুসজ্জিত বজরায় উঠল। সঙ্গে চার জন অনুচর, কটিবন্ধে ঝুলিয়ে রাখল ধারালো তরবারি। সামনে এক খানা এবং দুপাশে দুটো ছোট নৌকো লাল পতাকা উড়িয়ে চলতে লাগল। সুন্দরী যুবতীরা বরণডালা হাতে সেই বজরায় তাদের বরণ করল। সুন্দর সুগন্ধী বস্ত্র এনে তাদের সামনে ধরল পোশাক পরিবর্তণ করার জন্য।

কিঙ্করীদের বিদায় করে কুয়াশা বলল -- বন্ধু এই পোশাকে সুগন্ধ আছে কিন্তু এর মধ্যে যেন কেমন উৎকট ভাব দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় এই সুগন্ধের মধ্যে একপ্রকার আঠালো জিনিস আছে। আমি অবুঝদ্বীপ সহ আশপাশের দ্বীপের মধ্যে এক প্রকার গাছ দেখতে পেয়েছি যার রসের মধ্যে এই রকম মধুর অথচ তীব্র গন্ধ আছে অনেকটা বাংলাদেশের কেতকী ফুলের মত, অথচ খুব গাঢ় আঠা।

তামুকাড়ে বলল - হ্যাঁ, গাছের রস থেকে আঠাও হয় আবার গন্ধদ্রব্যও হয় কিন্তু আমাদের পোশাকে আঠা লাগাবার কারণ?

এরমধ্যে কুয়াশা পানীয় জলের গ্লাস থেকে জল নিয়ে একটা পোশাকের কিছুটা অংশ ভিজিয়ে নিল। তখন দেখাগেল কাপড়টা ভীষণ রকম চট্‌চটে হয়ে গেল। কুয়াশা বলল - বন্ধু দেখ, এরা নিশ্চই সমুদ্রের মাঝখানে বজরা ডুবিয়ে দেবে। তখন যাতে আমরা সাঁতার কাটতে না পারি তাই এই আঠালো পোশাক পাঠিয়েছে।

এই আলোচনা যখন চলছে এমন সময় বাইরে মাঝি মল্লাদের মধ্যে কি যেন চেঁচামেচি শোনা গেল। তামুকাড়ে আর কুয়াশা নিজেদের প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে এসে দেখে সামনের নৌকা থেকে মাঝি হেঁকে বলছে বজরা ভুল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আবার বারসমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে।

এমন সময় সোঁ সোঁ করে জল ঢুকতে লাগল বাজরার ডেকে। মাঝি মল্লারা যে যার মত জলে ঝাঁপ মারল। এখনি বজরা ডুবে যাবে। কি হবে? বাজরায় কিঙ্করীরা আছে তাদের

বাঁচাতে হবে, নিজেদের বাঁচতে হবে। মাঝি মাল্লারা সাঁতার কেটে চলে যাবে কিন্তু মেয়েরাতো পারবে না। তাদের ছেড়ে কাপুরুষের মতো ....

'হতাশ হয়োনা বন্ধু, বিপদের সময় ধৈর্য হারাতে নেই। আমি আগে ভাগে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।' বলল কুয়াশা।

সামনে এসে দাঁড়ালো চার অনুচর। তাদের হাতে কাপড়ে কাপড়ে জোড়া লাগিয়ে পাকানো লম্বা দড়ি। 'মহারাজ যতটা পারেন পোশাক আষাক খুলে ফেলুন, তাতে সাঁতার কাটতে সুবিধে হবে। তারপর এই দড়ি ধরে জলে ভাসতে থাকুন। আর দেরি করবেন না।'

আকিহুতোর সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তেগেল। তামুকাড়ে আর কুয়াশা দড়ি ধরে ভাসতে লাগল, ভাসতে থাকল পরিচারিকারা। সাঁতারু অনুচর দড়ির গোড়া ধরে আগে আগে যেতে লাগল। ততক্ষণ ছোট নৌকোগুলো কাছে আসতে পারছে না, কারণ একটা বজরা যখন ডুবতে থাকে তখন তার কাছে কোন ছোট নৌকা এলে সেটা জলের টানে ডুবে যাবে।

এতক্ষণে ছোট নৌকো তিনটি কাছে এসে গেছে। প্রথমে তারা মহিলাদের তুলল, তারপর তামুকাড়ে, কুয়াশা আর ধৃষ্টদেব উঠল। সব শেষে উঠল অনুচররা। যে সব মাঝিমল্লারা বজরা ডুবিয়ে দিয়েছিল তাদের সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ থামিয়ে খোঁজ করা হল। এক জন বাদে সবাইকে উদ্ধার করা গেল।

এবার জেরা করার পালা। যারা বজরা ডুবিয়ে দিয়েছিল তারা প্রাণে বেঁচে অকপটে সব কথা স্বীকার করল। বলল মন্ত্রী আকিহুতো তাদের নিয়োগ করেছিল পথের মধ্যে নৌকা ডুবিয়ে কুয়াশা আর তামুকাড়েকে হত্যা করার জন্য আর তিন মহিলাকে পাঠিয়েছিল কোন মতে তানাসিকোকে ধরে নিয়ে যেতে।

আরো কয়েক দিন পর জাহাজগুলো গিয়ে থামল সবুজদ্বীপের বন্দরে। সেনা বাহিনী নামল। এদিকে আকিহুতো সেনাবাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল যুবরাজের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ বাধল বন্দরে কিন্তু যুদ্ধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। সেনা নায়করা যখন বুঝতে পারল যে যুদ্ধটা তাদেরই সাবেক যুবরাজ তামুকাড়ের বিরুদ্ধে তখন সাদা পতাকা দেখিয়ে তারা যুদ্ধ থামিয়ে রাজার পক্ষ নিল।

বন্দরে সমস্ত সৈন্য হাঁটুগেড়ে তাদের তরবারি বল্লম, টাঙ্গি, তামুকাড়ের পায়ের কাছে রেখে দিল। আসলে মন্ত্রী তাদের বুঝিয়েছিল বিদেশী সৈন্যরা তাদের দ্বীপ দখল করতে আসছে। বেগতিক দেখে আকিহুতো সরে পড়ল। অন্য বন্দর দিয়ে অন্য কোনো দ্বীপে পালিয়ে গেল সে।

যুবরাজ তামুকাড়ে স্বমর্যাদায় প্রাসাদে প্রবেশ করল। বহুদিন অরক্ষিত আছে অবুঝদ্বীপ তাই কুয়াশা গেল নিজের রাজ্যে। থাকল কিছুদিন। রাজ্যের নানা সমস্যা নিয়ে রাজকর্মচারিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল। ভারত থেকে আসা সৈন্য দল সুন্দর মনোরম দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এদিকে রাজকন্যা বিপাশা, তানাসিকো আর যুবরাণী বিদিশা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। তাদের চোখে ঘুম নেই, মনে সুখ নেই, নেই আহারে বিহারে রুচি। কেবল

জামালি তাদের প্রবোধ দেয়, আনন্দে রাখার চেষ্টা করে। এমনি করে মাস দুয়েক পরে দূত এসে সুসংবাদ দিল। তখন তাদের মুখে হাসি ফুটল।

একলিঙ্গ স্বামীর মন্দিরে পূজা দিতে যায় তারা প্রতিদিন। এখন তারা আর সাধারণ দরজির মেয়ে নয়। কেউ রাজকন্যা, কেউ রাজবধূ। তাই তারা আসে চতুর্দোলায়, দাঁড়ায় চাঁপাগাছটার তলায়। মনে পড়ে বিদিশার সে দিনের কথা, যেদিন এমনি চাঁপা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াতো ধৃষ্টদেব, ভুলে যায় তার অবহেলার কথা। অপমানের কথা, নির্যাতনের কথা। বিদিশা সেসব দিনের কথা তানাসিকো আর বিপাশাকে শোনায়। বান্ধবী সপত্নিরা মুখ টিপে হেসে নানা প্রকার রসিকতা করে।

এবার তারা পড়ে তানাসিকো আর বিপাশাকে নিয়ে। তানাসিকো বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ি পরতে শিখেছে, আবার বিপাশা দ্বীপভূমির বালিকাদের মত ঘাঘরা আর ফেট্টি পরতে অভ্যাস করছে। চেষ্টা করছে তক্কড়ি ভাষা শিখতে। নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছে যে যার মতো করে।

সবুজদ্বীপের সন্ন্যাসী রাজা আবার নিজের দেশে ফিরে গেলেন। তিনি তামুকাড়েকে বললেন -- তোমরা তিন জন সুবুদ্ধপুরে ফিরে যাও। মেয়েরা তোমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তত দিন আমি দ্বীপরাজ্য সামলাবো।

জাহাজে নানা প্রকার বানিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রী দ্বীপরাজ্য থেকে সংগ্রহ করে আনা হল যাতে সেই সব জিনিস ভারতের নানা জায়গায় বিক্রি করে যে লাভ হবে তাতে সৈন্যদের বেতন ও অন্যান্য খরচ উঠে যায়। সাধারণ প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর বসাতে হবে না, বা রাজকোষের ওপর চাপ পড়বে না। তিন জন আবার সুবুদ্ধপুরে ফিরে এল। বিবাহ পর্ব শুরু হল মহা সমারোহে। বিভিন্ন ভাষা, ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন ঘটল। তানাসিকো-কুয়াশার বিবাহ হল বাঙালীদের মত, আর তামুকাড়ের সঙ্গে বিপাশার বিবাহ হল সবুজ দ্বীপের নিয়ম অনুযায়ী। ভিন্ন মত ভিন্ন আচার আচরণ কিন্তু মানসিকতা একই।

হৈহুল্লোড় আলোর রোসনাই অবসান ঘটিয়ে সুবুদ্ধপুরকে অন্ধকার করে যে যার রাজ্যে ফেরার জন্য প্রস্তুত হল। ধৃষ্টদেব বিদিশা আর তার তিন সখি যাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্য প্রবৃদ্ধপুরমে আর সমুদ্রপার হয়ে চলে যাবে তামুকাড়ে-বিপাশা, কুয়াশা-তানাসিকো। শুভ ক্ষণে যাত্রা শুরু হবে। একলিঙ্গ স্বামীর মন্দির প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়াল সবাই। জামালি-প্রত্যাশা বিদায় জানাবে।

এক দিকে দাঁড়াল সব মেয়েরা। নিজেদের মধ্যে বিদায় সম্ভাষন শুরু হল। তানাসিকো বলল, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী হল জামালি। জামালি বলল, ভাই তোমরা হলে রাজকন্যা, রাজবধু আর আমি..........?

হ্যাঁ, প্রত্যাশা আজ আর সামান্য দরজি নয়, সেও বিশাল ব্যবসায়ী। জাহাজ নিয়ে দেশে বিদেশে বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করে। বিপাশা বলল -- কেন? তোমার স্বামীও বড় ব্যবসায়ী, লক্ষ টাকার মালিক। তাছাড়া তুমি রইলে দেশে, তোমার চির পরিচিত পরিবেশে আর আমরা সবাই অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছি।

জামালির শাশুড়ি সকলের মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে বললেন - হ্যাঁ মা, আমার এই মেয়েটা জামালি, সেইতো প্রথম লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। স্বপ্ন এক বার দেখতে শিখলে তা সফল হলেও হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ স্বপ্ন দেখতে না শেখে তাহলে সে কোনো দিন বড় হতে পারে না। আমার 'লাখটাকার মেজবৌ'।

আর কেউ কথাটা বুঝতে না পারলেও জামালি বুঝতে পারল তার বোকামির কথা। লজ্জায় মাথা নত করল। সবাই ভাবল হয়তো প্রশংসার কথা শুনে জামালি লজ্জা পেয়েছে। বিদিশা বলল - বিপাশা, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর যিনি এখন তোমার শ্বশুর মশায় তাঁকে বলো, তিনি যে বর দিয়ে ছিলেন সেই বর পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তাঁর আশীর্বাদে তোমার দাদাকে বর পেয়েছি। তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। তিনি আমাদের তিন ভাই বোনকে বর দিয়েছিলেন তাই আজ আমরা রাজ পরিবারভুক্ত হতে পেরেছি।

সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। অবশেষে সুবুদ্ধপুরের রাজা প্রাসাদে ফিরে গেলেন। একলিঙ্গ স্বামীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে রইল কেবল জামালি আর প্রত্যাশা। প্রত্যাশার হাত ধরে জামালি অহঙ্কারের হাসি হেসে বলল -- জান, মা বলেছেন 'আমার লাখটাকার মেজবৌ।' ..... চল মন্দিরে প্রণাম করে মানত করে আসি।

-- আবার কার জন্য মানত করবে?

'তোমার সন্তানের জন্য।' কথাটা বলে আর এক বার লজ্জা পেল জামালি।

জ্যেঠু গল্প শেষ করে উঠে গেলেন। নীলু বলল -- জামালি লজ্জা পেল কেনরে?

অতসী বলল - এটা বুঝলি না, জামালির ছেলে হবে যে।

সোনার তরবারি

ভোলা, পলা, অতসী, নীলু, ঝুম্পা, মিতা, ভাবনা সব্বাই গোল হয়ে বসে আছে। জেঠু এবার গল্প শুরু করবেন। তেলে ভাজা মুড়ি আসছে। জেঠিমা আবার বাজারের তেলেভাজা খেতে দেন না। এদিকে তেলে ভাজা খেতে জেঠু বড্ড ভালবাসেন। অতসী খবর নিয়ে এসেছে রান্নাঘরে জেঠিমা ডাল বাটা দিয়ে দোপিঁয়াজি ভাজছেন। তারই গন্ধ সকলের নাকে নাকে ঘোরা ফেরা করছে। জিভে জল মনে উৎসাহ, কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া পরীক্ষাটা মোটে পিছু ছাড়ে না। আজ ষান্মাসিক তো কাল বাৎসরিক। এক যেতে না যেতে আর এক এসে হাজির। জেঠুর সাফ কথা, পরীক্ষার ফল খারাপ হলে গল্প বলা বন্ধ।

জেঠু এসে গেছেন। জেঠিমা হাঁক দিলেন -- ওরে ভোলা, অতসী তোরা একবার এগুলো হাতে হাতে নিয়ে যা না.........

শ্রীরামচন্দ্রের কপি সৈন্যের মতো সকলে এক ছুটে গিয়ে মুড়ির গামলি, তেলে ভাজার বাটি, চায়ের কাপ নিয়ে চলে এল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জেঠু বললেন -

রাজ্যের নাম ছিল জোছিম্‌পুর, আর সেখানকার রাজা ছিলেন দেবপ্রিয়। দেবপ্রিয় ছিলেন যেমন সুশাসক তেমনি দয়ালু। দেব দ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল। তিনি গরিব দুঃখিকে অকাতরে দান করতেন। আবার যারা ধনী ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতেন। কর আদায়ের জন্য তিনি দেওয়ান, খাজাঞ্চি, আদায়কারী সব নিয়োগ করতেন, প্রসাশনিক কাজে পাইক, সেপাই, কটোয়াল নিযুক্ত ছিল। রাজ্য তেমন বড় ছিল না। কারণ তিনি বা তাঁর পূর্বপুরুষ কেউই যুদ্ধ বিগ্রহ বা রাজ্য বিস্তারে মন দেন নি। সুতরাং রাজ্য ছোট হবার সুবাদে রাজা নিজেই বেশির ভাগ কাজ তদারকি করতে পারতেন।

জোছিম্‌পুর রাজ্য ছিল প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত। এক দিকে বিশাল পাহাড়। দুদিকে প্রবহমান নদী। কেবল এক দিক ছিল অরণ্য ঘেরা। আর সেই অরণ্যে ছিল নানান সম্পদ। সেই সম্পদের লোভে ভিন রাজ্যের কাঠুরে, শিকারীরা আসতো। রাজার প্রহরী, যারা বনে সীমানায় পাহারা দিত, তাদের সঙ্গে লড়াই বাধতো। তবে জঙ্গলের গভীরে আর কোন পাহারা ছিল না। সজলা নদীর অবদান সরূপ রাজ্যের জমিগুলো ছিল শস্য-শ্যামলা, সুফলা। আবার সেই নদীতে বন্যা হত। রাজ্যের অনেকটা ভেসে যেত প্রায় প্রতি বছর।

রাজকোষের সাহায্যে এবং রাজ পুরুষদের তদারকিতে আবার মানুষের ঘর বাড়ি গড়ে উঠত। বন্যার পলিতে আবার চাষ হত। প্রজাদের মুখে হাসি ফুটতো। রাজকর আদায়ের সাথে সাথে রাজকোষ ভরে উঠত। এমনি করে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলতো

বছরের পর বছর। হোত বাৎসরিক উৎসব। সেই উৎসবে রাজ্যের লোক জন যেমন জড় হোত, তেমনি আসতো বিদেশী পর্যটক, বণিক ব্যবসায়ী। আমন্ত্রিত হতেন বিদেশের রাজা, রাজপুত্র, বণিক ব্যবসায়ী জ্ঞানী গুনী মানুষ।

নদী পথে জাহাজ ভাসিয়ে আসতো কত দেশ বিদেশের বণিক পর্যটক দর্শনার্থি। শরৎ কালের এই উৎসব চলত সাত দিন ধরে। তাকে কেন্দ্র করে অনেক বিদেশ থেকে আসা মানুষেরা নদী পাহাড় প্রভৃতি সুরম্য স্থানে ভ্রমন করত, ফলে ব্যবসা বাণিজ্য গড়ে উঠত। তাদের জন্য সরাইখানা, মুদিখানা, ময়রার দোকান প্রভৃতিতে ভিড় হত। কেনা বেচা হত বিস্তর। এই সময় চাষিদের কোন কাজ থাকে না। বর্ষায় চাষের কাজ শেষ হয়েছে। হেমন্তের আগে ধান কাটা হবে না। সুতরাং অবসর সময়ে তারাও দু'টো পয়সার মুখ দেখতো। বিদেশী ব্যবসয়ীর কাছ থেকে রাজকর আদায় হোত প্রচুর।

এই উৎসবটার জন্য রাজ্যের লোকেরাতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতোই, দেশ বিদেশের ব্যাপারী, দোকানদার উৎসাহী মানুষ এমন কি রাজা জমিদাররাও অপেক্ষা করে থাকতেন এই উৎসবের জন্যে। গরিব মানুষেরা সারা বছর একটা একটা করে পয়সা জমাতো এই উৎসবে খরচ করার জন্য।

জোছিম্‌পুর রাজ্যের এই উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল 'তরবারি খেলা'। রাজা সোনার তরবারি হাতে রাজ্যের প্রধান সেনাপতির সাথে উদ্বোধন করতেন এই খেলার। তারপর শুরু হত প্রতিযোগীতা। সেখানে দেশের সৈনিকেরা যেমন অংশ গ্রহণ করতো, তেমনি বিদেশী রাজা, রাজপুত্র বা সৈন্যেরাও অংশ গ্রহণ করতো। বিজয়ীকে সম্মান প্রদর্শন ও পারিতোষিক প্রদান করা হত।

আমন্ত্রণ পেয়ে ক্রান্তিনগর রাজ্যের রাজা চিত্রবাহু এলেন তাঁর পুত্র হিরণ্যবাহুকে নিয়ে। এলেন আরো কত রাজা, রাজপুরুষ, জমিদার। যথা বিহিত সম্মানে অতিথিশালায় তাঁদের রাখা হল। উৎসবের আগে রাজপরিবারের সঙ্গে অন্যান্য রাজা ও তাদের পরিবার বর্গ, যারা এসেছেন, তাদের নিয়ে একটি ঘরোয়া সভায় পরস্পরের সাথে আলাপ করিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। সেই অনুষ্ঠানে অন্যান্য রাজ-পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল বালিকা দেবদ্যুতির। দেবদ্যুতি জোছিমপুরের রাজা দেবপ্রিয়র একমাত্র কন্যা, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

সেকালে সাধারণতঃ কোন নারী সিংহাসনে বসতেন না। কন্যা সন্তান থাকলে সেই রাজ্যের জামাতাকে সিংহাসন প্রদান করা হত। তাই দেবদ্যুতিকে দেখে অনেক রাজা মনে মনে পুত্রবধূ রূপে কল্পনা করতে লাগলেন। কিন্তু এত অল্প রয়সে বিবাহের প্রস্তাব কেউ করে নি।

সকলে বালিকা দেবদ্যুতিকে আদর করছে, উপহার দিচ্ছে। ঝলমলে পোশাকে সুসজ্জিতা বালিকা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। যখন কুমার হিরণ্যবাহুর সঙ্গে পরিচিত হতে গেল তখনই অহেতুক দেবদ্যুতির মাথাটা লজ্জায় অবনত হলো। কেমন যেন উদাস হয়ে গেল সে। মায়ের আঁচলে চোখ ঢাকল।

ভোজবাজি, নাগরদোলা, নানা অঞ্চলের নানা সাম্প্রদয়ের নৃত্য-গীত, হেথা-হোথা পরিবেশিত হয়ে চলছে। সাত দিনের শেষ দিনের শেষ অনুষ্ঠান হিসাবে শুরু হল তরবারি প্রতিযোগীতা। রাজা দেবপ্রিয় সোনার তরবারি হাতে এগিয়ে এলেন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করতে। কিশোর হিরণ্যবাহুর চোখ চক্ চক্ করে উঠল। সে তাকিয়ে রইল লড়াই'র দিকে। তার মনে মনে বাসনা হল, সেও বিশাল যোদ্ধা হবে। এক দিন পৃথিবীর মানুষ তার বীরত্বে মুগ্ধ হবে। জয় করবে সসাগরা পৃথিবী।

দেশে ফিরে গিয়ে হিরণ্যবাহু অস্ত্র শিক্ষায় মন দিল। রাজপুত্র অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হবে তাতে কোনো নতুনত্ব নেই, কিন্তু হিরণ্যবাহু অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে উঠল। অল্প দিনের মধ্যে সে তার পারঙ্গমতা প্রকাশ করল। যৌবরাজ্যে অভিসিক্ত হয়ে হিরণ্যবাহু রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করল। পিতার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল যুদ্ধে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যকে অতর্কিতে আক্রমণ করল।

প্রথম যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত জয় এল। বিভিন্ন রাজারা শান্তিপূর্ণ ভাবে মিলে মিশে বাস করতেন। সহসা ক্রান্তিনগরের আগ্রাসী মনোভাব তাদের ভাবিয়ে তুলল। তারাও সতর্ক হতে লাগল। নিজ নিজ সেনাবাহিনীকে সাজিয়ে তুলল। কিন্তু ফল হল না। একের পর এক রাজ্য ক্রান্তিনগরের অধীনস্থ্ হতে লাগল।

প্রতিদিন শিব মন্দিরে যায় দেবদ্যুতি। কৈশোরেই তার অঙ্গথেকে রূপের ছটা নির্গত হতে লাগল। দেবকন্যার মত তার অঙ্গের দ্যুতি। যেমন রূপবতী তেমনি বুদ্ধিমতী। রাজা তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য সব রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। অস্ত্র বিদ্যা, অশ্বারোহন, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, নৃত্য, গীত, অঙ্কন, চিত্রণ এক কথায় সব কিছু।

এত দিন মনে মনে কুমার হিরণ্যবাহুর ছবি আঁকছিল দেবদ্যুতি। এবার মানস পট থেকে গোপনে চিত্রপটে অঙ্কন করল তার ছবি। কিশোর হিরণ্যবাহুর ছবি আঁকল সে। তারপর যুবক দেহ, মনের মত করে গড়ে তুলল। আঁকল তার যৌব-রাজ্যাভিষেকের ছবি, নিজের মনের মত করে। কারণ রাজপ্রতিনিধি অভিষেক সভায় গেলেও রাজকন্যাতো যায়নি, সুতরাং দেখেনি রাজপুত্রকে। কখনো আঁকল ঘোড়ায় চেপে রাজপুত্র তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কখনোবা নদীর ধারে অথবা প্রাসাদের ছাদে বেড়াচ্ছে।

এমনি করে দিন যায়, রাত কাটে। সখিদের সঙ্গে প্রমোদ কাননে খেলা করে। নদীতে স্নান করে। ছবি আঁকে ফুল পাখি পাতার, কাব্য পড়ে, পড়ে নানা শাস্ত্র, গান করে, বীণা রাজায়। সখিরা দেখে কুমার হিরণ্যবাহুর ছবি। রঙ্গ তামাশা করে কিশোরীর দল।

দেবদ্যুতির কানে এল কুমার হিরণ্যবাহুর সংবাদ। আনন্দ পেল দেবদ্যুতি, কুমারের বীরত্বের কথা শুনে। কিন্তু ব্যথা পেল তার চেয়ে অনেক বেশি, কারণ বীরত্ব ভাল, তাও যদি আবার রাজপুত্রের হয়। কিন্তু অহেতুক দেশের মধ্যে শান্তি বিঘ্নিত করে পর-রাজ্য গ্রাস করার আগ্রাসনী মনোভাব মোটেই ভাল নয়। তবু নিজের অজান্তে কখন সে তাকে ভালবাসার সিংহাসনে বসিয়ে ফেলেছে। সেখান থেকে তাকে সরানো সহজ কাজ নয়।

বেশি দেরি হল না। এক দিন জোছিম্‌পুর আক্রমন করল ক্রান্তিনগরের সেনাদল। রাজা দেবপ্রিয় অপ্রস্তুত ছিলেন না। কারণ কুমার হিরণ্যবাহু যে আক্রমন করতে পারে সে সম্ভাবনা অনেক আগেই ছিল। জোছিমপুরের সৈন্যদের প্রতিআক্রমনে পিছু হটতে আরম্ভ করল ক্রান্তিনগরের সেনাবাহিনী। রণ কৌশল মেনেনিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করল ক্রান্তিনগরের সেনাদল।

কিন্তু তাতে হিরণ্যবাহুর রণলিপ্সা আদৌ মিটল না, বরং আঘাত পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল হিরণ্যবাহু। স্তম্ভিত হল জোছিমপুরের শক্তি দেখে কিন্তু ভেঙে পড়ল না। শরৎ কালে আবার আক্রমণ করল হিরণ্যবাহু। বাৎসরিক উৎসব ভেস্তে গেল, আনন্দের জোয়ারে ভাঁটা পড়ল। সাহায্য করতে কোন রাজাই এগিয়ে এল না। কারণ তারা আগেই ক্রান্তিনগরের কাছে পরাজিত হয়ে মৈত্রী স্থাপন করেছে। তরবারি ধরার সাহস তাদের নেই।

রাজাদের কাপুরুষতা দেখে ব্যথা পেলেন দেবপ্রিয়, তিনি কন্যাকে বললেন — 'মা, যুদ্ধ করে কাজ নেই, বরং সন্ধির প্রস্তাব পাঠাই।' দেবদ্যুতি বলল — পিতা, পরাধীন হয়ে রাজত্ব করা দাসত্বের নামান্তর মাত্র। তার চেয়ে পরাজিত হয়ে আমরা হয় বন্দী হব, তাতে রাজবন্দীর সম্মান পাব। নয়তো অরণ্যে গা-ঢাক দেবো। গরীব মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করব, কেউ আমাদের চিনবে না।

রাজা মাথা ঝিমিয়ে বসলেন। দেবদ্যুতি বলল — পিতা, অনুমতি কর, আমি যুদ্ধে যাব। আমি যদি তোমার ছেলে হতাম, তাহলে কি আমি ঘরে বসে থাকতাম?

— তুই যে নিতান্তই কিশোরী। তুই কোথা যাবি? তবে তোর ওপর আমি রণ কৌশল তৈরী আর রাজপ্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব দিলাম।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। কিন্তু ক্রান্তিনগরের সেনাদের কাছে জোছিম্‌পুরের সেনারা পিছু হটতে শুরু করল। নিকটবর্তী সমস্ত রাজারা স্বেচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক ক্রান্তিনগরের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করছে। মন্ত্রী পাত্র মিত্র অমাত্য যারা ছিল তাদের অনেকে গোপনে ক্রান্তিনগরের রাজার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিল। কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষ চির দিন থাকে। বিশ্বস্ত সেনাপতি জানাল — মহারাজ, সন্ধি করুন, নয়তো বন্দী হবেন। ভুলবেন না, আপনার একটি কন্যা আছে, পরাজয়ের পর তার সম্মান রক্ষা করতে পারবেন না। পাষণ্ড হিরণ্যবাহু কি করতে কি করবে তার কোন ঠিকানা নেই। হয়তো রাজকন্যাকে দাসী বানিয়ে ফেলবে অথবা সাধারণ সৈনিকদের কাছে বিলিয়ে দেবে।

রাজা মন্ত্রণা করে স্থির করলেন — সন্ধি তিনি করবেন না। কারণ বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। অবশেষে স্থির হল, আর এক দিন যুদ্ধ চলবে। তার মধ্যে রাজা এবং রাজ-পরিবারের সকলে কোথাও আত্মগোপন করবে। রাজা নিরাপদ স্থানে চলে গেলে, সেনাপতি যুদ্ধ বিরতি ঘোষনা করবে। সেই মত দেবদ্যুতি ও রাজপরিবারের লোক জন সামান্য কিছু সম্পদ নিয়ে গোপনে দেশ ত্যাগ করলেন। সঙ্গে রইল রাজকন্যার দুই প্রিয় সখি বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা।

ইতিমধ্যে রাজা দেবপ্রিয়র বিশ্বস্ত কর্মচারীরা রটিয়ে দিয়েছে যে রাজা রাণী আর রাজকন্যা আত্মহত্যা করেছে। বানের জলের মত ঢুকে এল ক্রান্তিনগরের সেনারা। তারা অবাধে প্রজাদের সম্পদ লুণ্ঠণ করতে লাগল। জ্বালিয়ে দিল শস্যক্ষেত্র। অপমান করল মহিলাদের।

গোপনে রাজা দেবপ্রিয় এই সব সংবাদ পেলেন। কিন্তু কিছুই তাঁর করার ছিল না। কেবল প্রভুত পরিমাণ বেদনা অনুভব করলেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে পরাজিত সাধারণ সৈনিক পরিবার পরিচয় দিয়ে বনের কাঠুরেদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। রাজকন্যা সাধারণ কাঠুরের মেয়েদের সঙ্গে সখিত্ব করল। রাজা কাঠুরেদের সঙ্গে হাত মেলালেন। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনিলেন। মনের গোপন উদ্দেশ্য, সৈন্য সংগ্রহ করে আবার রাজ্য উদ্ধার করা। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ সাধ্য ছিল না।

রাজা হিরণ্যবাহু দেবপ্রিয়র প্রাসাদে প্রবেশ করে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সেই সোনার তরবারি দুটো যা, তাকে একদিন যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। মনে মনে খোঁজ করল দেবদ্যুতির। সারা দেশে চর পাঠালো, রাজা দেবপ্রিয় ও তাঁর কন্যাকে ধরে আনতে। কিন্তু তাদের কেউ কোথাও পেলেন না। অগত্যা রাজা হিরণ্যবাহু বেদ্যুতির খোঁজ খবর বন্ধ করলো।

জোছিমপুরের সুরম্য রাজ প্রাসাদে রাজকুমার হিরণ্যবাহু বাস করতে লাগলো। রাজ্যের সমস্ত আনন্দ উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। প্রজাদের মনে সুখ নেই। যুদ্ধের খরচ তুলতে প্রজাদের উপর কর বসানো হয়েছে। সৈন্যরা সুযোগ পেয়ে প্রজাপীড়ন করতে লাগল। বন্যার জলে দেশ ভেসে গেলে, প্রজারা পড়ল বিষম বিপদে। আগে রাজকোষ থেকে তাদের সাহায্য করা হত। খরায় চাষ নষ্ট হলে অন্য রাজ্য থেকে বেশি দামে খাদ্য শস্য কিনে প্রজাদের মধ্যে কম দামে বিক্রি করা হতো। কিন্তু এখন নূতন রাজা সে সব কথা ভাবেই না। বছরের পর বছর বিলাসে আয়েসে, যুদ্ধের উন্মাদনায় কাটাতে লাগলো।

এদিকে যুবতী হয়ে উঠল দেবদ্যুতি। পিতা দেবপ্রিয় বললেন মা, কোনো এক সাধারণ বনবাসী কিংবা সৎ কৃষক সন্তানের সঙ্গে তোর বিবাহের ব্যবস্থা করি।

দেবদ্যুতি বলল — না পিতা, তুমি আমার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ো না। যত দিন রাজ্য উদ্ধার না হয়, যত দিন ঐ রণ পিশাচ দুরাচারী রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাতে না পারি, ততদিন আমার বিবাহ করার বাসনা নেই। তুমি আমাকে এ আদেশ করো না।

রাজা বললেন — সে কি করে সম্ভব? হিরণ্যবাহু প্রচণ্ড পারাক্রান্ত। তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করা কি সম্ভব? চেষ্টা যে আমি করিনি তা নয়, কিন্তু গোপনে যে সব রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করে ছিলাম তারা কেউই রাজি হয়নি। আসলে ভীরু মানুষেরা ক্ষমতার লোভ ছাড়তে পারে না। আর এই ক্ষমতার লোভ মানুষকে আরো ভীরু করে তোলে। তারা বশ্যতা স্বীকার করে ও সিংহাসনে থাকতে চায়। আমার স্বাধীন চেতনা তাদের কাছে মুর্খতা মাত্র।

সখি বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা যারা রাজকন্যার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল তারা বলল — কাকে পাষণ্ড বলছ রাজকন্যা, যার ছবি আঁক, যার জন্য চোখের জল ফেল, তাকে তুমি দুরাচারি পিশাচ বলছো। এটাকি তোমার মনের কথা?

রাজকন্যা চুপ্ করে থাকে। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা রাজকন্যা দেবদ্যুতিকে ঘিরে গান ধরে। ভাল বাসার গান। কিন্তু রাজকন্যার মনে সুখ নেই। আর সাধারণ মেয়েরাতো জানেই না যে, দেবদ্যুতি রাজকন্যা।

বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে। রাজসভা বসছে জোছিম্‌পুরের রাজ প্রাসাদে, সেখানেই থাকে হিরণ্যবাহু। করদ রাজা, পাত্র-মিত্র-সভাসদ, মন্ত্রণা, রাজ্য-পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত আছে রাজা। কিন্তু রাজ্যে মানুষের ভাল মন্দের কথা ভাবার সময় কোথায়? এমনি তার রাজ্য-পরিচালনার রীতি। রাজ্যের মানুষ তাদের অভাব অভিযোগের কথা কাকে জানাবে? রাজার কাছে তারা পৌঁছোতেই পারে না। তাদের অভিযোগ তারা নাজির উজির অথবা করদ রাজার কাছে জানিয়ে ক্ষান্ত হয়। তাতে ক্ষোভ বাড়ে, কিন্তু কিছুই সমাধান হয় না। প্রজারা ভাবে — হায়! সেই রাজাও নেই, সেই রাজ্যও নেই, সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই।

এক দিন রাজসভায় এলেন এক সন্ন্যাসী। রাজা তাকে আসন গ্রহণ করতে বলল। সন্ন্যাসী রাজার জয় না দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। রাজার সামনে এসে দাঁড়ালে আগে বলতে হতো - 'মহারাজের জয় হোক'। কিন্তু সন্ন্যাসী সে সব কিছু বললেন না। তাতে রাজা হিরণ্যবাহু রুষ্ট হোল।

কতোয়াল বলল — হে সন্ন্যাসী, আপনি রাজার জয় ধ্বনি করুন। এটাই রীতি। আপনি নিতান্ত গৃহত্যাগি তাই শিষ্টাচার জানেন না। আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম, অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তে তার শিরচ্ছেদ করা হতো।

সন্ন্যাসী কতোয়ালের কথায় মোটেই বিচলিত না হয়ে বললেন — জয় দেবার মত কোন কারণ ঘটেনি। রাজা নিতান্ত বোকা। সুতরাং তার জয়ধ্বনি কেন দেব? আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বস্ব ত্যাগী, আমি যা সত্য তাই বলি। রাজার জয় কোথায়? এরতো সবটাই পরাজয়।

সে কি? রাজার সামনে বসে সামান্য এক সন্ন্যাসী এমন স্পর্ধার কথা বলতে পারে। কেঁপে উঠল সেনাপতি, গর্জে উঠল মন্ত্রী, সান্ত্রিরা ছুটে এল খোলা তরবারি নিয়ে। হুলুস্থুলু পড়ে গেল রাজসভায়। খবর ছড়িয়ে পড়ল বাইরে, এক সন্ন্যাসী রাজাকে অপমান করেছে। আজ তার শিরচ্ছেদ কিংবা তাকে শুলে চাপানো হবে। কেউ বলল — 'আহা বেচারা', আবার কেউ বলল — 'যেমন গেছিল রাজাকে অপমান করতে, এখন বোঝ, কত ধানে কত চাল।'

সন্ন্যাসী অবিচল রইলেন। তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। শান্ত স্বরে বললেন — তোমরা আমায় বধ করবে? তাতে কি যায় আসে?

রাজা সবাইকে শান্ত হতে বলল। তার পর সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করল — আপনি কেন আমাকে বোকা বলছেন? এত রাজ্য জয় করেও আমার সবটাই পরাজয় কেন বলছেন?

— তুমি অনেক রাজ্য জয় করেছ! কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু তোমার অবর্তমানে এ রাজ্যের উত্তরাধিকার কে নেবে, সে কথাটা একবার ভেবেছ? একবারও ভেবেছ কি,

তোমার প্রজারা কে কেমন আছে? তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ, ভালোমন্দের কথা কখনো ভেবেছ? যে রাজ্য শাসন করতে পারে না, যে রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে না, তার কেবল রাজ্য জয়ে, জয় হয় না। মানুষের মন জয় কর, নিজের উত্তরাধিকারী ঠিক কর।

রাজা বলল — তাও তো সত্যি। আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী কে?

সহসা রাজসভা থেকে সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গেলেন। কি আশ্চর্য ব্যাপার, একটা জল জ্যান্ত মানুষ চোখের পলকে কোথায় চলে গেল! সকলে অবাক হল। সকলে ভাবল এ ব্যক্তি নিশ্চই দেবতা। তাই সকলে যে যার অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হল। যে যার মত করে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। রাজা বিচলিত বোধ করতে লাগল। সে বেরিয়ে পড়ল ক্রান্তিনগরের পথে। সেখানে গিয়ে দেখল তার আসল রাজ্য যেন হতশ্রী। রাজদরবার আজ অনেক দিন বসে না। অনেক আবর্জনা জমেছে, মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই, পুরো রাজ্যটা শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

হিরণ্যবাহু বিলাসে দিন কাটাচ্ছে, বৃদ্ধ রাজা চিত্রবাহু বানপ্রস্থে গেছেন। সুতরাং রাজ্য কে দেখে? চিন্তায় পড়ল হিরণ্যবাহু, সত্যিতো তাঁর জীবিতাবস্থায় রাজ্যের যদি এই হাল হয় তাহলে তার বার্ধক্যে অথবা মৃত্যুর পর কি অবস্থা হবে? বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে সব কথা বলল। মন্ত্রী আগেই লোক মুখে সন্ন্যাসীর কথা শুনেছিলেন। রাজার কথা শুনে তাঁকে আর বেশি ভাবনা চিন্তা করতে হল না।

মন্ত্রী বললেন — তোমার রাজ্য তোমার সন্তান সন্ততিরাই দেখবে। এটাই স্বাভাবিক রীতি, কিন্তু তুমি বিবাহ কর নি। তোমার পিতা মাতা বানপ্রস্থে তাই তাঁরা তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করেন নি। তুমি যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত, তাই তোমার বিবাহের কথা মনে হয়নি। এখনো তোমার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয়নি, এইতো বিবাহের সময়। সুতরাং বিবাহের ব্যবস্থা কর। রাজ্যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পাঠিয়ে সংবাদ নাও কোন্ রাজ্যে বিবাহ যোগ্যা রাজকন্যা আছে।

মন্ত্রীর কথায় হিরণ্যবাহুর প্রথমে মনে পড়ল দেবদ্যুতির কথা। সেই নিতান্ত বালিকা দেবদ্যুতিকে সে এক দিনের জন্য দেখেছিল। আর সেদিনই নিজের অজান্তে মনের গহনে দেবদ্যুতিকে একটা স্থান করে দিয়ে ছিল। কিন্তু আজ যদি সে বেঁচেও থাকে তাহলে হয়তো গোপনে সে কোন সাধারণ প্রজাকে বিবাহ করে থাকবে, নয়তো পিতার সঙ্গে আত্মহত্যা করেছে। সে রকমইতো শোনা গিয়েছিল।

মন্ত্রীকে বললেন — ঠিক আছে আপনি ব্যবস্থা করুন, আমি বিবাহ করব।

দেবদ্যুতি নদীতে স্নান করতে চলেছে। সঙ্গে বিদ্যুন্মালা, কনককমলিকা আরো অনেক সমবয়সী মেয়ে। দূরথেকে কে যেন ডাকল — মা দেবদ্যুতি, তোমায় একটা কথা বলব।

থেমে দাঁড়াল মেয়ের দল। দেখল এক সৌম্য কান্তি সন্ন্যাসী অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে দেখে মেয়ের দল তাঁর কাছে গেল। সকলে একে একে তাঁকে প্রণাম করল। সকলকে আশীর্বাদ করে সন্ন্যাসী বললেন — দেবদ্যুতি, আমাকে তোমার একটা ছবি দেবে?

অবাক হল সবাই। সন্ন্যাসী কি করে তাদের নাম জানল। শুধু দেবদ্যুতি নয় একে একে সকলের নাম ধরে ধরে কথা বলতে লাগলেন সন্ন্যাসী। বললেন বুড়োছেলে মায়ের একটা ছবি চাইছে, দেবে না?

দেবদ্যুতি একবার ভাবল যে বলবে, তারতো কোন ছবি নেই। আবার ভাবল যে সর্ব্বজ্ঞ তাকে মিথ্যে বললে অপদস্থ হতে হবে। তাই মাথা নীচু করে রইল। সন্ন্যাসী বিদ্যুন্মালাকে বললেন — বিদ্যুন্মালা, তোমার বান্ধবী ভাবছে আমাকে মিথ্যে বলবে কিন্তু তোমরাতো জান তোমাদের সখি ভাল ছবি আঁকে, সে নিজের ছবি, প্রিয়জনের ছবি, সকলের ছবি এঁকেছে। বলনা, একটা ছবি আমায় দিতে।

কনকক্কমলিকা বলল - কি দেব?

রাজকন্যার ছোট্ট উত্তর - দে।

ছবি এনে দিল কনককমলিকা, সন্ন্যাসী সকলকে আর এক দফা আশীর্বাদ করে চলে গেলেন। এবার সকলে একযোগে হেসে উঠল। এই বুঝি দেবদ্যুতির বিয়ের ফুল ফুটবে। সন্ন্যাসী যখন তসবির নিয়ে গেলেন তখন নিশ্চই তিনি রাজকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ করবেন। সব কন্যারা দেবদ্যুতিকে ঘিরে গান ধরল —"বাজিবে সখি, বাঁশি বাজিবে"।

একান্তে সখিদের বলল রাজকন্যা -- তোরাতো জানিস্, আমি রাজ্য উদ্ধার না করে বিবাহ করব না, বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি। আর তাছাড়া তোদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। তোরা আমার দুঃখের দিনে সঙ্গে এসেছিস্। নিজের সুখ নিয়ে তোদের ছেড়ে স্বর্গেও আমি যাব না।

দুই সখি বলল -- বিয়ের সানাই বাজলে আর কারো কথা মনে থাকবে না।

ভোর রাতে দেবদ্যুতিকে স্বপ্নে দেখল রাজা হিরণ্যবাহু। কে যেন বলছে এই তোমার ভাবী স্ত্রী। একে খুঁজে নাও।

রাজার ঘুম ভাঙল। তার বুকের উপর রাখা একটি চিত্র। প্রদীপের আলোয় ভাল করে দেখল। বুঝতে পারল এই কন্যাকেই সে স্বপ্নে দেখেছে, কিন্তু চিনতে পারল না। প্রভাতে মন্ত্রীকে ডেকে রাতের স্বপ্নের কথা বলল। বলল — যেখান থেকে পারেন এই কন্যাকে খুঁজে আনুন।

প্রথমে চিত্রকর ডেকে প্রতিকৃতির প্রতিলিপি তৈরী করা হল। তারপর যেখানে যত রাজকন্যা ছিল তাদের সঙ্গে প্রতিকৃতি মিলিয়ে দেখা হল। কিন্তু কারো সাথে এই ছবির মিল হল না। তখন সেই ছবিগুলো হাতে দিয়ে দূতী পাঠানো হল দিকে দিকে, যেখানে যত অভিজাত, বণিক, সওদাগর আছে তাদের কন্যাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। না, সেখানেও খোঁজ পাওয়া গেল না।

অবশেষে রাজা হিরন্যবাহু বলল -- সাধারণ প্রজা, কৃষক সৈনিক আপামর জনগণের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখ, যেখানে এই কন্যাকে পাওয়া যায় তার সংবাদ এনে দাও।

সেই মত লোক জন ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে এক কুটনী সংবাদ আনল (*'কুটনী' হল প্রেমের দূতি*) — 'অরণ্য প্রান্তে এক কৃষক পরিবারে তিনটি ফুট্‌ফুটে কন্যা আছে, তাদের মধ্যে একজন অপরূপা সুন্দরী। রাজ রাজড়ার ঘরেই এমন সুন্দরী নারী মানায়।' গুপ্তচর

ছুটল সেই আরণ্য প্রান্তে যেখানে রাজা দেবপ্রিয় আত্মগোপন করে আছেন। গোপনে প্রতিকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখল, দেবদ্যুতির সঙ্গে হুবহু মিল আছে তার।

সংবাদ গেল রাজার কাছে। রাজা রাজ-পুরোহিতকে ডেকে পাঠিয়ে বলল -- যান, সেই কৃষকের বাড়িতে। আমার প্রস্তাব জানাবেন। একে বারে বিবাহের দিন ধার্য করে আসবেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিবিকায় আরোহন করে কৃষকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। জানালেন রাজার কথা। কৃষকবেশি রাজা দেবপ্রিয় বললেন -- না, রাজার সঙ্গে আমি আমার কন্যার বিবাহ দেব না। রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী পররাজ্য গ্রাসী।

আসলে রাজা ভয় পেলেন, একদিন যদি রাজা হিরণ্যবাহু তাঁর আসল পরিচয় জানতে পারে তবে ক্রুদ্ধ হবে এবং প্রতিশোধ নেবে। হয়তো বা রাজা তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেই দূত পাঠিয়েছে।

ব্রাহ্মণতো অবাক, রাজা বিবাহ করতে চাইছে, এ-তো এক জন কৃষকের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এ বুড়োটার কি মাথা খারাপ হয়েছে! সে বার বার তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। সখিরা রাজা ও রাজ-পুরোহিতের সংলাপ শুনছিল আড়ি পেতে। তারা রাজকন্যাকে সংবাদ দিল। দেবদ্যুতি বলল -- পিতাকে একবার অন্দর মহলে আসতে বল।

রাজাকে দেবদ্যুতি বলল -- মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। আমি তোমার কন্যা তাই আমি রাজকন্যা। তুমি কুমারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ঠিক কাজ করেছ।

-- কিন্তু মা, রাজার প্রস্তাব একবার আমি ফিরিয়ে দিলাম, তারপর তো সে জোর করে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। আমার উপর তার যে রাগ আছে তার প্রতিশোধ সে তোর উপর নেবে।

-- নিক, আর কিছু না পারলে মরতে তো পারব।

-- মরাটা খুবই সহজ কাজ মা, তাতে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। মৃত্যু অবসম্ভাবী, তাকে আগে ডেকে আনা কাপুরুষতার নামান্তর। সংগ্রাম করে বাঁচাটাই বাঁচা। সংগ্রাম করে মরাই মৃত্যু। অন্যথায় সবটাই কাপুরুষতা।

-- আমি রাজকন্যা, প্রয়োজনে তরবারি ধরব। আর কথা বলতে পারল না দেবদ্যুতি, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠদিয়ে ভাষা নিঃসৃত হল না। অন্য ঘরে ছুটে পালিয়ে গেল।

বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা বলল -- কি করলি সখি, কেন রাজার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলি। তুই যে সারাটা জীবন তার জন্যই পথ চেয়ে বসে আছিস্। কেন তোর এমন মরণ দশা ধরল।

রাজ-পুরোহিতকে রাজা দেবপ্রিয় বললেন -- পণ্ডিত মশায়, আপনি প্রত্যাগমন করুন। রাজাকে বলুন, রাজপুরীতে আমাদের মতো গরীব ঘরের মেয়ে মানাবে না, তিনি যেন কোন রাজকন্যার সন্ধান করেন।

ব্রাহ্মণ ভেবেছিল বৃদ্ধ অন্তঃপুর থেকে ফিরে এসে তার মত বদলাবে। কিন্তু বিপরীত কথা শুনে প্রথমে উপদেশ দিল তারপর ভয় দেখিয়ে প্রস্থান করল। সংবাদ শুনে রাজা হিরণ্যবাহু অগ্নিশর্মা হয়ে জ্বলে উঠল। বলল, এখনি এক শত সৈন্য পাঠিয়ে কন্যা সহ কন্যার পিতাকে বন্দী করতে। তারপর কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে রাজ দরবারে হাজির করতে।

এমন সময় সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। রাজাকে বললেন -- তুমি সত্যিই অবোধ। জীবন সঙ্গিনী যাকে করবে তাকে এভাবে জোর করে তুলে আনা যায় কিন্তু তার মন পাওয়া যায় না। তুমি কুটনী দূতী পাঠাও। তোমার প্রস্তাব নিয়ে সে যাক কন্যার কাছে। তার মতামত নাও। সে তো রাজি হলেও হতে পারে। প্রেমের রাজ্য আর রাজার রাজ্য এক নয়।

রাজকন্যার চোখে জল। ফুলের সাজি হাতে সখিদের সাথে শিব মন্দিরে পূজা দিতে গেল। মনের কথা দেবতাকে নিবেদন করল। বলল -- তুমিই বলে দাও ঠাকুর এখন আমার কি করণীয়। যে আমার আমার পিতামাতা সখিদের এত দুঃখের কারণ তাকেই আমি ভালবেসেছি। সেই এসেছে আমার কাছে, আমায় বরণ করে নিয়ে যেতে। কিন্তু আমি নিরূপায়।

কুটনী এল রাজার চিঠি নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গনে। রাজকন্যার হাতে গোপনে রাজার স্বহস্ত রচিত লিপি দিয়ে বলল -- কন্যা, তুমি পরম ভাগ্যবতী। সয়ং রাজা তোমায় পত্র লিখেছেন। তোমার ভাগ্যের তুলনা হয় না। তুমি রাজি হয়ে যাও। তোমার পিতাকে রাজি করাও। রাজবাড়িতে রাণী হয়ে থাকবে। এরচেয়ে সুখ আর কি আছে? তুমি সাধারণ বাড়ির মেয়ে, তাই বোঝ না, রাজপুরীতে কত সুখ।

কথা শুনে রাজকন্যা নিজের দু'কান হাত দিয়ে চেপে রাখল। সখিরা বুঝতে পারল কথাগুলো শুনে রাজকন্যার কষ্ট হচ্ছে। সে আর সহ্য করতে পারছে না। বিদ্যুন্মালা বলল -- বুড়ি, তুমি এখন যাও, আমাদের সখি এখন অসুস্থ বোধ করছে। কাল আবার এই সময় এখানে এসো, তোমাকে রাজার কথার উত্তর দেওয়া হবে। মন স্থির করতে সময় লাগবে।

নির্জনে বসে কনককমলিকা পত্র পাঠ করছে, দেবদ্যুতি শুনছে আর তার মন আনন্দে ভরে উঠছে। রাজার কথাগুলো তার কানে যেন সুধার মত লাগছে। যেই লিপি পাঠ শেষ হচ্ছে অমনি মনে আসছে সেই অপমানের কথা। যে পিতার রাজ্য কেড়ে নিয়েছে, যে তাদের সকলের এত লাঞ্ছনার কারণ তাকে স্বামী রূপে কি বরণ করে নেওয়া যায়? রাজকন্যা হয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে চির দিন থাকতে হবে। পিতার দুঃখ তাতে বাড়বে। নিজের দুঃখও কমবে না।

একবার কনককমলিকা আবার বিদ্যুন্মালা লিপি পাঠ করছে। যত বার শুনছে তত বারই মানসিক পরিবর্তন আসছে দেবদ্যুতির। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না। এমন সময় সেই সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। দূর থেকে ডাক দিয়ে বললেন -- তোমরা কি কোন চিন্তায় মগ্ন আছ?

লজ্জানত মুখে তিন কন্যা বলল -- প্রভু, আপনি সবই জানেন, আপনাকে অধিক কি বলল?

-- জানি মা, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি সুসময় আসছে তোমাদের। কিন্তু সবকিছুকে জয় করে নিতে হয়। রাজাকে জয় করে নাও। বিজয়ীর মর্যাদায় রাজার কাছে যাও, তবেই নিজেদের দাম পাবে।

বলেই সন্ন্যাসী অর্ন্তধান হলেন।

জয়! সন্ন্যাসী ঠিকই বলেছেন, জয়। জয় করার এই তো সুযোগ।

যথা সময়ে কুটনী এল দেব মন্দিরে। সোনার আখরে লেখা রাজকন্যার চিঠি নিয়ে গেল রাজার কাছে। পত্র পেয়ে রাজা হিরণ্যবাহু নানা উপহার দিল কুটনীকে। কুটনী চলে গেলে, কোটালপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র বলল -- বন্ধু চল, গোপনে পাঠ করা যাক। সর্বসমক্ষে প্রণয়-পত্র পাঠ করা উচিত নয়।

সভা ভঙ্গ করে নিরালায় বয়স্য মন্ত্রীপুত্র ধীর হস্তে লিপি উন্মোচন করল। একি প্রস্তাব! সকলে স্তম্ভিত। দেবদ্যুতি প্রস্তাব দিয়েছে -- তার সাথে রাজাকে একক তরবারি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। যুদ্ধে জয়ী হলে কন্যা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করবে। আর পরাজিত হলে রাজাকে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

কোটাল পুত্র বলল -- হাসালে বন্ধু, এ কেবল প্রণয়-পত্রেই থাকতে পারে। তোমার সঙ্গে একক তরবারি যুদ্ধ আহ্বান করছে একজন তরুণী। নিতান্ত ভাবী রাণী তাই, নাহলে এমন প্রস্তাবের সমুচিত উত্তর দিতে পারতাম।

মন্ত্রীপুত্র বলল -- দেখ সখা, পরমা সুন্দরী কন্যার রূপে ভুলে তুমি আবার বিনা যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিও না। শক্ত হাতে অসি ধরবে। কোন দুর্বলতা দেখাবে না।

রাজা হিরণ্যবাহু বলল -- কিন্তু এহেন প্রস্তাব কি মেনে নেওয়া যায়?

না-মানলে সকলে বলবে রাজা ভয় পেয়েছেন। তাতে তোমার অসম্মান হবে। রাজার পৌরুষে আঘাত লাগবে। আর সেই কন্যার সঙ্গে যুদ্ধ করলে তুমি যে জিতবে সে বিষয়তো কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কন্যা লাভের জন্য যুগে যুগে রাজপুত্রদের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এতে লজ্জার কিছু নেই। বরং এই আহ্বানে সাড়া না দিলে, তোমার অপযশ হবে।

রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। রাজার সংগে যুদ্ধ হবে এক যুবতীর। দিন ক্ষণ স্থির হল। কৌতূহলি মানুষ জড় হতে লাগল অরণ্য প্রান্তের ছোট্ট গ্রামে। হাজার হাজার দর্শক ভীড় করল, দৃষ্টিগোচর করতে বহু মানুষ গাছের ডালে, নিকটবর্তী বাড়ির ছাদে উঠে পড়ল। কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। বাজল রণ-তুর্য। সৈনিক বেশে রাজা অবতীর্ণ হলেন। অপেক্ষায় আছে হাজার হাজার দর্শক।

তিনটে বলিষ্ট ঘোটকিতে আরোহন করে তিন কন্যা এসে থামল প্রতিযোগীতা স্থলে। রাজকন্যা রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো যোদ্ধ বেশে। রাজকন্যার গায়ে সোনার আভরণ। গলায় সাত নরী হার, মুক্তোর মালা ঝলমল করছে, বাহুতে অঙ্গদ, মণিবন্ধে বলয় কঙ্কন।

কপালে সিঁথলি, কবরিতে সোনার চিরুণী। ঠিক যেন দেবী দুর্গা, অসুর নিধনে অবতীর্ণা। দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন। মুগ্ধ হল দর্শকবৃন্দ।

বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা দু'টি বিশাল বিশাল রূপোর থালায় দুটি সুবৃহৎ সোনার তরবারি নিয়ে এগিয়ে এল। তরবারির হাতল মহামূল্যবান প্রস্তর নির্মিত, তাতে হিরে মুক্তো প্রভৃতি দামী পাথর বসানো। তরবারি থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ তরবারি অনেকের চেনা। প্রায় সকলেই অস্ত্র প্রতিযোগীতার সময়ে এই তরবারি দেখেছে। সখিরা একটি তরবারি দেবদ্যুতির দিকে এবং অপরটি হিরণ্যবাহুর দিকে এগিয়ে দিল।

রাজা সোনার তরবারি তুলে নিয়ে বুঝতে পারল এই কন্যা কে। রাজা বলল — তুমি কি মহারাজা দেবপ্রিয়-র কন্যা দেবদ্যুতি?

— পরিচয় করার সময় এটা নয়, আপনি যুদ্ধ করুন।

অভুতপূর্ব যুদ্ধ শুরু হল। রাজা হিরণ্যবাহু বার বার পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে লাগল। রাজকন্যা রাজাকে জায়গা করে দিতে পিছিয়ে আসছে, আবার যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে, এভাবে যুদ্ধে প্রমাদগণলেন রাজা হিরণ্যবাহু। তাঁর মনোবল ভেঙে গেল। আচমকা যুদ্ধের রীতি ভঙ্গ করে রাজা তরবারি নীচু করলেন , দেবদ্যুতির বাহুতে তরবারির খোঁচা লাগল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। চমকে উঠলেন রাজা দেবপ্রিয়, স্তম্ভিত হল বিদ্যুন্মালা-কনককমলিকা, উল্লাসে চিৎকার করে উঠল মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র সহ রাজার অনুচরবৃন্দ।

আহত বাঘিনীর মত গর্জে উঠল দেবদ্যুতি। প্রচণ্ড আঘাত হানল সে। সেই আঘাত সামলাতে না পেরে রাজার হাত থেকে তরবারি ছিটকে নিজের কপালে আঘাত করে পাক খেতে খেতে চলেগেল বহু দূরে। নিজের তরবারির হাতলে কপালে আঘাত পেল রাজা হিরণ্যবাহু। তার মাথা ফেটে গেল। রাজা অজ্ঞান হয়ে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল। দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে গেল। থেমে গেল সকলের উচ্ছ্বাস। সখিরা বলল — একি করলি পোড়াকপালি!

রাজকন্যা দেবদ্যুতির ঘরে সাধারণ শয্যায় শায়িত রাজা হিরণ্যবাহু। দেশের সেরা বৈদ্য চিকিৎসা করছে রাজাকে, ব্যজনে হাওয়া দিচ্ছে বিদ্যুন্মালা, কনককমলিকা। সেবা করছে রাজকন্যা। ঘরে একমাত্র কোটালপুত্র আর মন্ত্রীপুত্রের আসার অনুমতি আছে। রাজ বৈদ্য আশা ছেড়ে দিলেন। বললেন — 'এঁকে বোধহয় আর বাঁচান গেলনা।' কপালে আঘাত হেনে হাহাকার করে উঠল দেবদ্যুতি।

দুঃসংবাদ পেয়ে রাজা চিত্রবাহু বানপ্রস্থ থেকে রাণীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন পুত্রকে দেখতে। তাঁদের সামনে করজোড় করে দেবদ্যুতি বলল — পিতা, মাতা, আমায় ক্ষমা করবেন না, আমি আপনার পুত্রকে হত্যা করেছি। আমায় শাস্তি দিন। আমাকে বধ করুন।

তার হাত দুটি ধরে রাণী বললেন — মা তুমি বীরাঙ্গণা। যুদ্ধ করে আমার পুত্র পরাজিত হয়েছে। তুমি তার নিমিত্ত মাত্র। আমরা পুত্রশোকে কাতর তবু তোমার বীরত্বে মুগ্ধ। কিন্তু মা, তুমিতো সাধারণ কৃষককন্যা নয়। তুমি যে রাজকন্যা। রাজকন্যার মতোই কাজ করেছ।

এমন সময় সেই সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে দেবদ্যুতি ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। প্রভু আমার স্বামীকে রক্ষা করুন। আমার জীবনের বিনিময়ে আপনি রাজপুত্রকে বাঁচান।

সন্ন্যাসী বললেন — সেকি মা, তোমারতো বিবাহ হয় নি?

— আপনি অন্তর্যামি, আপনার কাছে কিছু অজানা নেই। আপনি কপটতা করবেন না। আপনি জানেন সেই তরবারি প্রতিযোগীতার দিন নিতান্ত বালিকা অবস্থায় আমি কুমারকে ভালবেসেছি। মন দিয়েছি। নারীর মন যার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেইতো তার স্বামী, কেবল পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে আমি তরবারি ধারণ করেছিলাম। কিন্তু আমি কুমারকে আঘাত করি নি। তাঁরই হাতের তরবারির হাতলের আঘাতে তাঁর এই অবস্থা।

সন্ন্যাসী বললেন — কিন্তু মা, কারো যদি মৃত্যু থাকে তুমি নিবারণ করবে কি করে?

উচ্চস্বরে কাতর চিৎকার করে রাজকন্যা বলল, 'আমি জানিনা।' বলেই সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে পড়ে সংজ্ঞা হারাল।

বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা রাজকন্যার আঁকা ছবিগুলি এনে সন্ন্যাসীর সামনে মেলে ধরল। বলল — ঠাকুর, দেখুন, আমাদের সখি কেমন সারা জীবন কুমারের ছবি এঁকেছে। তার সারাটা মন প্রাণ জুড়ে একমাত্র কুমারই রয়েছ। আপনি দয়া করে কুমারের প্রাণ দান করুন। বৈদ্যরাজ জবাব দিয়েছেন বটে, তবু এখনো তাঁর শরীরে প্রাণ আছে, আপনি দয়া করুন।

সকলে জানতে পারল দেবদ্যুতির ভালবাসার কথা। জানতে পারল এরা আসলে কে। সন্ন্যাসী দেবদ্যুতির হাত ধরে তুলে বললেন — ওঠো মা, সংসারে কিছুই সাধনা ছাড়া হয় না। তুমি যদি তোমার স্বামীকে বাঁচাতে চাও তবে তোমাকে একটি ব্রত পালন করতে হবে।

-- আদেশ করুন।

— আজ থেকে তিন সপ্তাহ নিরম্বু উপবাস করে শিব পূজায় মনোনিবেশ করতে হবে, অন্যথায় তোমার স্বামীর জীবন তুমি ফিরে পাবে না। আর এই ঔষধি তোমাকে প্রদান করলাম, এটা নিষ্ঠা ভরে ক্ষতে প্রলেপ দেবে। তুমিও তো আহত। তোমার ক্ষতে একই প্রলেপ দিও। তোমরা দু'জনেই সেরে উঠবে।

সন্ন্যাসী রাজা দেবপ্রিয় এবং চিত্রবাহুর দিকে তাকিয়ে বললেন — এদের কি হবে? মন্ত্রীপুত্র আর কোটাল পুত্রের সাথে এদের বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

পলকের মধ্যে সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হলেন। তিন সপ্তাহ রাজকন্যা জল স্পর্শ করে নি। তার মুখশ্রী শীর্ণ হয়েছে। রাজা হিরণ্যবাহু সুস্থ হয়ে উঠলেন। দেখলেন তাঁর পাশে বিদ্যুন্মালা আর কনককমলিকা রয়েছে। জানতে চাইল — সেই কন্যা কোথায় যে আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করেছে? সে তো দেবদ্যুতি ছাড়া আর কেউ নয়?

সখিরা জানাল, সে গেছে মন্দিরে পূজো দিতে।

রাজা ডাকলেন — রক্ষি, প্রহরী ....

সখিরা হেসে বলল — কেউ নেই, কেউ আসবে না।

দেবদ্যুতি ফিরে এসে রাজার মাথায় প্রসাদী ফুল ছোঁয়াল। রাজা জানতে চাইল - তাহলে কি আমি বন্দী?

সখিরা সহাস্যে উত্তর দিল — হ্যাঁ, তবে শৃঙ্খলে নয়। আমাদের সখির ভালবাসায়।

বিধি মত শাস্ত্র পাঠ করে রাজকন্যার সঙ্গে রাজা হিরণ্যবাহুর বিবাহ হল। মন্ত্রী পুত্রের সাথে বিবাহ হল বিদ্যুন্মালার আর কোটাল পুত্রের সঙ্গে কনককমলিকার। রাজ্যের মানুষ অংশ নিল সেই উৎসবে, পার্শ্ববর্তী রাজা, রাজপুরুষ, অধীনস্থ রাজা সকলে এলেন। হিরণ্যবাহু বলল — আমি সমস্ত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দেব। সবাইকে স্বাধীন করে দেব।

নবদম্পতি হিরণ্যবাহু আর দেবদ্যুতি প্রণাম করল রাজা দেবপ্রিয়কে। তারপর হিরণ্যবাহু বলল — পিতা, আমি আপনার কাছ থেকে যৌতুক প্রার্থনা করি।

রাজা বললেন - তোমায় তো আমার অদেয় কিছু নেই। কিন্তু তোমাকে দেবার মতো আমার কিই বা আছে?

— সেই সোনার তরবারির একটি আমি প্রার্থনা করি। ইচ্ছা করলে এর চতুর্গুণ সোনা দিয়ে এক শত তরবারি আমি নির্মাণ করতে পারি, কিন্তু এ তরবারির এক আলাদা ঐতিহ্য আছে।

রাজা দেবপ্রিয় বললেন — তোমাকে দু'টো তরবারিই প্রদান করলাম।

শরৎ সমাগত। অনেক বছর পর আবার শুরু হল উৎসব। শুরু হল তরবারি প্রতিযোগীতা। এলেন দেশ বিদেশের রাজা জমিদার সওদাগর বণিক ব্যবসায়ী সাধারণ দর্শনার্থী। এবার উৎসব উদ্বোধন করতে এগিয়ে এলেন তরবারি হাতে রাজা হিরণ্যবাহু আর রাণী দেবদ্যুতি।
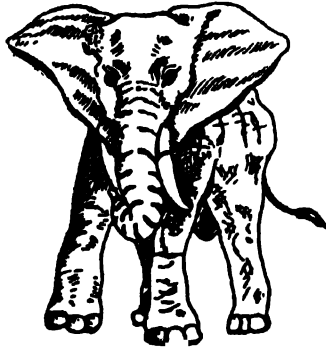
কনকপ্রভা কাঞ্চনপ্রভা

জেঠুর আসরে যথারিতি হাজির গল্পশ্রোতার দল। জেঠু কেবল জেঠিমার অপেক্ষায়। চা না হলে জেঠুর মাথা যেমন ছাড়ে না, তেমনি মনও পরিস্কার হয় না। তাই গল্পও আসে না। এদিকে অস্থির ভোলা, পলা, অতসী, নীলু, ঝুম্পা, মিতা, ভাবনা। মিতা ছুটে গিয়ে জেঠিমাকে তাগাদা দিতে লাগলো। তারপর জেঠিমার উল্টো তাড়া খেয়ে পশ্চাদ্‌পসারণ করলো।

মিতার গোমড়া মুখ দেখে জেঠু তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করে পাশে বসিয়ে বলতে লাগলেন — শোন, একটা নয় তোর মতো দুটো ফুটফুটে মেয়ের গল্প বলি।

মিতার গোমড়া মুখে হাসি ফুটলো, এদিকে জেঠিমাও এসে হাজির হলেন। চা মুড়ি পরিবেশন করতে করতে ঝঙ্কার দিলেন — ভালো গল্পের দল বানিয়েছো। লেখা পড়ার বারোটা বাজিয়ে, বসলে গল্প নিয়ে। আর তোরাও তেমনি, একটু খেলা ধুলো করলেই তো পারিস্, গল্প গল্প সারাদিন।

জেঠিমা যেমন বাকাবকি করেন তেমনি ভালোও বাসেন। আসলে এটা তাঁর স্নেহের বকুনি। সাময়িক রসভঙ্গের পর জেঠুমনি আবার আরম্ভ করলেন—

উদ্ভুটপুর দেশে রাজা ছিলেন সূর্যকেতু। তাঁর ছিল দুই রাণী। তবে কেউ ছোট নয় কেউ বড়ও নয়। অর্থাৎ রাজা এক সঙ্গে দু'জনকেই বিবাহ করেছিলেন। সেই বিয়ের কথাটা আগে বলি। রাজা ছিলেন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত, এবং তাঁর সময় সম্বন্ধে খুব সতর্কতা ছিল। রাজা থাকবে রাণী থাকবে না, সেটাতো ভালো মানায় না। তাছাড়া রাজাতো দরবার সামলাবেন, অন্দমহলে নানা ঘটনা ঘটতে থাকলে সামলানোর লোক কোথায়? তাই রাজার বিবাহ করা প্রয়োজন। তিনি এক দিন রাজ পুরোহিতকে ডেকে বললেন — গুরুদেব, আপনি আমার জন্য কন্যা দেখুন। আমি নিজে পছন্দ করে বিবাহ করব। কিন্তু সময় যে বড় অল্প। বিবাহের জন্য বেশ কয়েকটি দিন নষ্ট হবে। সে জন্যই আমি চিন্তিত।

পুরোহিত বললেন — কি বলছেন মহারাজ। আপনি প্রথম বিবাহেই এত চিন্তিত। এরপর তাহলে ....

রাজা — তার মানে ...

— মানে, রাজারা সাধারণতঃ বহু-বিবাহ করে থাকেন। বেশির ভাগ রাজার পাঁচ সাত জন রাণী থাকেন। আপনার নিজের পূর্বপুরুষের কথাই ভাবুন না। তিনের কমতো নয়, আপনার প্রপিতামহ একুশটি বিবাহ করে ছিলেন। তাঁর রাণীদের তৈল চিত্র তাঁর শয়ন কক্ষে এখনও শোভা পাচ্ছ। রাণীদের নিরুপদ্রব বসবাসের জন্য তিনি সুরম্য রাণীমহল

বানিয়ে ছিলেন। তাঁর সেই বিবাহের কাহিনী বংশ পরম্পরায় প্রজারা স্মরণ করে চলেছে। সুতরাং আপনি অন্ততঃ তিনটি বিবাহতো করবেন।

রাজা বললেন — না না, এতগুলো বিয়ে করতে গেলে অনেকটা সময় অযথা নষ্ট হবে। তারচেয়ে বরং আপনি দু'টি মাত্র কন্যার সন্ধান করুন। আমি একসাথে দু'জনকে বিবাহ করবো। তাতে সময়ও বাঁচবে, বহু বিবাহও হবে। তবে প্রকৃত সুন্দরী এবং রাজকন্যা হতে হবে। যাতে প্রপিতামহের একবিংশতমার চেয়ে আমার দ্বিতীয়া বেশি রূপবতী হয়। আর এই কথাটা প্রজাদের মধ্যে ঘোষনা করে দেবেন।

সেই মতো রাজপুরোহিত রাজকন্যার সন্ধানে চললেন। আর রাজ্যের মধ্যে সেই কথা ছড়িয়ে পড়লো। সকলে অধীর আগ্রাহে অপেক্ষা করতে লাগলো। সবাই ভাবলো এবার পেটভরে রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ খেতে পারবে। আনন্দ করতে পারবে। জোড়া রাণী ঘরে আসবে। সুতরাং রাজকার্যে কিছু দিন ভাঁটা পড়বে। সেই আনন্দে রাজকর্মচারীরা যে যার মতো কাজে ফাঁকি দেওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো।

দেশে দেশে ঘটকরা ছড়িয়ে পড়লো রাজকন্যার খোঁজে। যে দেশে বিবাহযোগ্যা রাজকন্যা আছে সেখানে গিয়ে রাজা সূর্যকেতুর গুণপনা ও রূপের বর্ণনা দেয় ঘটকরা। রাজা রাজকন্যাদের মতামত জানতে চাইলে সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের প্রতিকৃতি নিয়ে রাজা সূর্যকেতুকে দেখানো হয়। রাজার সূর্যকেতুর কিন্তু মেয়ে পছন্দ হয় না। অবশেষে পুরোহিত গেলেন এমন একটি দেশে যেখানে এক রাজ্যে দু'জন রাজা রাজত্ব করেন।

কর্ণ আর সুকর্ণ দুই ভাই। নিয়ম অনুযায়ী বড় ভাই কর্ণ রাজা হবেন। কিন্তু কর্ণ বললেন না, তা হবে না। একজন রাজা হবে অন্য জন বঞ্চিত হবে, সে কি করে হয়। পিতার রাজ্যে দু'ভাই সমান। দু'ভাই ভাগ করে রাজা হবো। তাহলে উপায়? উপায় একটা আছে, রাজ্য ভাগ করে ফেলে দুই ভাগে দু'জন রাজা হওয়া।

কিন্তু সেটা বিচক্ষণতার কাজ নয়। রাজ্য বিভক্ত হলে ক্ষমতা হ্রাস হবে। মর্যাদা হানি হবে। যে রাজ্য যত বড় হয় সে রাজ্যের রাজার তত বেশি সম্মান। ছোট রাজ্যের রাজাকে কেউ সম্মান দেয় না। তাই শলাপরামর্শ করে একটি সিদ্ধান্তে আসা হলো। দু'জনই রাজা হবেন। বড় ভাই বড় রাজা আর ছোট ভাই ছোট রাজা। যেমন পিতার বর্তমানে উপযুক্ত পুত্র যুবরাজ হয়ে রাজ্য শাসন করে, আর বৃদ্ধ রাজা সেই শাসনের অনুমোদন দিয়ে থাকেন, তেমনি ছোট রাজা রাজ্যের যাবতীয় কাজকর্ম দেখা শোনা করবেন, আর বড় রাজার কাছ থেকে সেই কাজের অনুমোদন গ্রহণ করবেন। দু'জনেই পাশাপাশি দু'টি সিংহাসনে রাজসভায় উপবেশন করবেন।

রাজ-পারিষদরা তাতে সায় দিলেও মনেমনে ভাবলেন, গেল বুঝি দেশটা। দু'ভায়ে ঝগড়া অনিবার্য। আর সেই ঝগড়ায় দেশটা গোল্লায় যাবে। দেশে অরাজকতা দেখা দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ঘটনা অন্যরকম। দু' ভাই মিলে মিশে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কোথাও কোন বিরোধ নেই দুই ভাইতে। রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। যথা সময়ে দুই রাজার দুই রাণী দু'টি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এখন রাজকুমারীরা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

রাজপুরোহিত নিজে গেলেন সেই কন্যাদের সন্ধানে। রাজা কর্ণ ও সুকর্ণের কাছে রাজকন্যাদের বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাব শুনে তাঁরা আহ্লাদিত হলেন। পুরোহিতকে যথা সম্মানে সমাদৃত করে অতিথি ভবনে বিশ্রাম করতে বললেন। এবং রাজকন্যার মতামত জেনে যথা সময়ে তাঁকে জানানো হবে বলেও পুরোহিতকে বলা হলো। কিন্তু মজা হল রাজকন্যা দু'জন তাদের মা'কে জানিয়ে দিল যে, তারা রাজা সূর্যকেতুর বীরত্বের কথা শুনেছে। তবে আগে তারা রাজার প্রতিকৃতি দেখতে চায়। প্রকৃত রূপবান পুরুষ না হলে তারা বিবাহ করতে রাজি নয়। কারণ তারা মনে করে যে তাদের চেয়ে সুন্দরী কন্যা আর ভূ-ভারতে নেই। সুতরাং তাদের স্বামী হবে তাদের উপযুক্ত সুন্দর ও সুপুরুষ।

রাজপুরোহিত আবাক হলেও অন্যায় মনে করলেন না। কারণ ভারতীয় নারীর নিজের পাত্র পছন্দ করার অধিকার প্রাচীন কাল থেকে রয়েছে। সেকালে স্বয়ম্বর সভা করে রাজকন্যারা নিজেদের স্বামী পছন্দ করতেন। আবার কন্যার পিতারা নানা প্রকার পণ রাখতেন, যেমন লক্ষ্যভেদ, ধনুভাঙা ইত্যাদি। সুতরাং রাজকন্যারা তাদের মনের কথা ব্যাক্ত করে কোনো অপরাধ করে নি।

রাজপুরোহিত রাজা সুর্যকেতুর কাছে কর্ণ ও সুকর্ণর মেয়েদের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। শুনেতো রাজা প্রচণ্ড রুষ্ট হলেন। কি, এত স্পর্ধা! এত রূপের দেমাক! সেনাপতি রণ সজ্জা কর। জোর করে তুলে আন কন্যাদের। তারপর যদি সত্যিই তারা রূপবতী হয় তবে তাদের আমি বিবাহ করে রাণীর মর্যাদা দেবো, নয়তো তাদের রাজবাড়িতে দাসী করে রাখবো।

মন্ত্রী বললেন--মহারাজের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু মহারাজ, এই প্রস্তাবে আপনার কূপিত হবার কোন কারণ নেই। রাজকন্যাতো নিজেদের স্বামী পছন্দ করতেই পারে। তার ওপর আপনিতো কন্দর্প নিন্দিত রূপ ধারণ করে আছেন। আপনাকে অপছন্দ করার মতো দুঃসাহস কোন রাজকন্যার হবে না।

বিদুষক হেসে বলল — মহারাজ বিবাহের পূর্বে ল্যাং খেয়ে গেলেন, পরে কী না কী হয়?

রাজা সূর্যকেতু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন — মন্ত্রী তুমি যথার্থ বলেছো।

বিদুষক বলল — মহারাজ যথার্থ বুদ্ধিমান। কেন না তিনি বুঝতে পারছেন না যে, কর্ণ আর সুকর্ণ যুক্তি করে রাজাকে ল্যাং মারছে। রাজকন্যারা মোটেই এমনতর কথা বলে নি। রাজা কর্ণ আর সুকর্ণ আমাদের রাজাকে অপমান করতে চায়, তাই তারা এ কথা কন্যাদের নাম করে বলেছে। ছবি দেখে রাজকন্যাদের হয়ে তারাই বলে দেবে যে, আমাদের রাজাকে তাদের মেয়েদের পছন্দ হয় নি, আর রাজা ল্যাং খেয়ে কাৎ — হে হে হে।

রাজা বললেন - ঠিক কথা ...

মন্ত্রী বললেন - ঠিক কথা ...

সেনাপতি বললেন — ঠিক কথা ...

কোটাল বললেন - ঠিক কথা ...

সভাসদগণ বললেন — ঠিক কথা ...

সাজো সাজো রব পড়ে গেল রাজ্যে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। প্রজারা প্রমাদ গুণলো। সৈনিকেরা যুদ্ধ উন্মাদনায় মেতে উঠল। লুটেরা, বাটপাড় সক্রিয় হয়ে উঠলো।

এদিকে সংবাদ পাঠিয়ে রাজকন্যা দু'জন উন্মনা হয়ে রইল রাজার ছবি দেখার জন্য। সখিদের সাথে জলের ঘাটে এই নিয়ে আলোচনা চলছে। রাজপ্রাসাদের অন্তরালে পুস্করিণী। সেখানে কোন পুরুষের উপস্থিতির অনুমতি নেই। হঠাৎ সেখানে এক সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন। সকলে পুরুষ দেখে অবাক হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারছে না, প্রহরী বেষ্টিত প্রামোদ কাননের সরোবর তীরে অপরিচিত পুরুষ এলো কি করে। আবার ভাবলো সন্ন্যাসীতো, তাই বোধ হয় কেউ বাধা দেয় নি। আউদর লম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু (*দাড়ি*) দুলিয়ে সন্ন্যাসী বললেন -- বৎসে, তোমরা রাজা সুর্যকেতুর প্রতিকৃতি দেখার জন্য অপেক্ষা করে আছো। মানছি তিনি যথার্থই সুরুষ ও সুন্দর তবু বলি, এই ছবিটি একবার দেখতো। দেখবে ইনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষ।

বলেই দু' জনকে দুটি ছবি দিলেন এবং বলে দিলেন ওরা যেন একে অপরকে সেই ছবি না দেখায়।

রাজকন্যা দু'জনে আপন মনে ছবিতে মনোনিবেশ করে আছে। অপরূপ সুন্দর এক যুবকের ছবি তাদের হাতে। দু'জনে যখন মুগ্ধ নেত্রে যে যার ছবি দেখছে তখন সন্ন্যাসী অন্তর্ধান হয়ে গেলেনে। চোখ ফিরিয়ে তারা আর সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল না। দাসীরাও রাজকন্যাদের বিহ্বলতায় নিজেরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল তাই তারাও সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করে নি। হুঁস্ ফিরলে তারা সন্ন্যাসীর খোঁজ করলো, যুবকের পরিচয় জানার জন্য, কিন্তু পেলো না।

দু'জনই ছবি দেখে মুগ্ধ হলো। কিন্তু কেউ কাউকে ছবি দেখালো না, অথচ একে অপরের ছবি দেখে নেবার চেষ্টা করলো, আর না দেখতে পেয়ে একে অপরের ওপর রাগ করলো কিন্তু মুখে কাউকে কেউ কিছু বলল না। কারণ সন্নাসীতো বারন করে দিয়েছেন। তারা একে অপরের প্রতি অযথা হিংস্র হয়ে উঠলো। কন্যারা আপন আপন মায়ের কাছে গিয়ে আবদার করতে লাগলো, যার প্রতিকৃতি সন্ন্যাসী দিয়ে গিয়েছে সেই তাদের উপযুক্ত বর। সে যেই হোক, তাকে সে বিয়ে করবে। সুতরাং বাবা যেন সেই ব্যক্তির খোঁজ করেন। উভয়ে তাদের মায়েদের বলে দিল, এই ছবি যেন পিতাকে ছাড়া আর কাউকে দেখানো না হয়, সন্ন্যাসী নিষেধ করে দিয়েছেন।

কন্যার পিতারা যখন ছবি দেখলেন, তাঁরা দেখলেন এক বিভৎস বিবর্ণ বৃদ্ধের ছবি। তার সামনের দন্তপাঁতি ওষ্ঠ বিদীর্ণ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পরণে শত ছিন্ন মলিন বসন। দেখেতো তাঁরা ভিরমি খেয়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবলেন নিশ্চয় তাঁর মেয়ে কোনো যাদুকরের পাল্লায় পড়েছে। সুতরাং তাঁরা যে যার ছবিটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। দু' ভায়ের মধ্যে মিল থাকলেও নিজ নিজ কন্যার কথা কেউ কাউকে বললেন না। কারণ পিতার কাছে কন্যার স্বার্থ সবচেয়ে মূল্যবান।

এদিকে রাজঅন্তঃপুরে যখন রাজকন্যারা আপন আপন স্বামী নির্বাচনের চিন্তায় মগ্ন তখন সূর্যকেতু কর্ণ-সুকর্ণের রাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ বেধে গেল। দুই রাজা তরবারি ধারণ করলেন। সৈন্যরা প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু সূর্যকেতুর সৈন্যদের পরাক্রমের কাছে তারা পিছু হটতে লাগলো। বিপদের আশঙ্কা করলেন কর্ণ আর সুকর্ণ। চর মারফত সংবাদ পেলেন যে রাজকন্যাদের জন্য এই যুদ্ধ। জরুরী মন্ত্রণায় স্থির কররা হলো রাজা সূর্যকেতুর হাতে রাজকন্যাদের তুলে দেওয়া হবে। সসম্মানে রাজার সঙ্গে রাজকন্যাদের বিবাহ দেওয়া হবে।

কিন্তু রাজকন্যারা তাদের সেই তসবিরের কথা ভুলতে পারে না। তারা সন্ন্যাসী যার ছবি দিয়েছিলেন সেই যুবক ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু রাজার আদেশে কন্যাদের রাজি হতেই হলো। উপায় নেই। শত্রুর হাতে দেশ বিপন্ন। সুতরাং কন্যাদের কথা শুনলে তো আর চলবে না। ক্ষোভে দুঃখে রাজকন্যাদ্বয় চোখ বন্ধ করলো।

সাদা পতাকা উড়িয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হলো। মন্ত্রী নিজে এসে রাজা সূর্যকেতুর সাথে দেখা করে বললেন — আমাদের রাজা সূর্যকেতুর অভিপ্রায় আগে বুঝতে না পারায়, যুদ্ধ বেধেছে। তা না হলে শ্বশুর জামাইতে যুদ্ধ মানায় না। আমাদের রাজাতো তাঁদের মেয়ের বিবাহ দিতে সম্মত হয়েই ছিলেন। কেবল কন্যারা রাজা সূর্যকেতুর প্রতিকৃতি দেখতে চেয়েছিল, এই যা। এতে সূর্যকেতুর বিরূপ হবার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং যা হবার ত হয়েছে এখন সসম্মানে তিনি যেন প্রাসাদে আসেন। রাজ্যের ভাবী জামাইকে বরণ করতে পুরাঙ্গনারা তোরণে উপস্থিত থাকবে।

কিন্তু সূর্যকেতু বললেন, না, সে হবে না। তা হলে তাঁর প্রজারা ভুল বুঝবে। ভাববে, রাজা রাজকন্যাদের রূপ দেখে ভুলে গেছেন। সুতরাং রাজকন্যাদের চোখ বেঁধে শিবিকায় চাপিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা বিবাহের পূর্বে রাজাকে দেখতে না পায়। তবে রাজকন্যাদের দাসী বানাবার সংকল্প তিনি ত্যাগ করলেন। যথার্থ মর্যাদায় তাদের রাণী করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রাজকুমারী ও তাদের পিতামাতার কাছে এটুকুই সান্ত্বনা।

কী আর করা যাবে, 'পরাজিতস্য মূর্খস্য কাকস্য পরিবেদনা।' রাণীরা কাঁদতে লাগলেন, কন্যারা কাঁদতে লাগল। রাজকন্যাদের চোখ বেঁধে শিবিকায় তোলা হলো। নিশ্চয় দুষ্টু রাজা তাদের ওপর অত্যাচার করবে। রাজাদের মধ্যেও একই আশঙ্কা রইলো। তবু যেতে হলো। কন্যাদের মনের মধ্যে রইল সন্ন্যাসীর দেওয়া সেই ছবি।

পথিমধ্যে বাহকরা পাল্কি রেখে বিশ্রাম করছে, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী হঠাৎ আবির্ভাব হয়ে তাদের হাতে একটি করে প্রতিকৃতি দিলেন। বললেন এই হল তাদের ভাবী স্বামীর চিত্র, যাকে তারা বিবাহ করতে চলেছে। তবে এবার ওদের একে অপরকে দেখাতে বারন করলেন না। চোখ খুলে দেখে আঁৎকে উঠলো রাজকুমারীরা, একি বিভৎস ছবি। যেমনটি কর্ণ-সুকর্ণ দেখেছিলেন তেমনি। রাজকন্যারা অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

এক সময় তারা প্রাসাদে এলো। একে অপরকে দেওয়া ছবি দেখে মুগ্ধ হলো। যাকে যে ছবিটা দিয়েছেন সন্ন্যাসী, সেটা সে কুৎসিত দেখছে, অপরেরটা সুন্দর দেখছে। খুব মজার জিনিস। এক জনকেই দু'জনে বিবাহ করতে চলেছে অথচ নিজেরটা কুৎসিত অপরেরটা সুন্দর। তাই একে অপরের প্রতি আরও প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে উঠলো।

যথা নিয়মে বিবাহ হলো তাদের। বোনেদের মধ্যে যে বড় সে হল বড় রাণী আর ছোট জন হল ছোট রাণী। বিবাহের পর যখন তারা চোখ খুলে বাসর ঘরে রাজাকে দেখলো তখন বুঝতে পারলো সন্ন্যাসী প্রথম বার যে ছবি তাদের দিয়েছিলেন সেটাই প্রকৃত সূর্যকেতুর ছবি। সেই থেকে সূর্যকেতু দুই স্ত্রী নিয়ে ঘর করতে লাগলেন।

দুই বোন রাণী হয়ে রইলো বটে, কিন্তু রাজার রূপগুণ দেখে তারা এতই মুগ্ধ হলো যে অকারণে একে অপরের প্রতি একটা হিংসার মনোভাব নিয়ে চলতে লাগলো। তাদের খালি মনে হতে লাগলো রাজা বুঝি অপরকে বেশি ভালোবাসেন।

বিবাহের পর রাণীদের নিয়ে সূর্যকেতু শ্বশুরালয়ে গেলে, দুই মা দু'জনকে যথার্থই মন্ত্রণা দিলেন স্বামীকে নিজের বশে রাখার জন্য। তাতে ওদের মধ্যে প্রতিযোগীতা আরো বেড়ে গেল। বাড়ি ফিরে দু'জনে দু'টি মহলে বাস করতে লাগলো। দু'জনের চেষ্টা কে কত বেশি সময় তার স্বামীকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে, কে কত বেশি, কত বড় উপহার আদায় করতে পারে।

কিন্তু রাজা অতি চতুর ছিলেন। দু'জনকেই সমান ভালোবাসতে চেষ্টা করলেন। অথচ তারা কেউই তাতে সন্তুষ্ট নয়। তারা কেবল চায় দামী দামী উপহার। বেশিক্ষণ স্বামীকে কাছে রাখতে। রাজাকে কে কত ভালোবাসে তা পরীক্ষা করতে একদিন দরবার থেকে অন্দর মহলে আসার সময় রাজা একটি পাথরের টুকরো পকেটে করে নিয়ে এলেন। রাণীর অলক্ষ্যে সেটিকে দরজার সামনে ফেলে রাখলেন।

ছোট রাণীকে বললেন -- রাণী, এই পাথরটা তুলে ফেলে দাওতো, নাহলে আমার পায়ে আঘাত লাগতে পারে।

ছোট রাণী রেগে গিয়ে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। সে বলল -- তুমি আমাকে এভাবে অপমান করছো, আমি রাজকন্যা, রাজরাণী, তুমি আমাকে সাধারণ দাসীর মতো পাথরে টুকরো তুলে ফেলে দিতে বলছো। তার চেয়ে তুমি আমায় তাড়িয়ে দাও, আমি বাপের বাড়ি চলে যবো নয়তো রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে খাবো।

রাজা সেই পাথরটি তুলে নিজের পকেটে রাখলেন। এরপর বড় রাণীর ঘরে গিয়ে একই ভাবে তাকে পাথরটি তুলে ফেলে দিতে বললেন। বড় রাণী রাজার কথা শুনে তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো -- এ আমার কি হলোগো, আমার ভাগ্যেও এই ছিলগো, আমায় দাসীর কাজ করতে হবে। তোমার মনেও এই ছিল, হায় হায় হায় ...

এবারও রাজা সেই পাথরটি নিজের পকেটে রেখে দিলেন। রাণীকে প্রবোধ দিয়ে তিনি আবার দরবারে চলে গেলেন নিজের কাজে। সভায় গিয়ে স্যাকরাকে ডেকে রাজা বললেন, পাথরটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে, তার ওপর সুন্দর ছবি এঁকে দিতে এবং একটি মোটা সোনার চেন দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে। স্যাকরা তাই করলো। রাজা সেটিকে নিয়ে অন্দর মহলে

গিয়ে দুই রাণীকে ডেকে বললেন তোমরা তো রাজার মেয়ে, তোমাদের ভারী জিনিস্ তোলার অভ্যাস নেই, তাই এই হারটা আমি তোমাদের কাউকে দিতে পারলাম না। কারণ তোমরা রাজকন্যা তোমাদের দিয়েতো আর ভার বওয়াতে পারবো না।

দুই রাণী চিৎকার করে বলল — আমি নেবো। এ এমন কোনো ভারীই নয়। আমার মা এরচেয়ে অনেক বেশি ভারী ভারী হার গলায় পরে থাকে।

রাজা হারটি পকেটে রেখে বললেন — তোমাদের কাউকে দেবো না।

বড় রাণী ভাবলো নিশ্চয় কোনও সময় ছোট রাণীকে রাজা হারটি দিয়েছেন, বিপরীতে ছোট রাণী ভাবলো, নিশ্চয়ই হারটি বড় রাণী পেয়েছে। এই ভাবে একে অপরের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো। হিংসা তাদের বেড়ে গেল। এক দিন তারা দুই বোন ছিল, একসাথে খেলা করেছে, একে অপরকে ভালোবেসেছে, সেটা তারা বেমালুম ভুলে গেল।

কালক্রমে দুই রাণী এক সাথে সন্তান সম্ভবা হলো। রাজা তাদের জন্য বিশেষ দাই, আরো বেশি দাসী নিয়োগ করলেন। তাদের যাতে সুখ স্বাচ্ছন্দের অভাব না হয়, তার দিকে লক্ষ্য নজর করতে লাগলেন। রাজবৈদ্যকে দিয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু দরবারের রাজকাজ ছেড়ে রাজাতো আর অন্দর মহলে বসে থাকতে পারেন না। তাই তাঁকে অনেকটা সময় দরবারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো। অপরদিকে রাণীরা একে অপরের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগলো। রাজা তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে এক মহল থেকে অপর মহলে কেউ সহজে আসতে বা যেতে না পারে। তিনি কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন।

একই দিনে একই সময় দু'জনেই একটি করে কন্যা সন্তান জন্ম দিল। রাজা দাসীর কোলে দুই কন্যাকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হলেন। বড় রাণীর মেয়ের ডান হাতে উলকি দিয়ে লিখে দিলেন "কনকপ্রভা" আর ছোট রাণীর মেয়ের বাম হাতে লিখে দিলেন "কাঞ্চনপ্রভা"। কিন্তু দুই রাণীর কেউই সুখী হতে পারলো না। তারা সব সময় চেষ্টা করতে লাগলো কি করে অপরের ক্ষতি করা যায়। তক্কে তক্কে রইল তারা।

এবার রাজা দুই মহলের মধ্যকার প্রহরা তুলে নিলেন। এক দিন বড় রাণী এসে দেখলো ছোট রাণী ঘরে নেই। রূপোর সেকলে বাঁধা সোনার দোলনায় সোনার পুতুলের মতো কন্যা ঘুমোচ্ছে। বড় রাণী সতর্কতার সঙ্গে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে বললো 'কাঞ্চনপ্রভা', তোর 'প্রভা' আমি নিভিয়ে দেব। একটি মাটির হাঁড়ি মধ্যে মেয়েটিকে রেখে সরা ঢাকা দিয়ে তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। ফিরে আসার সময় একটি বেড়াল বাচ্চা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে কাঞ্চনপ্রভার দোলনায় শুইয়ে দিল।

এদিকে ছোট রাণী, বড় রাণীর ঘরে এসে দেখলো কনকপ্রভা সোনার হাতলদেওয়া রূপোর পালঙ্কে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সেই সুযোগে ছোটোরাণী বাগান থেকে একটি কুকুর ছানা তুলে এনে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কনকপ্রভাকে চুরি করে নিয়ে চলে গেল। একই ভাবে তাকে মাটির হাঁড়ির মধ্যে রেখে সরা চাপা দিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল।

দুই হাঁড়িতে দুটি মেয়ে ভাসতে ভাসতে চলল। যেন তাদের ভাগ্য তাদের নিয়ে চলল। উল্লসিত দু'ই রাণী কার্য সিদ্ধি করে নিজের নিজের ঘরে এসে বেড়াল বাচ্চা আর

কুকুর ছানা দেখে তাদের চোখ চড়ক'গাছ। রাজার কাছে খবর ছুটলো। রাজা এসে দেখলেন সত্যি সত্যি, এক জনের কাছে কুকুর ছানা আর এক জনের বেড়াল বাচ্চা। কি অন্যায়! কিন্তু কিছু করার নেই। রাণীরা নিজের নিজের অপকর্ম ঢাকবার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগলো।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন — তোমাদের কাউকেই আমি ঘরে রাখবো না। তোমরা নিশ্চই কোন অন্যায় কাজ করেছো, তা না হলে তোমাদের এমন সুন্দরী মেয়েরা কুকুর বেড়াল হবে কেন। রাণীরা কান্নাকাটি করতে লাগলো। তারা একে অপরের দোষ দিতে লাগলো। শেষে রাজা আদেশ দিলেন, প্রাসাদের পেছনে অনেক দূরে দু'খানা কুঁড়ে ঘর বানিয়ে দাও, সেখানে রাণীরা থাকবে। রাজা তাদের মুখ দেখবেন না। নিতান্ত দয়া পরবশ হয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন না।

কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা ভেসে চলল স্রোতের টানে। দুটি মেয়ে ভেসে চলল দুই তীর ধরে। এক ঘাটে এক মালিনী স্নান করছিল। একটা ছোট হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে দেখে সাঁতার কেটে সেটাকে ধরলো। সরা খুলে দেখে একটি ফুট্‌ফুটে মেয়ে। দেখে সে যেমন অবাক হলো তেমনি খুশি হলো। পাহাড়ের সানুদেশে মালিনীর বাগান। সেই বাগানে হাজার রকমের ফুল ফুটে থাকে। মালিনী ফুলের মালা গেঁথে দেবতার গলায় পরায়, নিজের খোঁপায় পরে আর অবশিষ্ট ফুল রাজবাড়িতে বিক্রি করে।

মেয়েকে নিয়ে ফুলের বিছানায় যত্নকরে শোয়ালো মালিনী। দেখলো তার হাতে লেখা আছে কনকপ্রভা। বুড়ো মালি, মালিনীর স্বামী। মালিনী কিন্তু যুবতী এবং সুন্দরী। মালিনী মেয়ে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। স্বামীকে ডেকে বলল — বুড়ো, তুমি মেয়েটাকে পাহারা দাও। আমি এর জন্য দুধ সংগ্রহ করে আনি। মেয়েটা আমার অনেকক্ষণ কিছু খায় নি।

বুড়ো বলল — এ মেয়ে তোমার হবে কেন? মেয়ে তো তার বাবার নামে পরিচিত হয়। সুতরাং এ আমার মেয়ে।

মালিনী বলল — আমি মা না হলে তুমি বাবা হবে কি করে? এ আমার মেয়ে।

বুড়ো মালীর মাথায় বুদ্ধি নেই, সে ভাবলো তা হবেই বা। মেয়ে মালিনীর। সে যাই হোক মেয়েটাকে বুড়ো মালীরও খুব ভালো লাগলো। লাগবেই নাই বা কেন!

নদীর অপর দিকে ঘাটে থাকে এক ধোপানী। সে মালিনীর বন্ধু। যখন মালিনী রাজবাড়িতে ফুল দিতে যায় তখন ধোপানী যায় কাপড় দিতে। দু'জনের খুব ভাব। তার বরও একটি বুড়ো ধোপা। ধোপানী কাপড় সেদ্ধ করে এনে দেয়, ধোপা কাপড় কাচে। রোদে শুকোতে দেয়। শুকনো কাপড় ভাঁজ করে রাজবাড়িতে নিয়ে যায় ধোপানী। আবার বাসি কাপড় নিয়ে আসে। এমনি করে দিন চালে।

সেদিন বুড়ো ধোপা দেখলো নদীর জলে কি একটা ভেসে যাচ্ছে। সে সাঁতার কেটে হাঁড়ি সরা সুদ্ধ মেয়েটাকে তুলে আনলো। কিন্তু মেয়েটাকে হাঁড়ির ভেতর থেকে বার

করতে সাহস করলো না। সে তাড়াতাড়ি গাধার পিঠে চেপে বাড়ির দিকে চলল। ধোপানীকে ডাকা ডাকি আরম্ভ করলো। ধোপানীতো মারতে আসে, বলে বুড়ো, অমনি তোমার ক্ষিদে পেয়েগেল। তুমি কাপড় কাচা ছেড়ে চলে এলে। যাও, ঘাটে গিয়ে কাপড় কাচগে।

ধোপা ধোপনীকে খুব ভয় পায়, সে আমতা আমতা করে বলল — একটা হাঁড়ি।

ধোপানী দেখল, একটা হাঁড়ি। তাতে রঙবেরঙের ছবি আঁকা। সরা খুলে দেখে একটা মেয়ে। ধোপানীর তো আহ্লাদ আর ধরে না। মেয়েকে নিয়ে সে আনন্দে নাচতে লাগলো। কিন্তু কি খেতে দেবে। দুধ কোথায়?

বুড়ো বলে — গাধা দুয়ে আনবো। আমার্দের গাধাটার তো বাচ্চা হয়েছে, দুইলে দুধ পাওয়া যাবে।

ধোপনী বলল — তুমি একটা গাধা, তাই গাধা দোয়াতে যাচ্ছো। গাধার দুধ আবার মানুষ খায়।

ধোপা মাথা চুল্কে ভাবলো, খায় না হয়তো। খেলেই বা কি? ধোপানী ছুটলো গোয়ালিনী মাসির কাছে। তাকে বলল — মাসি, আমার মেয়েটার জন্য এক সের দুধ দাও না।

গোয়ালিনী কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী। কথায় আছে আশি বছরেও গোয়ালার বুদ্ধি হয় না। কিন্তু মাত্র আট বছরে গোয়ালিনীর প্রখর বুদ্ধি হয়, তা না হলে আধ ঘটি দুধে এক ঘটি জল মিশিয়ে বলে, 'একেবারে খাঁটি দুধ'। ঘাটে জল থাকলে ঘটে দুধ ফুরোয় না।

গোয়ালিনী বলল — এই মাত্র মালিনী এসে তার মেয়ের জন্য দুধ নিয়ে গেল। আবার তুমি এলে তোমার মেয়ের জন্য দুধ নিতে। কিন্তু তোমাদের মেয়ের কথাতো আগে শুনিনি বাছা!

মালিনীর মেয়ের কথা শুনে ধোপানী বেশ অবাক হলো। ধোপানী আরো চালাক, সে বলল — মালিনীর মেয়ে হবে জানতাম। কিন্তু আমার কি পোড়া কপাল দেখ মাসি, ভেবে ছিলাম আমার ছেলে হবে, হলো কিনা সেই মেয়ে।

মালিনী তার মেয়ের নাম রাখল টগর। আর ধোপানী তার মেয়ের নাম রাখলো বকুল।

ফুল যেমন করে তার পাপড়ি মেলে, চাঁদ যেমন করে দিনে দিনে বড় হয় তেমনি একটু একটু আরও একটু করে বাড়তে লাগলো দু'জনে। মালিনী নদী পার হয়ে যায় ধোপনীর বাড়িতে। টগরকে সাথে নিয়ে যায়। টগর আর বকুল খেলা করে। ওরা দু'জনে রাজবাড়িতে যায়। মালিনীর কাছ থেকে গান শিখেছে টগর, ধোপানীর কাছে নাচ শেখে বকুল। দু'জনে মিলে নাচ গান করে।

ভেলায় চেপে দড়ি ধরে টান দেয়, এপারের বকুল ওপারে যায়, ওপারের টগর এপারে আসে খেলা করতে। সন্ধ্যা নামে, পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে থাকে, মাঝ আকাশে ম্লান চাঁদ দেখা যায়। পশ্চিমে পাহাড়ের কোলে সূর্য ঢলে পড়ে। চাঁদের আলো রোদের আভা নদীর জলে প্রতিবিম্বিত হয়। পাহাড়ের ছবি দেখা যায় জলের মধ্যে। টগর বকুল নদীতে স্নান করতে নামে। সাঁতার কাটে, ঢেউ তোলে। যেন দু'টো রাজহংসী জলে ভেসে চলে।

ফুলের গয়নায় সাজে বকুল, সাজে টগর। ধোপানী মা পরিয়ে দেয় ধোপদুরস্ত রঙ বাহারী পোশাক। দু'টো বালিকা ফুলপরীর মতো ঘুরে বেড়ায় নদীর ধারে। দুলে দুলে হাঁটে, নেচে নেচে গান গায়, গান গাইতে গাইতে ছোটে। বনের ফুল তুলে, গাছের ফল পাড়ে, পাখির সুরে গান গায়, কোকিলের সাথে গলা মেলায়, হাওয়ার তালে শরীর দোলায়। পথের ধুলায় পায়ের ছাপ ফেলে। প্রাণ খোলা কুরঙ্গীনী নাকি ডানা মেলা বিহঙ্গীনী।

কি আছে ঐ পাহাড়টার ওপারে? মালিনী বলে, আছে রাজপুরী। রাক্ষসের দেশ। সোনার পাহাড়, হীরের গাছ আর মুক্তোর ফল। জ্যোৎস্না রাতে উঠোনে মাদুর পেতে বসে গল্প বলে মালিনী, আর মালিনীর কোলে মাথা রেখে শোনে বকুল, শোনে টগর। রাজপ্রাসাদের সোনার পালঙ্কের চেয়ে মাটির আঙিনায় তারা কোনো কম সুখে নেই। সোনার পালঙ্ক যেমন নেই, তেমনি মালিনী-ধোপানীর মনে হিংসেও নেই। হিংসে নেই টগর-বকুলের মনে। দু'জনে মনে মনে ভাবে একটা ঘোড়ায় চড়ে একদিন চলে যাবে পাহাড়টার ওপারে। একে অপরকে মনের কথা খুলে বলে।

গাধার পিঠে চেপে এক দিন দু'জনে খেলা করছে। মালিনী বলে — তোমার কি আক্কেল সই, আমার মেয়েকে তুমি গাধার পিঠে চাপালে! সে কি গাধার পিঠে চড়ার উপযুক্ত? আমার মেয়ে ঘোড়ায় চাপবে।

ধোপানী বলে — কেন, আমার মেয়ে কী ফেলনা, সে ঘোড়ায় চাপতে পারে না! দু'জনে চলল রাজ বাড়িতে। তাদের পাওনা পারিশ্রমিকের অর্থ নিয়ে হাট থেকে ঘোড়া কিনে আনলো। দুই কিশোরী ঘোড়ায় চেপে বলে আমাদের তরবারি? তরবারি না হলে আমরা যুদ্ধ করবো কি করে। তাই তো! তরবারি নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধ করে দু' জনে। আসল নয়, নকল লড়াই।

গোয়ালিনী আই (*দিদিমা*) বড় ভালোবাসে টগর-বকুলকে। ঘোড়ায় চেপে তারা গোয়লিনী আই-এর বাড়ি আসে, দুধ মাখন দই পেট ভরে খায়। বুড়িকে বিরক্ত করে, গরুর দড়ি খুলে দেয়, বাছুরের দড়ি খুলে দুধ খাইয়ে দেয়। ফাঁকা পেলে ঘরে ঢুকে দুধ দই চুরি করে খেয়ে নেয়। বুড়ি লাঠি নিয়ে তাড়া করে, কিন্তু ঐ দস্যি মেয়েদের ধরতে পারবে কেন? ওরা হাসতে হাসতে ছুটে পালায়।

বাঁক মেরে গোয়ালিনীর চার দিকে ঘুরতে থাকে। এত কাছে কিন্তু গোয়লিনী তাদের নাগাল পায় না। অবশেষে ক্লান্ত গোয়ালিনীকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে টগর-বকুল। রাগ স্নেহে পরিণত হয়। পাঁচনবাড়ি (*গরু তাড়ানোর লাঠি*) ফেলে দিয়ে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে বুড়ি।

গোয়ালিনী টগর-বকুলকে ভালোবাসে খুব। একটু আসতে দেরি হলে তার মন কেমন করে। বকুল বলল — আই, ঐ পাহাড়টার ওপারে কি আছে?

গোয়ালিনী সাত পাঁচ ভেবে বলল — তা তো জানিনে ভাই। তবে শুনেছি ওপারে কেউ যায় না। গেলে বড় বিপদ।

-- মালিনী মা যে বলে, ওপারে সোনার পাহাড়ে হীরের গাছে মুক্তোর ফল ফলে।

গোয়ালিনী বলে -- হবে হয়তো।

এক দিন দুই বালিকা যোদ্ধার বেশে সেজে ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের পাশে একটা গুহা। আর সেই গুহার সামনে ধুনি (*অগ্নিকুণ্ড*) জ্বেলে বসে আছে এক সন্ন্যাসী। বকুল-টগর ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামলো তার সামনে। সন্ন্যাসী চোখ মেলে একবার চাইল।

উদ্ধত তরবারি হাতে টগর-বকুল সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়ালো। সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ রেখেই বললেন -- বোস রাজকন্যা।

-- রাজকন্যা! তুমি কিছু জানো না। আমরা তো মালিনী আর ধোপানীর মেয়ে।

-- তোমরা রাজকন্যা। তোমার নাম কনকপ্রভা আর তুমি কাঞ্চনপ্রভা।

-- না আমি বকুল ও টগর। তুমি সন্ন্যাসীবুড়ো, কিছুই জানো না। আমরা রাজকন্যা হতে যাবো কেন? যাঃ।

-- তোমরা তোমাদের হাতের উলকি দেখ, তাতে তোমাদের নাম লেখা আছে।

বলেই সন্ন্যাসী উধাও হয়ে গেল। কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা দেখলো সত্যিইতো তাদের হাতে নিজের নিজের নাম লেখা আছে। এত দিন ওরা সেটা দেখে নি। ওরা সন্ন্যাসীর আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলো। শ্বাপদ সঙ্কুল পথ। বাঘ সিংহ হায়না গরিলায় ভর্ত্তি। রাজকন্যাদের হাতের তরবারি ঝলসে উঠছে। দু একটা হিংস্র প্রাণী কাছে এসে আক্রমণ করার চেষ্টা করলে তারা রাজকন্যাদের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারালো।

ঘোড়া ছুটে চলেছে। ক্লান্ত রাজকন্যা, ক্লান্ত তাদের ঘোড়াগুলি। এক সময় তারা গাছের তালায় থামলো। গাছথেকে ফল তুলে এনে দু'জনে খেলো। ঘোড়াকে ঝর্ণার জল পান করালো। তার পর কচি কচি ঘাসে ভারা মাঠে ঘোড়া বেঁধে দিল। পাখির সুমিষ্ট গান, ঝর্ণার সুমধুর তান, বাতাসে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। গাছের ছায়ায় বসে রাজকন্যারা ঘুমিয়ে পড়লো।

ব্যঙ্গমা বলল -- এরা কে জানো?

ব্যঙ্গমী বলল -- ধ্যাৎ, এরা রাজকন্যা। রাজপুত্তুরতো আর নয়।

ব্যঙ্গমা বলল -- রাজকন্যা না হাতি; রাজবাড়িতে জন্মালে কি হবে, মানুষ হয়েছে মালিনী আর ধোপানীর ঘরে। আর পালন করেছে গোয়ালিনী আই।

ব্যঙ্গমী বলল -- তা হোক, কত দিন পরে দু'টো রাজকন্যা তো এলো। রাজ পুত্তুররা তো আসেই না যে, তাদের আমরা পথ বলে দেবো। আমাদের পেশাটা এবার মারা যেতে বসেছে।

ব্যঙ্গমা বলল -- বললেই বা শুনবে কে? একে মেয়ে তায় ঘুমিয়ে ন্যাতা।

ব্যঙ্গমী বলল -- শুনলেই কি বুঝবে, এমনি ওদের বুদ্ধি ভোঁতা।

ব্যঙ্গমা বলল -- বুঝুক আর নাই বুঝুক আমাদের কাজ আমরা করি। রাজপুত্র হলে আমি বলতাম, রাজকন্যা তাই তোর পালা; গোপন কথা বলে দে।

ব্যঙ্গমী বলল ঃ-

হীরের গাছ মুক্তোর ফল;
ওপরে পাখী নীচে জল;
কাটতে হবে এক কোপেতে;
পড়তে হবে এক লাফেতে;
মারতে পারলে জয়;
না পারলে ক্ষয়;
সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় ঠ্যাঁটা;
জানতে পারলে ভাঙবে মাথা।
রাজপুত্তুর চাকর খাটে;
উপযুক্ত পাত্র বটে।।

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী উড়ে গেল।

বকুল বলল -- টগর, কিছু শুনলি?

টগর বলল -- বকুল, কিছু বুঝলি?

বকুল বলল -- দেখ, আমরা মেয়ে বলে ব্যঙ্গমার পছন্দ হলো না, তাই ব্যঙ্গমী ছড়া কাটলো। কিছু শুনলি।

টগর বলল -- শুনলামতো সব, কিন্তু বুঝলাম কই!

বকুল বলল -- বুঝিনি আমিও, তবে ছড়াটা মনে রাখ যদি কাজে লাগে।

বলেই দু'জনে ছড়াটা বারবার বলে মুখস্থ করে নিল যাতে ভুল না হয়। তা'তো না হয় হলো, কিন্তু পথটা কোন দিকে যদি জেনে নিতে পারতাম তাহলে যেতে পারতাম সেই 'হীরের গাছ মুক্তোর ফল'-এর দেশে।

-- তা বুঝি হয়, ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী নিজের মনে একবার মাত্র বলে, শুধালে উত্তর দেয় না। তাতেই বুঝে নিতে হয়। দেখাই যাক না।

-- মালিনী-মা ত বলেছিল, পাহাড়ের ওপারে 'হীরের গাছ মুক্তোর ফল'-এর দেশ আছে। ব্যঙ্গমীও তাই বলল, তা হলে আছে নিশ্চয়। কিন্তু বিপদ আছে, সন্ন্যাসী ঠাকুর জানতে পারলে মাথা ভাঙবে। সন্ন্যাসীতো আমাদের নাম জানে, আমরা যে রাজকন্যা তাও জানে। লোকটাকে দেখেতো খারাপ মনে হলো না?

-- দেখতে ভালো মানুষ হলে কি হবে, ওরা মিচ্‌কে শয়তান হয়। লোকটা যে দুষ্টু সেতো ওকে দেখে বোঝা যাবে না।

ক্লান্তি দূর হলে টগর-বকুল ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলল। আরো পথ আরো পথ, পথ দুর্গম, গাছপালায় যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। দিনের বেলায় গা ছম্‌ছম্‌ করে। পাহাড়ি পথ বন্ধুর (উঁচুনীচু)। পাহাড়টা টপ্‌কাতেই হঠাৎ দেখে যেন বিদ্যুৎ স্থির হয়ে

আছে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল দু'জনের। চারি দিকে আলো ঝল্‌মল্‌ করছে। পাহাড়টা সোনার, গাছগুলো হীরের তাতে মুক্তোর ফল ফলে আছে। পাতাগুলো নীলা, পালা প্রভৃতি নানা রকম পাথরের। তারই প্রভায় এত আলোর ঝল্‌কানী। সত্যি তাহলে সেই দেশে এল টগর-বকুল।

কিন্তু নিঝুম পুরী। পাখি গান করে না। নদীতে স্রোত আছে শব্দ নেই। বাতাস বইছে কিন্তু তাতে যেন তেমন সাড়া নেই। চোখ ধাঁধায় কিন্তু মন মাতায় না। এমন নিস্প্রাণ জায়গা কখনো দেখেনি কেউ। অথচ কি সুন্দর তার শোভা, তার ঝল্‌কানী।

টগর-বকুল আবার ঘোড়ায় চাপলো। ঘোড়াও যেন ক্লান্ত। পথ যেন উদাস। এদিক ওদিক ঘুরে দেখে কতগুলো কিশোর পাথর সরাচ্ছে। ক্লান্ত শরীরে তারা পাথর বয়ে চলেছে। মুখে কথা নেই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলো তারা। সাড়া দিল না। কিশোরের মধ্যে সত্যি সত্যি দু'জন রাজপুত্র অছে। তারা সামনের সারিতে রয়েছে। তাদের গায়ে রাজপোশাক।

সন্ন্যাসী কিশোরদের কাছে এলো। সব কিশোর সন্ন্যাসীকে ঘিরে দাঁড়ালো। সন্ন্যাসীর ইশারায় সারিদিয়ে তার পিছু পিছু চলল কিশোরেরা। অনুসরণ করলো টগর-বকুল। যেতে যেতে এক বিশাল প্রাসাদের মধ্যে এলো বালকেরা। সন্ন্যাসী একটা বিশাল চাবুক নিয়ে তাদের কসাঘাত করতে লাগলো। কিশোরেরা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে কাঁদতে লাগলো কিন্তু শব্দ হলো না।

সন্ন্যাসী অট্টহাস্য করতে লাগলো। সেই হাসিতে বিকট শব্দ হলো। নিঝুমপুরিতে সেই শব্দ আরো ভয়ঙ্কর শোনালো। হাসি দেখে কিশোরেরা আরো ভয় পেয়ে গেল। রাজপুত্র দু'জনে সন্ন্যাসীর কাছে এলো, তারা সন্ন্যাসীর হাত পা টিপতে লাগলো। বাকি কিশোরেরা এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসীর সামনে।

সাহসে ভর করে এগিয়ে এলো টগর-বকুল। সন্ন্যাসীকে বলল -- এ আপনি কি করছেন? আপনি এই কিশোরদের এমন ভাবে শাস্তি দিচ্ছেন কেন?

উত্তরে সন্ন্যাসী উচ্চ স্বরে অট্টহাসি হাসতে লাগলো। এই নিঝুম পুরীতে কেবল সন্ন্যাসীর কথাই শোনা যাচ্ছে। কথা শোনা যাচ্ছে টগর-বকুলের। সন্ন্যাসীর বিভিষিকাময় হাসি দেখে ছেলেরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। তারা জানে এই হাসির পর সন্ন্যাসী চাবুক চালাবে। শরীরের ত্বক ছিঁড়ে রক্ত পড়তে থাকবে। যন্ত্রণায় শরীর কাঁপবে তাদের, তবু সন্ন্যাসী থামবে না। কিন্তু টগর-বকুল এতটুকু ভয় পেলো না, বরং তাদের চোখ থেকে আগুনের টুকরো যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। তারা আরো জোরে সন্ন্যাসীর গলা ছাপিয়ে বলল--হাসি থামান, নৈলে অপনাকে আমরা হত্যা করবো।

সন্ন্যাসী হাসি থামিয়ে বলল -- ঠিক আছে তোমরা আমায় বধ কর, দেখি তোমাদের কত শক্তি।

টগর-বকুল বলল -- আপনি এই কিশোরদের মুক্তি দিন। ওদের ওপর এ ভাবে অত্যাচার করবেন না।

সন্ন্যাসী ক্রুর হাসি হেসে বলল — জানো, তোমাদের এই ঔদ্ধত্যের পরিণতি। তোমাদের এই ভাবে এদের মতো পাথর সরাতে হবে সারা জীবন। আজ থেকে তোমরা এই মায়াপুরীর দাসী হয়ে থাকবে।

— আমাদের হাতে তরবারি আর বাহুতে শক্তি থাকতে কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। আপনিও না।

সন্ন্যাসী তার আসনে বসলো। একজন কিশোরকে চাবুক আনার নির্দেশ দিল। পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো টগর-বকুল। ভয়ঙ্কর তার মুখমণ্ডল। বিভৎস তার চেহারা। তরবারি দিয়ে আঘাত করলো বকুল, আঘাত করল টগর। কিন্তু সন্ন্যাসীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিদ্রূপের হাসি হেসে চলেছে সে। যে তরবারি দিয়ে পথে বাঘ সিংহ হায়না গণ্ডার মেরে এসেছে তারা, সেই তরবারির আঘাতে সন্ন্যাসীর শরীরে একটা দাগও কাটতে পারলো না। অবাক হলো টগর-বকুল। কিন্তু ভয় পেল না।

আপততঃ টগর-বকুল নিরস্ত হলো। কিন্তু সন্ন্যাসী অবাক হয়ে গেল। তার অট্টহাসির সামনে যেকোন মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার তাকে ভয় পায় কিন্তু সামান্য দুটো মেয়ে তাকে অবহেলা করছে। সন্ন্যাসী কিছুতেই তাদের বশ করতে পারছে না। তার কোনো যাদু শক্তি কোনো কাজই করছে না। বরং রাজকুমারীর তীব্র চাহনির কাছে তার দাপট যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, রাতটা পার হোক্, যাবে কোথায়, এই অরণ্যে সবই মায়াময়, মায়ার ফাঁদে সন্ন্যাসী তাদের ফেলবেই।

একটি উপল খণ্ডের ওপর বসলো টগর-বকুল। ছড়াটা আর এক বার আবৃত্তি করলো দু'জনে। চেষ্টা করলো তার মানে উদ্ধার করবার।

হীরের গাছ মুক্তোর ফল;
ওপরে পাখী নীচে জল;
কাটতে হবে এক কোপেতে;
পড়তে হবে এক লাফেতে;

হীরের গাছ মুক্তোর ফল ত দেখাই গেল, কিন্তু 'ওপরে পাখি নীচে জল', সেটার খোঁজ করতে হবে, আর সেই পাখিকে এক কোপে কাটতে হবে।

চল্‌ল সেই পাখির খোঁজে। বন্ধুর পথ। পাথর ছড়ানো আছে। ঘোড়ায় চেপেতো যাওয়া যাবেই না, ঘোড়ার বল্গা ধরে কোন মতে পার করাও বেশ কষ্টকর। পাথরে গায়ে পা লেগে পা হড়কে যাচ্ছে। ঘোড়া পড়ে যাচ্ছে। অথচ ঘোড়া দু'টোকে হাতছাড়া করতে চায়না তারা। যাদু-সন্ন্যাসী কি করতে কি করবে তার ঠিক নেই।

সাত দিন সাত রাত কেটে গেল খোঁজে। পাখির দেখা পায় না। কত পাখি গাছে গাছে চুপচাপ বসে থাকে, হয়তো অলস ভাবে ওড়ে কিন্তু ওপরে পাখি নীচে জল এমনতো দেখা যাচ্ছে না। নদীর ধার ধরে খোঁজ করেছে তারা, পায় নি কোন সন্ধান। হঠাৎ একটা পাখি যেন কোথাও ডাকছে। এই মায়ারাজ্যে পাখি ডাকে না, তবে!

অনুসরণ করলো টগর-বকুল। দেখল এ সেই পাখি যারা মানুষের গলায় কথা বলে 'ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী'। তার কাছে জানতে চাইল টগর-বকুল, কোথায় গেলে তারা সেই পাখি দেখতে পাবে।

প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী। ওরা উড়ে গেল। যেদিকে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী গেল সেদিকে চল্‌ল টগর আর বকুল। পথে দুটো বাঘ পাশাপাশি শুয়ে আছে, ঘুরে যাবার মতো কোন পথ তাদের সামনে নেই। বাধা পেয়ে টগর-বকুল ভাবলো তারা ঠিক পথেই এসেছে।

টগর-বকুলকে দেখে বাঘ দু'টো গর্জন করে উঠল। চমকে উঠলো ঘোড়া। ঘোড়া থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়ালো দু'জন। ভয় পেলে চলবে না তাদের, কারণ তারা বুঝতে পারলো তারা ঠিক পথে এসেছে। এটা সেই সন্ন্যাসীর কৌশল। সে পথে বাঘকে পাহারায় রেখেছে। সুতরাং একমাত্র সাহসই ভরসা। তাই তারা তরবারি হাতে এগিয়ে এলো বাঘের কাছে। বাঘও গর্জণ করে লাফ দিল। তরবারি দিয়ে ভীষণ আঘাত করল দু'জনে।

কি আশ্চর্য। তরবারির আঘাতে বাঘ দু'টি পাথরে রূপান্তরিত হলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল টগর-বকুল। কিন্তু তাদের সন্দেহ হোল, এমনওতো হতে পারে, ওরা পেরিয়ে যাওয়ার পর পেছন থেকে বাঘ দু'টি সক্রিয় হয়ে তাদের আক্রমণ করবে।

এবার তারা চোখ ফেরালো তাদের ঘোড়ার দিকে। লাগাম ধরে টান মারলো দু'জনে। কি সর্বনাশ! ঘোড়া দু'টো তো পাথরে পরিণত হয়েছে। এখন কি হবে! বিপদের আশঙ্কা আরও বাড়লো। পায়ে হেঁটে চলল দু'জনে। সামনে পথ আরও দুর্গম। সেই চড়াই পথ ধরে চলল তারা। ঘোড়া সঙ্গে থাকলেও এই পথে চলতে পারতো না। পাথর নড়ছে। তার ওপর পা রাখতে ভয় হচ্ছে, পাথর সমেত তারা গড়িয়ে পড়তে পারে।

এমনি করে বহু প্রচেষ্টায় কিছুটা পথ তারা অতিক্রম করল। সামনে দেখা গেল একটি বিশাল জলাশয়। মৃদু হাওয়ায় সেই জলে ছোটো ছোটো ঢেউ উঠছে। নানা রঙের ছোট বড় মাছ সেই জলে খেলা করছে। তার দুই তীরে দু' টি সুদীর্ঘ বাবলা গাছ। আর সেই বাবলা গাছের একে বারে ওপরের দিকে দু'টি সরু ডালে দু'টি ছোট ছোট পাখি বসে আছে। কিন্তু এ পাখিই যে সন্ন্যাসীর প্রাণ-পাখি সে'টা ওরা বুঝবে কি করে।

ছড়াটা আবার তারা আবৃত্তি করলো -

হীরের গাছ মুক্তোর ফল;
ওপরে পাখী নীচে জল;

তাইতো, হীরে গাছ ত এ তল্লাটে হামেশাই দেখা যাচ্ছে কিন্তু 'ওপরে পাখি নীচে জল' এখানেই কেবল দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এটাইকি সেই পাখি, যাকে বধ করতে পারলে সন্ন্যাসীকে বধ করা যাবে। এমনি সাত পাঁচ যখন চিন্তা করছে তখন পিছন থেকে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী বলল —

সন্ন্যাসীর প্রাণ-পাখি গাছের ডালে বাস।
একটা যদি উড়ে যায় তোদের সর্বনাশ।।

শুনলো টগর, শুনল বকুল। কিন্তু এখন উপায়। আবার সেই ছড়া তারা অবৃত্তি করলো।

যুক্তি করে, দু'জনে দু'টো গাছে ধীরে সুস্থে উঠতে লাগলো। ভয় হচ্ছে গাছ নড়লে পাখি উড়ে যেতে পারে তাহলে তো ওদের সর্বনাশ। সুতরাং গাছ যেন না নড়ে। কিন্তু পাখিটা এমন সরু ডালে বসে আছে যেখানে কোন মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শক্ত ডালথেকে লাফ দিয়ে পাখিকে কাটতে হবে। বেশ কষ্টকর কাজ। দুঃসাধ্য সত্যি, কিন্তু অসাধ্য বলে কোন জিনিস হয় না। অসম্ভব কথাটা যার অভিধানে আছে তার পক্ষে পৃথিবীতে কিছু করা সম্ভব নয়।

দু'জনে দু'টি গাছে উঠছে সন্তর্পণে। পাখি ডাকে না, বাতাসে শব্দ নেই, গাছের পাতা নড়ে কিন্তু শব্দ করে না। নদীর জল ছল্‌ছল্‌ করে বয়ে চলে কিন্তু কল্‌কল্‌ তান তোলে না। সুতরাং গাছের ডালে বসেথাকা পাখি টগর-বকুলের সাড়া পায় নি। কিন্তু গাছ যদি নড়ে তবেই তারা অনুভব করতে পারবে, নচেৎ নয়।

শেষ শক্ত ডালটিতে উঠে দু'জনে দু'জনকে ইসারায় নিজেদের প্রস্তুতির কথা জানালো। এবার ঈশ্বরকে স্মরণ করে লাফ দিল দু'জনে। কিন্তু লাফ দেবার সাথে সাথে গাছ নড়ে উঠলো, পাখিও উড়লো। সেই উড়ন্ত পাখির গায়ে পড়লো তলোয়ারের কোপ। শুন্যে উড্ডিয়মান পাখি দু'টিকে দু' টুকরো করল তারা। নিহত পাখি জলে পড়লো। নিজেরাও জলে পড়ে গেল।

অমনি গোটা দেশটা শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো। নদীর জল কল্‌কল্‌ করে উঠলো। মনের সুখে গাছের পাখি গান গেয়ে উঠলো। সমস্ত দেশটা একটা স্বর্গীয় আনন্দে মেতে উঠলো। গাছপালাগুলো সাধারণ সবুজ সতেজতা পেয়ে দুলে উঠলো। যে ঘোড়া দু'টো পাথর হয়ে গিয়েছিল তারা চি..হিঁ..হিঁ... শব্দ করতে করতে ছুটে এলো টগর-বকুলের কাছে। কিন্তু কি মজা, রাজকান্যারা তীরে উঠে দেখলো তাদের জামাকাপড় একটুও ভেজেনি।

পাগলের মতো হা... হা... হা... করতে করতে একটা রাক্ষস ছুটে আসছে। আছাড় খেয়ে পড়লো জলের ধারে। কয়েক বার ছট্‌ ফট্‌ করে শেষ বারের মতো মুখ ফাঁক করে নিশ্বাস নিল। তার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল। অমনি জল থেকে উঠে এলো দুটো সুন্দরী পরী। তারা রাজকন্যাদের অনেক আশীর্বাদ করলো। নানা বেশ ভুষা অলঙ্কার দিয়ে বলল — আসলে এই রাক্ষসটা হলো সেই সন্ন্যাসী। রাক্ষসটা আমাদের পাখি বানিয়ে তার জীবনী শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছিল।

সন্ন্যাসী গোটা দেশটাকে পাথরে পরিণত করে গাছপালা গুলোকে নানান পাথরে পরিণত করেছিল। হীরে মুক্তো নীলা পলা মরকতে মুড়ে দিয়ে তাদের শোভা দেখতো। এই যে সব মানুষের কোলাহল শুনছো এরা আসলে এখানকার অধিবাসী। সন্ন্যাসী-রাক্ষস তাদের পাথরে পরিণত করেছিল। আর দুই রাজপুত্রকে নিজের চাকর করে রেখেছিল। তোমরা এসেছো, তাদের উদ্ধার কর।

আর একটা কথা জেনে রেখো, এই রাক্ষস-সন্ন্যাসী তোমাদের মায়েদের মনের মধ্যে হিংসার বীজ পুঁতে রেখেছিল। তাই তারা তোমাদের নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এবার তারা তাদের ভুল বুঝবে। তোমরা আমাদের মুক্তি দিয়েছো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। বলেই পরী দুটি আকাশে উড়ে গেল।

পরীদের দেওয়া পোশাক গয়না গাঁটি পরে ঘোড়ায় চেপে রাজপ্রাসাদে গেল টগর-বকুল। তারা গিয়ে দেখল রাজ বাড়ির পাথরের মুর্তিগুলো সদ্য-মুক্তির আনন্দে ডগমগ করছে। কিন্তু কেউ নড়া চড়া করতে পারছে না। তারা গিয়ে রাজপুত্তুরের গায়ে হাত দিল, রাজপুত্র সতেজ হয়ে উঠলো। নিজেকে চেনার চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলো সব কিছু। এবার পর পর সকলের গায়ে স্পর্শ করলো টগর-বকুল। একে একে রাজা-রাণী, মন্ত্রী, সান্ত্রী, কতোয়াল জেগে উঠলো। বিহ্বলতা কাটিয়ে রাজা বললেন — মা, তোমরা আমাদের গোটা দেশটাকে উদ্ধার করেছো সুতরাং এদেশ তোমাদের। তোমরা এখানেই থাকো। তোমরাই সিংহাসনে বসো। এ রাজ্য শাসন কর।

টগর-বকুল বলল — তা কি করে হয়? আপনি থাকতে আমরা কেন রাজসিংহাসনে বসবো। তাছাড়া আপনার দুই ছেলে আছে তারা সিংহাসনের অধিকারী।

রাজা বললেন — তা হোক, চিরকাল বিজয়ী বিজীতের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তোমারা সারা দেশ সহ রাজপুত্রদের উদ্ধার করেছ, সুতরাং রাজ্য আর রাজপুত্র তোমাদের। এসো তোমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করি।

কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা বলল — না, তা হয়না, আমরা জন্মাবধি আমাদের মা বাবাকে দেখি নি। তাছাড়া, যারা আমাদের মা-বাবা হয়ে প্রতিপালন করেছে তাদের কাছে আগে আমরা ফিরে যাবো। তবে রাজপুত্রদের আমরা সাথে নিয়ে যাবো।

আবার ঘোড়ায় চেপে চলল রাজকন্যারা, তাদের সাথে চলল দুই রাজপুত্র সনৎকুমার আর নিয়তকুমার। সেই বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে চলল তারা। নিজের রাজ্যের দিকে আসতে গিয়ে পাহাড়ের দেশে পথ হারালো চার জনে। তারা গিয়ে ঢুকলো অন্য এক রাজ্যে। সেখানে বাস করে এক দুষ্টু মন্ত্রী। সেই মন্ত্রী অতি লোভী এবং ধূর্ত ছিল। খবর পেয়ে সে রাজকন্যা আর রাজপুত্রদের সাদরে ডেকে নিয়ে তাদের অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ভালো ছিল না, সে রাতের বেলায় লেঠেল পাঠিয়ে রাজপুত্রদের বন্দী করে রাজকন্যাদের কেড়ে নিতে চায়।

সেই মতো অনেক জন লাঠি সড়কিধারী জোয়ান এসে আচমকা রাজপুত্রদের বন্দী করে ফেলল। আর রাজকন্যাদের নিয়ে চলল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী বলল — তোমরা যে রাজকন্যা তার প্রমাণ দিতে পারবে?

উদ্ধত রাজকন্যারা বলল — যদি প্রমাণ না দিই?

মন্ত্রী বলল — রাজকন্যা প্রমাণ দিতে পারলে আমি তোমাদের বিবাহ করবো, আর রাজকন্যা না হলে আমি তোমাদের দাসী করে রাখবো। তোমাদের সাথী যুবকরা হবে ঘোড়াশালের সহিস।

রাজকন্যারা বলল — তবে তাই কর।

রাজকন্যা দু'জনে গোপনে কান্নাকাটি করতে লাগলো। এত দূর, এত বন্ধুর পথ, এত প্রতিকূল পরিবেশ পার হয়ে এসে শেষে কিনা সামান্য এক মন্ত্রীর কাছে তাদের এভাবে আত্মসমর্পণ করতে হলো। তারা ভাবলো, যদি একটা করে তরবারি আমরা হাতে পেতাম তাহলে এই দুষ্ট লোকটাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারতাম।

এদিকে সনৎকুমার আর নিয়তকুমার আস্তাবলের কাজে নিযুক্ত হলো। অত্যন্ত কায়ক্লেশে তারা কাজ করতে লাগলো। রাজার কাছে নালিশ করার কোন উপায় নেই। সে দেশের রাজা খুবই ভীতু এবং নির্বোধ। মন্ত্রী যা বুদ্ধি দেয় রাজা তাই মেনে চলেন, সুতরাং তার কাছে গিয়ে নালিশ করার আগে মন্ত্রী তাদের ধরে ফেলবে এবং হত্যা করবে। তাই তারা রইলো সুযোগের সন্ধানে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর রাতের বেলায় রাজপুত্রদের খেতে দেয় দু'খানা করে আধপোড়া রুটি। আর রাজকন্যারা সারাদিন দাসীবৃত্তি করে। রাতে তাদের জন্য বারাদ্দ আধবাটি করে পোড়া ভাত। কনকপ্রভা বলল, এ খাবার আমরা খাবো না, ফেলে দেবো। কাঞ্চনপ্রভা বলল — খাবার ফেলে দিলে আমরা না খেয়ে দুর্বল হয়ে যাবো। নিজেদের শক্তি হারিয়ে ফেললে আর যুদ্ধ করতে পারবো না। যে করেই হোক আমাদের অস্ত্র যোগাড় করতে হবে। তাহলে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারবো। উদ্ধার করতে পারবো রাজপুত্রদের।

দুঃখের দিন আর কাটতে চায় না। ছিল রাজপুত্র, রাক্ষসের মায়াজলে তাদের চাকর খাটতে হয়েছে বহু দিন ধরে। যদিওবা তাদের রাজকন্যারা উদ্ধার করে আনলো আবার তাদের আস্তাবলের কাজে লাগতে হলো। এমনি তাদের ভাগ্য। সনৎকুমার বলল — বসে কাঁদলেতো আর চলবে না, একটা কিছু করতেই হবে। এখন আমরা একা নই। আমাদের সাথে আছে রাজকন্যারা। তাদের উদ্ধার করতে হবে। তাই তারা যুক্তি করে ঠিক করলো, প্রহরীরা যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তারা শক্তিশালী দু'টি অশ্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়বে।

রাজপ্রহরীরা সকলে ফাঁকিবাজ। রাত জেগে পাহারা না দিয়ে, যে যার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার রাত ভোর হবার আগে নিজের নিজের জায়গায় চলে আসে। সেই সুযোগে সনৎকুমার আর নিয়তকুমার দু'টি শক্তিশালী ঘোড়া বেছে নিয়ে ছুটে পালালো রাজ্যের বাইরে। চলল মালিনী আর ধোপানীর উদ্দেশ্যে। নদীর পাড় দিয়ে ঘোড়া ছুটছে। নদীর ধারে এক ঘাটে এক ধোপানী কাপড় কাচছে আর আপন মনে গান গাইছে। সে গান সুখের নয়, অত্যন্ত দুঃখের, সে গান কান্নার —

ওরে বকুল, ওরে টগর, কোথায় গেলি তোরা;
তোদের তরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হবো মোরা।

টগর-বকুলের কথা শুনে রাজপুত্ররা ঘোড়া থামালো। তারপর কাছে গিয়ে বলল — মাসি তুমি কি টগর-বকুলকে চেন? ওরা কি তোমার মেয়ে?

ধোপানী আগ্রহ সহকারে বলল — হাঁ বাবা, ওরা আমাদের মেয়ে। কিন্তু তোমরা কে বাছা?

নিয়তকুমার বলল — আমরা যে হই, সে কথা পরে বলছি। টগর-বকুলের খুব বিপদ, এখন তুমি আমাদের জন্য কিছু অস্ত্র যোগাড় করে দিতে পারো।

ধোপানী চিৎকার করে ডাকলো ওরে মলিনী সই, ছুটে আয়, আমাদের টগর-বকুলের বিপদ। এই যুবকরা অস্ত্র চাইছে, অস্ত্রের ব্যবস্থা করে দে।

ধোপনী রাজপুত্রদের খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলো। মালিনী ছুটলো কামারশালায়। কামারকে বলল — কামার বুড়ো, তুমি রাজ-সেনাপতির জন্য যে তরবারি বানাও, তার দু'টো তরবারি, আর দু'টো মজবুত শড়কি আমাকে দাও।

কামার বুড়ো বলল — তোমার তরবারি আর শড়কি কি হবে?

মালিনী বলল — দাও না ভাই তাড়াতাড়ি, আমার যে সময় নেই। আপাততঃ আমি আর ধাপানী সই দু'জনে তরবারি খেলা খেলবো, বাকি কথা তোমাকে পরে বলব। এখন তুমি আমাকে অস্ত্র দাও। আমি তোমায় একটা মোহর দেবো।

মোহর! চমকে উঠলো কামার বুড়ো। তার কত দিনের বাসনা, সে একটা মোহর রোজগার করে। কিন্তু সারা জীবনে তা পারে নি। অবশেষে মোহরের আশা সে ছেড়েই দিয়েছে। মালিনী তাকে মোহর দেবে। কি আনন্দ! সে তার কামারশালার দরজা খুলে দিয়ে বলল — নাও, তোমার যেটা খুশি বেছে নাও। আমার কোন আপত্তি নেই।

মালিনী সবচেয়ে ভারী আর ধারালো দেখে দু'টো তরবারি আর দুটো বর্শা নিয়ে চলে এলো। মোহর পেয়ে কামার বুড়ো খুব খুশি হলো বটে কিন্তু তারপর ভাবলো মালিনী অস্ত্র নিয়ে কী করবে!

মালিনী এসে অস্ত্র দিল সনৎকুমার আর নিয়তকুমারের হাতে। তারা মালিনী আর ধোপানী মাসিকে প্রণাম করে বলল — আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা তোমাদের টগর-বকুলকে উদ্ধার করে শিগ্‌গির ফিরে আসবো। ঘোড়া ছুটিয়ে আবার চলল রাজপুত্ররা। বীর-বিক্রমে সেই রাজ্যে চললো, যেখানে কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা আছে।

ভীষণ যুদ্ধ বাধল। এক দিকে রাজ্যের সৈন্য দল আর অপর দিকে এরা মাত্র দু' জন। রাজ্যের অলস সৈন্যরা তাদের বাধা দিল বটে কিন্তু এদের পরাক্রমের কাছে সৈন্যদল পেরে উঠল না। প্রথমে মুক্ত হলো কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা। তারাও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যোগ দিল। সৈন্যরা পারাস্ত হোল। সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা একে একে বন্দী হলেন। গোটা রাজ্যটা তাদের দখলে চলে এলো। যত সব পাত্র, মিত্র, অমাত্য, সামন্ত, জমিদার ছিল তারা সকলে এদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো।

এবার বিচার সভা বসলো রাজ-দরবারে। বিচারক এরা চার জন। বন্দী রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি আরো অনেকে। হাজার হাজার প্রজা রাজ-দরবারে এসে মন্ত্রী, সেনাপতি ও অন্যান্য রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ জানাতে লাগলো। তাদের অকর্ম-কুকর্মের কথা বলতে লাগলো। মন্ত্রী আর সেনাপতির ভয়ে তারা এত দিন রাজপুরুষদের বিরুদ্ধে রাজার কাছে কোন কথা বলতে সাহস পায় নি। আজ সাহস পেয়ে তাদের দূর্দশার কথা রাজসভায় জানাতে এসেছে। তারা বিজয়ী যুবক-যুবতীদের কাছে সুবিচার চায়।

নিয়তকুমার আর সনতকুমার বিচার করলো। পরামর্শ করলো কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভার সাথে। বিচার হল তাদের। মন্ত্রী আর সেনাপতিকে শুলে বসানোর নির্দেশ দিল ওরা। রাজ-কর্মচারীদের অপরাধ অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা হল। বশ্যতা স্বীকারের শর্তে রাজাকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রজাদের হৃত-সম্পদ ফেরৎ দেওয়ার ব্যবস্থা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল। কিছু দিন সেখানে থেকে সব ব্যবস্থা করে তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে চলল চার জনে।

এদিকে কামার বুড়ো মোহর নিয়ে তরবারি বেচেছিল ঠিকই কিন্তু মালিনীকে তরবারি বিক্রির সংবাদ সে রাজার কাছে বলে দিয়েছে। তাই রাজার সন্দেহ হলো। মালিনী আর ধোপানী নিশ্চই রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তা নাহলে মালিনীর অস্ত্রের কি প্রয়োজন। রাজার সেপাই এসে মালিনী আর ধোপনীকে বন্দীকরে নিয়ে গেল। রাজা দেশদ্রোহীকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলেন। কসাঘাতে জর্জরিত মালিনী আর ধোপানী কাঁদতে লাগলো।

এদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ওরা চার জনে। রাজার সন্দেহ সত্যি হলো মনে করে সেনাপতিকে যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। সৈন্যরা চার জনকে বাধা দিল। কিন্তু কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা যুদ্ধ না করে সাদা নিশান ওড়ালো। জানিয়ে দিল তারা এরাজ্যের শত্রু নয়। এরাজ্যের মালিনী আর ধোপানীর মেয়ে টগর-বকুল। রাজসভায় উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে বললো।

রাজা সব শুনে বললেন, 'মস্ত ভুল হয়ে গেছে।' তিনি তখনি ধোপানী আর মালিনীকে মুক্তি দিলেন। তাদের ওপর নির্যাতনের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রদের প্রাসাদে থাকতে বললেন রাজা। কিন্তু রাজকন্যারা বলল -- না, আমরা আমাদের মায়েদের কাছে যাবো, ধোপানী আর মালিনী যাদের কাছে আমরা মানুষ হয়েছি, বড় হয়েছি তাদের কুঁড়ে ঘরে আমরা স্বর্গের শান্তি পাই।

সেখানে সুখে শান্তিতে কিছু দিন কাটিয়ে তারা নিজেদের রাজ্যের দিকে রওনা দিল। উদ্ভটপুর রাজ্যের রাজা সূর্যকেতুর বয়স হয়েছে। রাজ্যে সুখ নেই, শান্তি নেই। সুখ নেই রাজার মনে। তিনি সেই কবে দুই রাণীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা তো রাজ্যের একদিকে কুঁড়ে ঘর বেঁধে বাস করছে। সন্ন্যাসী মারা যাবার পর রাণীরা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে। তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। দু'জনে দু'জনের কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু রাজাকে বললে তিনি কী ভাববেন। আর রাজবাড়িতে প্রবেশের অনুমতিও তাদের নেই।

উদ্ভটপুরের সৈন্যরা সব ঝিমোচ্ছে। যে রাজ্যের সম্পদ নেই সে রাজ্যের শত্রুও নেই। প্রজারা খেতে পায় না। দেশে অজন্মা। মালি আছে, বাগান আছে, কিন্তু ফুল ফোটে না। মন্দির আছে কিন্তু পুজো হয় না। মণ্ডপ আছে কিন্তু অনুষ্ঠান হয় না। সরোবর আছে কিন্তু পদ্ম ফোটে না।

রাজদরবারে এলো কাঞ্চনপ্রভা আর কনকপ্রভা। সঙ্গে রাজপুত্ররা। হঠাৎ দাঁড়ের ময়না গান গেয়ে উঠল। রাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মন্ত্রী দাড়ি নাড়তে লাগলেন। সেনাপতি সতেজ হয়ে উঠলেন। গায়কেরা গান গাইতে লাগলো। মন্দিরে কাঁসর ঘন্টা

বেজে উঠলো। পুরোহিতেরা মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। সরোবরে কমলকলি বিকশিত হলো। কুসুমে অলি গুঞ্জন করল। আমের শাখায় কোকিল গলা মেলল।

রাজা বললেন — তোমরা কে?

মন্ত্রী বললেন — তোমরা কে?

সেনাপতি বললেন — তোমরা কে?

সভাসদরা একবাক্যে বলে উঠলেন — তোমরা কে?

রাজকন্যারা কোন কথার উত্তর দিল না। তারা এগিয়ে চলল রাজ-সিংহাসনের দিকে। রাজার সামনে তাদের হাত মেলে ধরলো।

রাজা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে সজ্ঞা হারালেন। সভা স্তব্ধ হয়ে গেল। রাজবৈদ্য রাজাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। রাজা অতিরিক্ত আনন্দে জ্ঞান হারিয়েছেন। কিয়ৎকাল শুশ্রুষার পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি রাজকন্যাদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এদিকে সংবাদ পেয়ে ভিখারিনীর বেশে ছুটে এলো দুই রাণী। তারা রাজার সামনে নিজেদের অন্যায়ের কথা স্বীকার করলো। তারা বলল — আমরা অন্যায় করেছি। একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ান হয়ে, একে অপরের সন্তানকে হাঁড়িতে রেখে সরা চাপা দিয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি আমাদের যা খুশি শাস্তি দাও। আমাদের হত্যা কর। আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেবল আমাদের মেয়েদের চোখ ভরে দেখতে দাও।

আনন্দের আবেগে সকলে কাঁদতে লাগল। রাজা কাঁদেনতো প্রজা কাঁদে, রাণী কাঁদেতো বাঁদি কাঁদে, মন্ত্রী কাঁদে সান্ত্রী কাঁদে, কতোয়াল রখোয়াল সকলে কাঁদতে লাগলো। কান্না থামলে রাজা নির্দেশ দিলেন — মাটিতে গর্ত খুড়ে রাণীদের জীবন্ত পুঁতে ফেল।

রাজপুত্ররা ততক্ষণ নীরবে ছিল। তারা এবার রাজকন্যাদের বলল — তোমারা তোমাদের মায়ের শাস্তি মেনে নিচ্ছ? তাঁদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবে না?

কনকপ্রভা আর কাঞ্চনপ্রভা বলল — পিতা, যত অন্যায়ই করুক, ওরা তো আমাদের মা। মায়ের কোন বিকল্প হয় না। মায়ের কোন অপরাধ হয় না। যদিও হিংসার বসবর্ত্তী হয়ে তারা আমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেছিল তবু সন্তানের কাছে 'মা' মা'ই থাকে। তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও নৈলে আমরা যে মাতৃহারা হবো।

রাজসভায় বসিয়ে তাদের সব কথা শুনলেন রাজা সূর্যকেতু। শুনলেন রাক্ষস-সন্ন্যাসীর কথা। হীরের গাছ মুক্তোফলের কাহিনী। পরিচয় জানলেন দুই যুবকের। জানলেন তাঁর মেয়েদের আরও নাম আছে, টগর আর বকুল। আর একটি করে মা আছে — ধোপানী আর মালিনী।

সনৎকুমারের সাথে কাঞ্চনপ্রভা আর নিয়তকুমারের সাথে কনকপ্রভার বিবাহ হল। মালিনী আর ধোপানী এলো নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেখতে। কারণ তারাইতো সত্যিকারের মা, যারা তাদের মাতৃস্নেহে পালন করেছে। এলো ধোপা, মালি আর গোয়ালিনী আই। এত বড় উৎসবে তারা বাদ যায় কি করে?

সনৎকুমার কাঞ্চনপ্রভাকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল আর নিয়তকুমার কনকপ্রভাকে নিয়ে রইল উদ্ভটপুর রাজ্যে। ধোপানী-মা গেল তার বকুলের সাথে আর মালিনী-মা রইল টগরের সাথে। যাবার সময় দুই সই একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিতে কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিল। মানুষ দুঃখেও কাঁদে আবার আনন্দেও কাঁদে। একদিনের ধোপানী আর মালিনী আজ রাজরাণীর মা। আনন্দতো তাদের হবেই।

জেঠু গল্প শেষ করে চলে গেলেন। মুগ্ধ হয়ে এতক্ষণ সকলে শুনল। পলা বলল — ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীকে যদি জিগ্‌গেস করলে বলতো তাহলে তার কাছথেকে সব কিছু জেনে নেওয়া যেতো, বল?

ভোলা বলল — ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীকে তুই দেখতে পেলেতো?

অতসী বলল — কেন পাবি না? আসলে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী হলো সুযোগ বা ভাগ্য। নিজের মনেই তাদের কথা শোনা যায়। সুযোগ কেবল জীবনে একবারই আসে। তাই ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী কেবল একবারই বলে। যে ভাগ্যের আহ্বান শুনতে পায়, আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারে সেই জীবনে রাজ্য রাজকন্যা সবই পায়।

— আর রাক্ষস-সন্ন্যাসী?

— এরকম ছদ্মবেশী মানুষতো সমাজের মধ্যে অনেক আছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'হিরের গাছ মুক্তোর ফল'-এর মতো চটক দার জিনিস অনেকেই আমাদের দেখায়। তেমন ব্যক্তির হাতে পড়লে বোঝা যায় আসলে সব মিথ্যে।

ভোলা হেসে বলল — তুইতো ঠাকুমার মতো জ্ঞান দিচ্ছিস্ র‍্যা।
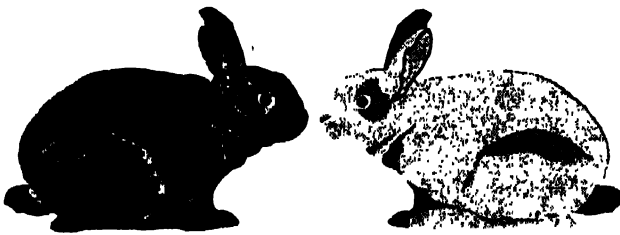
নারদের বরদান

জেঠুমনি শুরু করলেন — দেখ্ ভগবান টগবান আছে বা নেই তা নিয়ে তোদের নানা রকম ধ্যান ধারণা আছে বা থাকতে পারে। কিন্তু আমি তোদের একটা গল্প বলব, নারদের গল্প। গল্পটাকে গল্প মনে করেই শুনবি, ভগবানকে বিশ্বাস করা না-করার জন্য নয়। ভোলা, পলা, নিলু, অতসী সমস্বরে বলে সে যাই হোক তুমি একটা মজার গল্প বল। খুব মজার, ঠাকুর টাকুর যাই হোক। অতসী বলল — কেন, ঠাকুরতো আমার খুব ভাল লাগে। রোজ সকালে স্নান করে দিদু ঠাকুর ঘরে পূজো করে। বেশ মিষ্টি মিষ্টি ধুনো আর ধূপের গন্ধ বেরোয়। তার পর নকুল দানা, নারকোল নাড়ু, বাতাসা ভোগ দেয়। আমার তো খেতে খু...ব ভাল লাগে। বলেই একটা পরিতৃপ্তির ঢোক গেলে। যেন এখনি সে ভালভাল খাবার গুলো খাচ্ছে।

জেঠু হেসে বললেন — দেব দ্বিজে ভক্তি থাক বা নাথাক, মেয়ের আমার প্রসাদিতে অচলা ভক্তি। শোন তাহলে বলি। গল্পটা হল -

এক গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবার বাস করতো। স্বামী-স্ত্রী আর তার একটি পুত্র সন্তান। ছেলেটি বছর দশেকের হবে। লোকটির নাম জীমূতবাহ, স্ত্রীর নাম কনককামিনী ছেলের নাম সুবাহো। তারা বড় গরীব। তাদের দু'বেলা ভাল করে খাওয়া জোটে না। ভাল জামা কাপড় পায় না। সুবাহোর লেখা পড়ায় খুব মন কিন্তু পাঠশালায় যাবার মত ভাল জামা কাপড়, বই পত্তর, আর গুরুদেবের প্রণামী কোনটাই জোগাড় করতে পারে না। তাই তাদের মনে শান্তি নেই।

ভদ্রলোক সারাদিন এর-ওর বাড়ি কাজ করে। কখনো চাষের জমিতে, কখনো পুকুর সেঁচে, কখনো নিজের সামান্য জমিতে চাষ বাস করে যা আয় রোজগার হয় তাতে ভাল করে দু'বেলা খাওয়াই জোটে না তো ভাল পোশাক আষাক লেখা পড়ার খরচ আসবে কোথা থেকে? লোকের কাজে যেতে হয়, তাই ভোর রাতে উঠে গোছগাছ করে বেরুতে হয়। স্ত্রী, কনককামিনী স্বামীর কাজে যাবার জোগাড় করে। এটা ওটা গুছিয়ে দেয়। তাই দু'জনকেই বেশ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়তে হয়।

গ্রামের এক প্রান্তে তাদের বাড়ি। কয়েক দিন ধরে তারা শুনতে পাচ্ছে, কে যেন বীণা বাজাতে বাজাতে পথ দিয়ে যাচ্ছে। ভাবলো এত রাতে বনের প্রান্ত দিয়ে কে যায়! এপাশ দিয়ে সচরাচর কেউ একটা বড় বেশি যাতায়াত করে না। বাউল ফকির তো নয়। কারণ তারা সাধারণতঃ গ্রামের ভিতর দিয়ে যায়। সেখানে তারা ভিক্ষে পায়। কিন্তু এত রাতে কে তাদের ভিক্ষে দেবে। গৃহস্থ বাড়ির সবাইতো ঘুমোচ্ছে। তাহলে কে? এক দিন, দু'দিন। রোজদিন তারা শোনে। এক দিন কনককামিনী বলল দেখ, একটা লোক এত

রাতে কোথায় যায় বলতো? জীমূতবাহ বললে - হ্যাঁ আমিও ভাবি, তার বীণার সুর শুনতে পাই। বড় ভালো বাজায়। একদিন তার কাছে গিয়ে তার গান শুনব।

কনককামিনী বলল - "চল, দু'জনে যাই। তার গান শুনে আসি। লোকটা বোধ হয় ভিক্ষে টিক্ষে করে না। শুধু বীণা বাজায়, তাই বনের পাশ দিয়ে যায়, নৈলে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে যেতো।" সেই মতো তারা দু'জনে বীণাবাদকের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। বীণাবাদক বড় সুন্দর দেখতে। কপালে তিলক কাটা। পরণে পট্টবস্ত্র। হাতে সুঠাম বীণা। আর তা থেকে সুমধুর ধ্বনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

জীমূতবাহ আর কনককামিনী সেই বীণাবাদকের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বলল - আপনি কোন সিদ্ধপুরষ নাকি দেবতা, এই নিশি রাতে বনের প্রান্ত দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাতায়াত করেন। আপনার গান শুনে আমরা খুবই প্রীত হয়েছি। আপনার মুখ থেকে দেবকীর্তন শুনতে আমাদের বড়ই বাসনা। প্রভু, আপনি যদি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের গান শোনান তাহলে আমরা আনন্দ পাব।

বীণাবাদক বললেন -- জীমূতবাহ-কনককামিনী, তোমরা তোমাদের সন্তানকে একা নিদ্রিত রেখে এসেছ। সুতরাং এখানে তোমাদের অধিক সময় অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমার গান তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আমি খুব আনন্দিত হলাম। কিন্তু আমার সময় অতি অল্প। নাহলে আমি তোমাদের গান শোনাতে পারতাম।

জীমূতবাহ করজোড় করে বলল - আপনি নিশ্চই সিদ্ধপুরুষ কিংবা দেবতা হবেন। তা নাহলে আপনি আমদের নাম জানবেন কি করে? বলুন আপনি কে? কেন এ পথ দিয়ে আপনি নিত্য যাতায়াত করেন। অরণ্যের পাশ দিয়ে যেতে আপনার ভয় করে না?

বীণাবাদক হেসে বললেন -- বৎস, তোমরা যথার্থ বলেছ। আমার কোন ভয় করে না। আমার কোন ভয় নেই। কারণ, আমি নারায়ণ, পরম পিতা পরমেশ্বরের গান করি। তাঁরই কাজ করি। আমি স্বর্গের দূত। লোকে আমায় নারদ বলে। কেউ কেউ বলে দেবর্ষি। আবার কেউবা বলে দেবর্ষি-নারদ। সে যাহোক, আমি আসলে তাঁরই দাস।

-- সে কিই...ই! আপনি নারঅ..দ মুনি? আমাদের কী সৌভাগ্য, আজ আমরা আপনার দেখা পেলাম। বলেই আভূমি নত হয়ে তাঁর পায়ে প্রণাম করল। তারপর জানতে চাইল - প্রভু, আপনি ঢেঁকি বাহন ত্যাগ করে পদব্রজে মর্ত্যলোকে কেন আগমন করেছেন?

জীমূতবাহর কথা শুনে নারদ মুনি বললেন -- মর্ত্যে মানুষের খবরাখবর নিতে আমাকে ধরায় অবতীর্ণ হতে হয়। আমি হলাম স্বর্গের সাংবাদিক। সংবাদ পরিবেশন আমার পেশা এবং নেশা। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করতে হলে মানুষের কাছে আসতে হবে। আর মানুষের কাছে ঐ ঢেঁকি চড়ে উড়ে এলে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যাবে। সুতরাং স্বর্গের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করতে এসে শেষে আমি নিজেই তোমাদের সংবাদ পত্রের প্রথম পাতায় চলে যাব। দেখতে পাও না তোমাদের দেশে, নেতারা যখন প্রচারে আসেন, তখন তাঁরা একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আসেন। তাতে যতনা লোকে নেতাকে দেখতে বা তার কথা শুনতে আসে তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষের ভিড় হয় ঐ

হেলিকপ্টার দেখার জন্য। সুতরাং রথ দেখা আর কলা বেচা দু'ই হয়। লোকও জড় হয় আর প্রচারও হয়। আমরা তো বাবা সেকেলে লোক, আমাদের প্রচারের কোন প্রয়োজন নেই, তাই ঢেঁকি ছাড়া পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াই। বয়স হয়েছে, হাতে পায়ে বাত বেদনায় ক্লেশ পাচ্ছি। তাই বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরী উপদেশ দিলেন হাঁটা চলা করা নাকি শরীরের পক্ষে বেশ হিতকর। তোমাদের দেশে লোকেরা সব যেমন মর্ণিং-ওয়াকে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আর কি।

কনককামিনী সলজ্জ ভাবে হাত জোড় করে বললে — প্রভু একটা নিবেদন...

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নারদ বললেন — বেশ বেশ বুঝে গেছি, আর বলতে হবে না। তোমার কিছু দরকার। স্বর্গের দেবতাকে দেখে হাত পাততে ইচ্ছা করে। তাইতো?

জিমুতবাহ বলল—তা আপনি তো অন্তর্যামী, সকলের মনের কথা জানতে পারেন।

-- ওসব বাজে কথা, আমরা কেউ কারো মনের কথা অবগত হতে পারি না। তোমাদের মনুষ্য জগতে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয়েছে। ঐ লাইডিটেক্টর না কি একটা যন্ত্র বেরিয়েছে তাতেও কারো মনের কথা বার করা যায় না। আমরা তো দেবলোকে সেই সেকেলে দুচারটে যন্ত্রপাতি যা দেব কারিগর বিশ্বকর্মা বানিয়ে ছিলেন তাই নিয়ে কাজ কম্ম চালিয়ে যাচ্ছি। তবে হ্যাঁ আমরা বহুদিনের পুরাতন পাপিষ্ট, থুড়ি! এই যাঃ, এই সব কথাগুলো আবার তোমাদের মর্ত্যলোকে এসে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মানে পুরানো দিনের লোক তাই বহু বিধ মানুষ-দেবতা, অসুর-বিসুর দেখতে দেখতে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হয়ে উপছে পড়ছে সুতরাং লোকের মুখ দেখলে তাদের মনের কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি, এই যা।

প্রভু আমি বলি কি ...

— বল না, এত কিন্তু করার কিছু নেই। বল তোমাদের কিসের অভাব?

— প্রভু আমাদের বড় দুঃখ। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় .....

— তা কি চাও বল?

— বরদিন যেন একটু সুখ টুখ.....

— দেখ বাবা, বর টর দেবার ক্ষমতা আমার নেই। জানতো আমার চীফ বস্ মানে প্রভু ভগবান বিষ্ণু আবার বড় কড়া ধাতের লোক। কথায় কথায় ছাঁটাই করে দেন। তোমাদের দেশে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট আছে, আমাদের সবটাই পেটি কোর্ট। হুকুমতো হুকুম। নড়চড় হবার জো নেই। আগে আগে মা কমলার কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালে কাজ হত। এখন সে সব দিন গেছে। তিনি তো বয়সের ভারে একে বারে বুড়ি হয়ে গেছেন। বিষ্ণু এখন আর তাঁর কথায় তেমন আমল দেন না। তিনি এখন নূতন রাধিকার খোঁজে মর্ত্যের দিকে নজর দিচ্ছেন।

নারদ বলে চললেন - তাইতো তিনি আগে ভাগে শুনিয়ে রেখেছেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। অর্থাৎ বারে বারে তিনি আসবেন। আসলে পুরুষের মনতো বশ মানতে চায়না, তা সে যত বয়সই হোকনা কেন। তবে কি জানো, স্বর্গেতো ডিভোর্স প্রথাটা চালু নেই তাই, নৈলে বিষ্ণু কবে মা লক্ষ্মীকে গেট-আউট করে দিতেন। যাক্‌গে সে সব কথা,

তোমাদের দুঃখের কথা আমি ভগবানকে জানাবো। আজ তাহলে চলি, তবু ভালো, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো, ভগবানকে গিয়ে রিপোর্ট দেব। দুঃখের বিষয়, তোমাদের মতো আমাদের তো আর ছাপানো কাগজ বেরোয় না। গান গাইতে গাইতে সব কথা নিবেদন করতে হয়। ভগবান আবার শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন, সব কথা কানে যায় কি না কে জানে। যদি একটা ছাপার কাগজ বেরোতো না, তাহলে তোমাদের কথা নিয়ে এমন একটা প্রবন্ধ লিখতাম যে স্বর্গে একে বারে ঋ ঋ পড়ে যেত।

ক্ষোভের সঙ্গে নারদ বলে চললেন - বিশ্বকর্মাটা কোন কম্মের নয়। না তৈরী করতে পারল একটা ছাপাখানা, না এক টুকরো কাগজ। সেই ভূর্জপত্র আর মসি পাত্র। তা দিয়ে কি আর সংবাদ পরিবেশন করা যায়। আমার আবার হাতের লেখা ভাল নয়। নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারি না। বয়েস হয়েছে, এখন আবার লিখতে গেলে হাত কাঁপে।

যাক্‌গে বাবা, তোমাদের সঙ্গে কথায় কথায় ভোর হতে চলল। আমার আবার দেরি হয়ে যাবে। খাতায় লেট মার্ক পড়ে যাবে। ওখানেও তো আবার কর্ম-সংস্কৃতির ধুম পড়েছে। দোষটা আবার আমারই। কথাটা না বললেই হত। আমার তো আবার পেট পাতলা, কোন কথা চেপে রাখতে পারি না। তোমাদের দেশের সাংবাদিকরা দেখ, ঠিক জায়গায় ঠিক সংবাদটা পরিবেশন করে, আবার প্রয়োজন মত চেপেও যায়। তাই দশ খানা কাগজে একই সংবাদ দশ রকম ভাবে পরিবেশন হয়।

.... না আর নয়। আমি চললাম। তোমাদের কথা ভগবান বিষ্ণুকে বলব। নিশ্চই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। চলি ....

বলেই টুং টাং শব্দে বীণা বাজাতে বাজাতে অচিরে অর্ন্তধান হলেন। জীমূতোবাহ আর কনককামিনী আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকল। ভাবল, কে বলে ভগবান নেই, দেখ আমাদের দুঃখ দেখে নারদ নিজে এসে হাজির হয়েছেন। ভগবান নিশ্চই এবার আমাদের কথা শুনবেন। আজকের দিনটা গেলে রাতের শেষেই আমাদের ভাগ্য ফিরে যাবে।

দিন আর কটে না। এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। অথচ কাউকে বলতে না পারলে কনককামিনীর অস্বস্তি যায় না। জীমুতবাহ পই পই করে বারন করেছে যাতে কথাটা পাঁচ কান না হয়। তাহলে হাজার হাজার লোক জড় হয়ে যাবে। নারদ ভয় পেয়ে ভড়কে যাবে, আর আসবে না। তাছাড়া দেবতা একজনকে সদয় হয়, সবাইকে নয়। তা নাহলে সবাই যদি দেবতার আশীর্বাদ পেয়ে বড়লোক হয়ে যায় তাহলে ধনী দরিদ্রের ভেদ থাকবে কি করে? যাই হোক দিনটাকে মনে হচ্ছে বছর। কখন রাত হবে আর কখন নারদ মুনি এসে সুখের খবরটা দেবে।

অনেক প্রতিক্ষার পর রাত এল। কিন্তু ঘুম আসে না। পুত্র সুবাহো এত সব বোঝে না। সে ঘুমিয়ে পড়ল। উত্তরের আকাশে ধ্রুবতারা দেখা গেল। ক্রমে শুকতারা পূব গগনে ফুঠে উঠল। মৃদু মন্দ বীণা ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। বিনিদ্র দম্পতির ঠোঁটের কোনে হাসির রেখা দেখা দিল। তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে পথে দাঁড়াল। শব্দ আরো নিকটে আসতে লাগল। ক্রমে নারদ মুনিকে দেখা গেল। দূর থেকে পদ প্রান্তে বসার জন্য প্রস্তুত হল দুজনে। সমস্বরে প্রশ্ন করল - ঋষি, ঠাকুর ভগবান বিষ্ণু কিছু বললেন। কি দিয়েছেন তিনি?

নারদ আঁৎকে উঠে বললেন - এই যা, দেখ দেখি, সব কথা বলা হল তোমাদের দুঃখের কথা, অভাবের কথা সব আমি সাতকাহন করে গানের মাধ্যমে বললাম। শুনে ভগবান তো ঘুমিয়ে পড়লেন। সভায় উপস্থিত দেবতারা আমার অনেক প্রসংশা করলেন। কিন্তু এই তোমরা যে বর চেয়েছ সেই কথাটা বলতে ভুলে গেলাম। আচ্ছা আজ বলব।

কনককামিনী বলল -- প্রভু আপনার বড় ভুলো মন। কিছুই ঠিক করে মনে রাখতে পারেন না। আর হবে না'ইবা কেন? ঘর সংসার নেই, খেটে খেতে হয় না, কোন দায় দায়িত্বনেই। কেবল টো টো করে ঘোরা। আপনাদের মতো এই দায়িত্ব জ্ঞান হীন পুরুষদের জন্য আমাদের আজ এই অবস্থা। সব ক্ষমতা আপনারা নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন। অথচ আমাদের সব কথা মনে রাখার ক্ষমতাটুকু নেই। সমস্যা না বুঝলে সমাধান করবেন কি করে?

জীমূতবাহ বলল - ঠাকুর রাগ করবেন না, ও মূর্খ নারী কি বলতে কি সব বলে ফেলছে। রাগলে ওর আবার মাথার ঠিক থাকে না। আপনি আজ আবার একবার বিষ্ণুকে আমাদের অভাবের কথা বলে বর চাইবেন।

কনককামিনী বিড়ালের মত থাবাতুলে ফ্যাঁচ্ করে উঠল। কি মেয়ে বলে অবজ্ঞা। জানো, মহিলা সমিতিতে খবর দিলে তোমাদের অবস্থা কি রকম হবে? নারী নির্যাতন, নারী অবমাননা দুইই দণ্ডনীয় অপরাধ। জেল জরিমানা এমন কি ফাঁসিও হতে পারে।

ভারী মালগাড়ি রেললাইন দিয়ে যাওয়ার সময় রেললাইনের ধরে উদ্বাস্তুদের দড়মার ঘর যেমন থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে কনককামিনীর কথাশুনে মহর্ষি নারদের হৃৎপিণ্ড তেমনি করে লাফাতে লাগল। সে কথা না বাড়িয়ে 'আচ্ছা আজ বলব' বলে পাশ কাটিয়ে পালাবার উদ্যোগ নিতেই কনককামিনী তার উত্তরীয় চেপে ধরল।

-- দাঁড়ান, আপনারা পুরুষ জাতটাই এমনি ধাপ্পা বাজ। এই একটা লোক আমায় সারা জীবন জ্বালিয়ে গেল। আর আপনার কি বলুন, আপনি তো বিয়ে থা করেন নি। বেশতো সেজে গুজে রাত বিরেতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তা আমাদের কথা মনে থাকবে কেন? থাকতো আমার উর্বশী মেনকার মত রূপযৌবন তখন এখানেই ঘুর ঘুর করতেন।

বলেই কনককামিনী ফর্ ফর্ করে নিজের আঁচলের পাড় থেকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে নারদের বীণার এক দিকে বাঁধতে বাঁধতে বললে - 'এই এখানে বেঁধে দিলাম। এবার নিশ্চই মনে থাকবে। মনে করে জিগ্‌গেস করবেন কিন্তু, আমি কাল সকালে ওকে দেখব।' তারপর স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল -- 'যার তার কাছে আমার নিন্দে মন্দ করা। আমি মূর্খ, কি বলতে কি বলি, আর ও যেন দিগ্‌গজ পণ্ডিত।'

আবার নারদের দিকে তাকিয়ে কনককামিনী বলল -- হ্যাঁ, শুনুন যা বর চাইবার আমার জন্য চাইবেন। ওকে দিলে সব নয়ছয় করে দেবে। নেশা ভাঙ করবে, এর ওর পিছনে পয়সা ওড়াবে। আর ভাতের থালাটা তো আমি বেড়ে দিই নাকি? আমার থাকলে ওতো খেয়ে বাঁচবে। বুঝেছেন, যান।

নারদের তো 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। 'আচ্ছা বলব' বলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্বামী জীমূতবাহর করুণ অবস্থা। সে ভুলটা এক বার নয় দশ বার স্বীকার

করল। সত্যিইতো নিজের স্ত্রীকে অপরিচিত কে না কে একজনের সামনে এভাবে মূর্খ বলা, অপমান করারই সামিল। সে নিজেও তেমন লেখা পড়া জানে না। বয়স্ক শিক্ষা শিবিরে যে টুকু শিখেছিল তা সেদিনই ভুলে গেছে। তাও কি ছাই হোত? বলেছিল ওখানে গেলে নাকি পরবর্তি কালে লোন্ টোন পাওয়া যাবে। কিন্তু সে গুড়েও বালি। কিচ্ছু দেয়নি। দিলে আজ তাদের এমন অবস্থা হতো না। পৃথিবীর মানুষ ছেড়ে আবার একেবারে স্বর্গের দেবতার কাছে হাত পাতা মোটেই মানায় না। দেশে যখন স্বদেশীয়ানার জোয়ার চলছে, দেশ ছেড়ে গ্রহান্তরের দেবতার কাছে বর প্রার্থনা। তা হোক, ঠাকুর দেবতায় ভক্তি না থাকলেও ভয়, শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের এই ভয়টা আছে।

নারদ তাড়াতাড়ি গিয়ে স্বর্গসভার হাজিরা খাতায় নাম সই করে ভগবান বিষ্ণুর সামনে বীণায় তান তুলে গান ধরতে গেলে বীণা বেসুরে বেজে উঠল। অর্ধশায়িত অর্ধনিমিলিত আঁখি ভগবান সহসা জাগ্রত হয়ে নারদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন - একি নারদ, তোমার বীণার সুর এমন খ্যান্ খেনে কেন?

তার পর নিরীক্ষণ করে বললেন -- তোমার বীণা ভেঙে গেছে? তুমি তাতে বস্ত্র খণ্ড দিয়ে জোড়া দিয়েছ। কেন বিশ্বকর্মার ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা আজকাল ঠিকমত কাজ করে না? স্বর্গেকি ওয়ার্ক কালচার একে বারে নষ্ট হয়ে গেল? ইন্দ্রকে ডেকে পাঠাও। কোন কর্মের নয়। খালি গদির লোভ। একবার বসতে পারলেই সব ভুলে যায়। এদিকে লোকে আমায় নিন্দে মন্দ করে।

নারদ করজোড়ে বললেন - উত্তেজিত হবে না প্রভু। ক'দিন আগে দেব বৈদ্য ধন্বন্তরী আপনাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছেন। আপনার হৃতপিণ্ডের অবস্থা নাকি মোটেই ভাল নয়। বাইপাশ সার্জারী করাতে হতে পারে। দাক্ষিণাত্যের কোনো চিকিৎসালয়ে আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন। রক্তের চাপটাও বেড়েছে। নিতান্ত দেবতারা অমর তাই রক্ষে, নাহলে কবে অক্কা পেয়ে যেতেন। সুতরাং আপনার এখন ক্রোধ সম্বরণ করা উচিত।

-- বেশ তাই করলাম। তুমি এবার বিবরণ নিবেদন কর।

নারদ বললেন - প্রভু, কাল যে দম্পতির কথা আপনার সকাশে বর্ণনা করে ছিলাম তারা আপনার নিকট একটি বর প্রার্থনা করে ছিল। কিন্তু অনবধানতা বসত কাল আমি আপনাকে সে কথা বলতে পারিনি। সুতরাং আজ যাতে সে ভ্রম না হয় তাই কনককামিনী তার অঞ্চল থেকে বস্ত্রখণ্ড আমার বীণায় বেঁধে দিয়েছে।

ভগবান বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন -- না, বর টর হবে না। খালি চাই আর চাই। পূজা অর্চনা যাগ যজ্ঞ এখন মর্ত্যের মানুষ আর কিছু করে না। এদিকে এটা দাও ওটা দাও। বলে দাও, ও সব হবে না।

কথা শুনে ব্রহ্মা হাঁ..হাঁ করে ছুটে এলেন। বললেন -- প্রভু ওকাজ করবেন না। দেখছেন এখন দেবতাদের বাজার ভাল না। কেউ আর পূজো আর্চা তেমন দেয় না। ঠাকুর দেবতাকে মানে না। যদি পূজো হয় তা সবই বারোয়ারী পূজো, ধুম ধাম মাইক

প্যাণ্ডেল আর অলোর কারসাজি। দেবতার নৈবিদ্য বলতে তেমন কিছু নেই। সুতরাং একটা আধটা বর টর যদি না দেন, তাহলে লোকে দেবতাকে মানবে কেন?

বিষ্ণু এবার একটু নরম হলেন। বললেন -- ঠিক আছে, বল, ওরা কি বর চায়?

নারদ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন -- না, সে কথাটা ঠিক করে জিগ্‌গেস করে আসি নি।

-- মূর্খ কোথাকার! আসল কথাটাই জানতে ভুলে গেলে?

রক্ষা করুন প্রভু, এই মূর্খ কথাটা বলার জন্য কনককামিনী তার স্বামী জীমূতবাহর দিকে এমন করে তেড় এসেছিল তা দেখে আমার 'আত্মারাম খাঁচা ছাড়া'। কোনো প্রকার পলায়ন করে প্রাণ আর মান রক্ষা করেছি। অতঃপর আপনি কদাচিৎ সেই মহিলার উপস্থিতিতে তাকে কখনো মূর্খ বলে বসবেন না। আমাকে একবার কেন হাজার বার বলুন - আমি শুনব।

তাই হবে। তুমি আজ আবার যখন মর্ত্যে যাবে তখন জেনে আসবে সেই দম্পতি কি চায়?

রীতিমতো নারদ শেষ রাতে মর্ত্যভ্রমণ শেষ করে জীমূতবাহর বাড়ির পাশ দিয়ে চলেছেন। দম্পতি তাদের সামনে উপস্থিত হলে, নারদ তাদের কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বললেন -- ভগবান বিষ্ণুর কাছে তোমাদের কথা নিবেদন করেছিলাম। তিনি জানতে চেয়েছেন তোমরা কি চাও।

কথাটা শুনে জীমূতবাহ আর কনককামিনী এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। দেখে নারদ বললেন -- দেখ, ভাল করে ভেবে দেখ। যা চাইবে তাই পাবে, তবে একবার। তোমরা যা চাইবে আমি তা গিয়ে প্রভুর কাছে নিবেদন করব আর তোমরা তাই পেয়ে যাবে।

কনককামিনী ঝঙ্কার দিয়ে স্বামীকে বলল -- দেখ তুমি কিছু বলো না। তুমি যা লোক এখন উল্‌টো পাল্‌টা যাতা চেয়ে বসবে। আমাকে ভাল করে ভাবতে দাও। তারপর নারদকে বলল -- ঠাকুর, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমরা একটু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিই।

নারদ বললেন তার দরকার নেই। তোমরা আজ সারাদিন ধরে আলোচনা করে ভেবে চিন্তে ঠিক কর। তার পর কাল ঠিক এই সময় সামনের এই এঁদো পুকুরটায় তোমরা তিন জন যে যা বলে ডুব দেবে, উঠে তাই পেয়ে যাবে। কিন্তু মনে রেখো মাত্র একবার। এক বারের বেশি কোনো কাজ হবে না।

বলেই নারদ হঠাৎ হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন। সারাটা দিন অশান্তির মধ্যে কাটলো। আজকে সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। কিছুতেই কিছু ঠিক করা হচ্ছে না। টাকা পয়সা চাইলে, চুরি ডাকাতি হবার ভয় আছে। রাজা হলে রাজ্য হারাবার ভয় আছে। বিত্ত সম্পদ ধন রত্ন সবেতেই একটা না একটা বিপদ। অবশেষে ঠিক হল রাজাই ভাল তবে এই পৃথিবীর নয়। হতে হলে স্বর্গের রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র। জীমূতবাহ যদি একেবারে ইন্দ্র

হয়ে যায়, তবে শচীন্দ্রানী হবে কনককামিনী আর সুবাহো হয়ে যাবে জয়ন্ত। ব্যাস্ আর কোন ভাবনা নেই।

যদি স্বর্গরাজ্য কোন অসুরে আক্রমন করে? করতে পারবে না। কারণ সে সব অসুর বিসুর আর নেই। তাড়কাসুর, মহিষাসুর, সবতো একে একে বধ হয়ে গেছে। এমনকি শ্বশুর-ভাসুর-এর ও আজকাল সব দাপট চৌপট হয়ে গেছে। তাই আক্রমন করার কেউ নেই। আর যদি একান্তই কেউ আক্রমণ করে বসে, তার জন্য সবাই যুদ্ধ করবে। শেষ মেশ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তো আছেনই, আছেন আবার কালী-দূর্গা, সবাই মিলে যা হোক একটা উপায় বার করবেন। সুতরাং ইন্দ্র হওয়াই স্থির হল।

দুরু দুরু বুকে তিন জন এগিয় চলল এঁদো পুকুরের দিকে। বেশ শীত আছে, ভোরের রাতে চান। তা হোক একবার ইন্দ্রত্ব পেলেতো আর বলতে নেই। কষ্ট করে চানটা করতে হবে। কনককামিনী সকলকে পই পই করে বুঝিয়ে দিল। শীতের চোটে কেউ যেন বর চাইতে ভুল না করে। যে যার মত বর চেয়ে নেবে।

পুকুর পাড়ে এসে কনককামিনী বলল – থাম, দেখি, ও লোকটা তো বলে খালাস, হয় কি না হয়। এই অবেলায় তা আবার পানায় ভরা পুকুর। জল দেখা যায়না। তোমার আবার ঠাণ্ডার ধাত। বুড়ো বয়সে যদি ইন্দ্র হতে না পার তা হলে খামোকা জলে ডুব দিয়ে জ্বর বাধালে তখন তো আমাকেই জ্বালাবে। আর ছোট ছেলে, তাকে এই ভোর রাতে জলে নামতে দেওয়ার আগে দেখা উচিত্ সত্যি হয় কি না।

তাই স্থির হল, আগে কনককামিনী জলে নেমে ডুব দেবে। সে যদি শচী দেবী হয় তাহলে একে একে ইন্দ্র ও জয়ন্ত হবার জন্য জলে নামবে। সেইমত কনককামিনী জলে নেমে বলল 'হে ভগবান বিষ্ণু, আমি যেন ইন্দ্রের পত্নী শচী দেবীতে রূপান্তরিত হই।' তার পর জলে ডুব দিল। জল থেকে যখন ওঠে তার শরীরে দেবতার দিব্য জ্যোতি প্রকাশিত হচ্ছে। পরনে স্বর্গীয় পট্টবস্ত্র। নানা অলঙ্কারে ভূষিতা। তার শরীর থেকে চুয়া চন্দনের দিব্য গন্ধ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখেতো জীমূতবাহ আর সুবাহো বিস্মিয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল।

ক্ষণমাত্র পূর্বে যে কনককামিনী মানবী ছিল এখন সে পানা পুকুর থেকে উঠে এল দেবী শচীরাণী হয়ে। জল থেকে উঠলেও তার শরীরের বস্ত্র এত টুকু জল সিক্ত নয়। পায়ে এত টুকু কাদা লাগেনি। সুতরাং এবার জীমূতবাহর পালা। সে এবার জলে ডুবদেবে, তার মনস্কামনা বলে, যাতে সে দেবেন্দ্র বাসব হতে পারে।

এমন সময় দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। এক জন পাঠান যুবক সেই ঘোড়ায় চেপে আসছে। ভোর রাতে এমন এক সুন্দরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে সামলাতে না পেরে ঘোড়া থেকে নেমে বলল – 'আরে আসমানের হুরি, তুমি এখানে কেন!' তার পর জোর করে তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই

জীমূতবাহ বাধা দিতে গেল। অশ্বারোহী তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার পিঠে সপাটে দু'ঘা চাবুক চালিয়ে দিয়ে অশ্বারোহণ করে পালাতে লাগল।

নিরুপায় জীমূতবাহ তড়ি ঘড়ি জলে নেমে বলল - 'হে ভগবান, হে বিষ্ণু আমার স্ত্রীকে এখনি একটি শুকরীতে পরিণত কর।'

যেমনি কথা তেমনি কাজ। অশ্বারোহী দেখল তার কোলের মধ্যে একটি শুকরী বসে আছে। সে 'তোবা তোবা' বলে ধাক্কা দিয়ে শুকরীকে মাটিতে ফেলে পালাল। শুকরীরূপিনী কনককামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে জীমূতবাহ এবং সুবাহোর কাছে এসে ঘোরা ঘুরি করতে লাগল। যেন বলতে চাইল 'এ আমার কি হল?' কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

মায়ের এহেন অবস্থা দেখে পুত্র সুবাহো শিঘ্র জলে নেমে বলল 'হে ভগবান, হে বিষ্ণু আমার মাকে আবার আগের মত করে দাও। আমাদের যে যেমনটি ছিলাম সবাই যেন তেমনটি থাকি। আমাদের ইন্দ্র হবার কোন প্রয়োজন নেই।' তার পর জলথেকে মাথা তুলে দেখে তার বাবার পাশে তার মা ঠিক আগের মত বেশভূষা পরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে মলিন পুরাতন শাড়ি, শরীরে দারিদ্রের ছাপ। পাশে স্বল্প বস্ত্র বাবা শীতে থরথর করে কাঁপছে। জলথেকে উঠে এল জয়ন্ত নয়, সেই পুরাতন সুবাহো। শীতে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। মা স্নেহভরে নিজের আঁচল দিয়ে সুবাহোর মাথার জল মুছতে মুছতে বলল – বেশ করেছিস্ বাবা, আমরা যেমন ছিলাম তেমনি ভালো। স্বর্গে গিয়ে কাজ নেই। আসলে আমাদের লোভ অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

পর দিন সারা রাত জেগে থেকেও তারা নারদের বীণার শব্দ শুনতে পায়নি। হয়তো তাঁর ডিউটি পরিবর্তন হয়েছে।